প্রকাশক : সুভাষচন্দ্র দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

শব্দগ্রন্থন : রবিশঙ্কর বণিক। মাইক্রোডট্ কম্পিউটার
২০ শ্যামপুকুর লেন। কলকাতা ৭০০ ০০৪

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে। দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুখবন্ধ

য়্যাঙ শিয়েন-য়ি এবং গ্ল্যাডিস য়্যাঙ অনূদিত লু স্থনের Old Tales Retold পড়তে পড়তে যখন প্রাচীন চীনা কাহিনীর গাল্পিকতা, বর্ণনানৈপুণ্য, জীবনবোধের বৈচিত্র্য ও গভীরতায় আমি অভিভূত, ঠিক সেই সময় লিন্ য়ুটাঙ অনূদিত Famous Chinese Short Stories বইটা আমার হাতে আসে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পড়তে আরম্ভ করি। গল্পগুলি তখন আমাকে এতো আকৃষ্ট করে যে কিছু না-ভেবেই আমি কয়েকটা গল্প অনুবাদ করতে আরম্ভ করে দিই। সেই সময় মৈত্রেয়ী দেবীর চীন-ভ্রমণ সংক্রান্ত রচনাটি আনন্দবাজারে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। তা-তে জানতে পাই, জীবিত চীনা-লেখকদের একটি অনুযোগ মৈত্রেয়ী দেবীকে শুনতে হয় যে, বাংলা ভাষার মতো প্রথম শ্রেণীর ভাষাগুলোতেও শ্রেষ্ঠ চীনা লেখকদের লেখাগুলো এখনো পর্যন্ত অনূদিত হয় নি, এটা খুবই আফশোসের কথা। জেনে আমি খুবই উৎসাহিত বোধ করি। এবং লিন্ য়ুটাঙের সঙ্কলন থেকে বেছে বেছে বেশ-কয়েকটি গল্প অনুবাদ করি। মনে মনে সঙ্কল্প নিই, 'শ্রেষ্ঠ চীনা গল্প-সংগ্রহ' নামে অন্তত দু-খণ্ডে প্রাচীন ও আধুনিক চীনা গল্পের দুটি সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশ করব। সেই সঙ্কল্প অনুযায়ী প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল।

মোটামুটি ভাবে তাঙ-যুগ (খ্রীষ্টীয় অষ্টম/নবম শতাব্দী) থেকে চিঙ্-যুগ (অষ্টাদশ শতাব্দী) পর্যন্ত প্রায় দীর্ঘ এক হাজার বৎসরকালের সময়-সীমার মধ্যে রচিত গল্প এই সঙ্কলনে গৃহীত হয়েছে। তাঙ-যুগের সঙ্কলিত গল্প—পশ্চিমের ঘর, চিয়েন্নিয়াঙ, প্রজাপতি নিবাস; সাঙ-যুগের গল্প—আগন্তুকের চিরকুট, পাথর-প্রতিমা, অসূয়া; চিঙ-যুগের গল্প—গ্রন্থকীট।

তাঙ-যুগের গল্পগুলির বিশিষ্টতা: কাল্পনিকতা, রোমান্টিকতা এবং সৌন্দর্যমুগ্ধতা। সাঙ-যুগের গল্পগুলিতে বুদ্ধিবাদের গন্ধ যুক্ত

হয়েছে। চিঙ-যুগের গল্পগুলিতে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও কৌতুকরসের বিমিশ্রণ চোখে পড়ে। লিন য়ুটাঙ তাঁর সঙ্কলনে সিঙ-যুগের কোনো গল্পই গ্রহণ করেন নি। তিনি বলেছেন, মিঙ-যুগের গল্পগুলিও আকর্ষণীয় ; তবে একান্ত বর্ণনাধর্মী, চায়ের-দোকানের গল্পের শ্রেণীভুক্ত ; সার্বজনীন আবেদন নেই, জীবনবোধের গভীরতাও দুর্নিরীক্ষ্য। ব্যক্তিগত ধারণা থেকে বলতে পারি যে, তাঙ-যুগের গল্পগুলি প্রথম শ্রেণীর গল্প হিসেবে গ্রহণ করা যায়, সাঙ-যুগের গল্পগুলিও উজ্জ্বল ; চিঙ-যুগের গল্পগুলির মধ্যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়।

সবিনয়ে একটি কথা জানাতে চাই যে, চীনা ভাষা আমি জানি না, সোজাসুজি ইংরেজি ভাষা থেকেই অনুবাদ করেছি, কাজেই এই সঙ্কলনে ভাষাগত উচ্চারণ ও বানান পদ্ধতি সর্বত্র যে নির্ভুল, এরকম যুক্তিহীন দাবি আমি করতে পারি না। তবে **W. J. F. Jenner**-সম্পাদিত **Modern Chinese Stories** সঙ্কলনে **A Note on Pronunciation**-এ উচ্চারণ পদ্ধতি সম্পর্কে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা আমি খুব তীক্ষ্ণভাবে অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছি।

'শ্রেষ্ঠ চীনা গল্প-সংগ্রহ' (প্রথম খণ্ড) পাঠকসমাজে সমাদৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস। এ-সম্পর্কে পূর্বাহ্ণে বিজ্ঞাপন-প্রচারে আমি অনীহ। কেবল পাঠক সাধারণকে বইটি পড়ে দেখতে আমি অনুরোধ করি। শ্রেষ্ঠ চীনা গল্প-সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড সত্বর প্রকাশিত হবে।

নিবেদক—

জগত লাহা

সূচীপত্র

	প্রেম			পৃষ্ঠা
১.	পশ্চিমের ঘর	তাঙ	য়ুয়ান চেন	১
২.	চিয়েন্নিয়াঙ	তাঙ	চেন হ্ স্যুয়ানা	২৯
৩.	সতীত্ব	তাঙ	প্রচলিত কাহিনী	৪৭
৪.	পাথর-প্রতিমা	সাঙ	'চিঙপেন টুঙশু'	১৪১

রোমাঞ্চ—রহস্য

৫.	আগন্তুকের চিরকুট	সাঙ	'চিঙপিঙশান টাঙ'	১১২

অলৌকিক

৬.	অসূয়া	সাঙ	'চিঙপেন টুঙশু'	৭৮

ব্যঙ্গ

৭.	গ্রন্থকীট	চিঙ	পু লিঙ-সিঙ	১৬৬

কাল্পনিক

৮.	প্রজাপতি নিবাস	তাঙ	লি ফু-য়েন	১৮০

শ্রেষ্ঠ চীনা গল্প-সংগ্রহ

শ্রীকমল দত্ত

ও

শ্রীমতী সর্বমঙ্গলা দত্ত

শ্রদ্ধাস্পদেষু

পশ্চিমের ঘর

— য়ুয়ান চেন

[কবি য়ুয়ান চেন রচিত এই গল্পটি চীনা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প, বহুলপঠিত ও বহুপরিচিত। গল্পটি আত্মচরিতমূলক। গল্পের কাল, ঘটনা, চরিত্র সবই বাস্তব। গল্পের 'চ্যাঙ' যে লেখক নিজেই, তা তিনি বন্ধু বা পরিচিত কাছ থেকেও গোপন রাখতে পারেন নি। গল্পের নায়িকা লেখকের প্রথমা প্রেমিকা। "ইঙইঙের উদ্দেশ্যে" "পো চু-য়ি" প্রভৃতি কবিতায় এই নারীকে নিবিড়ভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। গল্পের বন্ধু ইয়াঙ-ও বাস্তব চরিত্র।]

অফিসের কাজে বেরিয়ে য়ুয়ান চেনকে প্রায়ই পুচেঙের একটা সরাইখানায় দু-একদিন বাস করতে হয়। পুচেঙের এই সরাইখানার ওপর য়ুয়ানের মায়া পড়ে গেছে। বিশেষত ভোরবেলায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে সন্নিহিত মঠ থেকে ভেসে-আসা ঘণ্টাধ্বনি শুনতে ভীষণ ভালো লাগে তার, মনের অতলে একটা আশ্চর্য অনুরণন জাগিয়ে তোলে, তখন নিজেকে ভীষণ তরুণ আর রোমান্টিক বলে মনে হয়।

চল্লিশের ওপর বয়েস য়ুয়ানের, সুখী স্বামী, জনপ্রিয় কবি, এবং পদস্থ কর্মচারীও বটে। হয়ত ভুলে-যাওয়া উচিতও ছিল, কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার, অনেককাল আগের পুরনো একটা প্রণয়স্মৃতি এতকাল পরেও মাসে-মধ্যে তাকে উন্মনা করে তোলে।

কুড়িটা বছর কেটে গেছে, অথচ মঠের ঐ ঘণ্টাধ্বনি কানে এলেই, বিশেষত ভোরবেলায়—পরিচিত ধ্বনির ছন্দস্পন্দ ও দোলন, এখনো তার হৃদয়কে অসীম বেদনায়, গভীর গোপন সজীব এক আবেগে, অদ্ভুত এক দুঃখ এবং সৌন্দর্যের অনুভূতি এমনভাবে অভিভূত করে তোলে যা তার মতো কবির পক্ষেও বর্ণনা করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে এক তীব্র শ্বাসরোধকারী আবেগের সঙ্গে বিজড়িত প্রচ্ছন্ন তারকা-খচিত পাণ্ডুর এক আকাশের চিত্র, তীব্র

সৌরভ, এবং কল্পনায় একটি মিষ্টি হাসি — এককালে প্রণয়িনী ছিল এমন একটি বালিকার মুখের আধখানা হাসি—তার স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে।

য়ুয়ান তখন বাইশ বছরের যুবক, গল্প কবিতা লিখে বিখ্যাত হবে এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সবে রাজধানীতে এসেছে। তখনো পর্যন্ত কোনো মেয়ের প্রেমে পড়ে নি, এবং মেয়েদের সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুযোগই ঘটে ওঠে নি, কেননা, বুদ্ধিমান এবং অতিশয় অনুভূতি-প্রবণ এই তরুণ তখন পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়ার ব্যাপারেই অপরিসীম ব্যস্ত ছিল। খুব একটা আমুদে বা মিশুক স্বভাবের ছেলে ছিল না, এবং সচরাচর সুন্দরী মেয়েরা—যাদের সম্পর্কে তার বন্ধু-বান্ধবেরা সব সময় বক্‌বক্‌ করে মরত, তারা কেউ তার ছায়াও মাড়াতে চাইত না, যদিও সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী যুবতীদের তার ভীষণ ভালো লাগত, তাঁরা ক্ষণে ক্ষণে আনাগোনা করত তার মনের গোপন ইতিউতি।

তাং যুগের দিনে পরীক্ষার্থীরা জাতীয় পরীক্ষার মাসাধিক, এমন কি ছ'মাস পূর্বেও রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করত, এবং দেশভ্রমণ ও দ্রষ্টব্যস্থানদর্শনের কোনো সুযোগই হাতছাড়া করত না।

সেবার হলুদ নদীর বাঁকের পাশে পুচেঙের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় স্কুলের বন্ধু ইয়াঙের সঙ্গে দেখা করে যাওয়ার জন্যে য়ুয়ান যাত্রা বিরতি করলে ইয়াঙ তাকে দু-একদিন থেকে যাওয়ার জন্যে পেড়াপীড়ি করে, এবং বাধ্য হয়ে য়ুয়ানকে রাজীও হতে হয়। সেই সময় রোজই বিকেলের দিকে বন্ধুর সঙ্গে সে পূর্বদিকে তিন মাইল দূরবর্তী পুচিয়ু মঠে বেড়াতে যেত। খুব সুন্দর জায়গা এই পুচিয়ু। সারা শীতকালটায় সেখানকার পাহাড়গুলো কিশমিশ ফুলে ছেয়ে থাকে। ঠাণ্ডা আবহাওয়া, কিন্তু সতেজ, উজ্জ্বল এবং শুষ্ক। এখান থেকে আদিগন্ত-বিস্তৃত নদী এবং দক্ষিণে দূরবর্তী টাইপো-পর্বতের দৃশ্যাবলিও চমৎকার দেখা যায়। এখানকার প্রকৃতি য়ুয়ানকে এতই আকৃষ্ট করে যে মঠের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তীর্থযাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট

অতিথিশালায় কিছুদিন বসবাস করার অনুমতিও সে আদায় করে ফেলে।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে সাম্রাজ্ঞী য়ু কর্তৃক এই মঠটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃহদাকার মঠ, ঝকমকে হলদে ছাদ, সর্বত্র কারুশিল্পের ছড়াছড়ি। গ্রীষ্মকালে উৎসবের সময় কম করে একশ লোক মঠের অতিথিশালায় আশ্রয় নিতে পারে। কৃষক এবং তাদের পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি সস্তা ঘর ছাড়া অভিজাত ও ধনী অতিথিদের জন্যও বেশ কয়েকটি সুসজ্জিত প্রাসাদোপম মহার্ঘ কক্ষও মঠে আছে।

য়ুয়ান উত্তর-পশ্চিমপ্রান্তে একটি নির্জন ও নিরিবিলি ঘর পছন্দ করল। পিছনদিকে লম্বা লম্বা গাছের মধ্যে দিয়ে সবুজ সূর্যকিরণ সংরক্ষিত চতুষ্কের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। সম্মুখ দিকে আচ্ছাদিত বারান্দার ষড়্‌ভুজাকৃতি জানলাগুলির ভিতর দিয়ে দূরবর্তী মহানদী ও পর্বতের দৃশ্যও দেখা যায়। ঘরটা এবং ঘরের আসবাব খুবই সাধারণ, কিন্তু বেশ আরামদায়ক। য়ুয়ানের আনন্দ ধরে না, পুরো গ্রীষ্মকালটা বেশ কয়েকখানা কাব্যগ্রন্থ (যা সর্বদাই সে তার খুদে লাগেজটার ভেতর লুকিয়ে রাখত) পাঠ করে অবলীলাক্রমে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

'এমন চমৎকার একটা জায়গা বেছে-নেওয়া কেবল তোমার মতো একজন রোমান্টিকের পক্ষেই সাজে', ইয়াঙ বলল।

'রোমান্টিক বলছ কেন?'

'চাঁদ, ফুল, তুষার, এবং বায়ু-হিল্লোলিত পাহাড়—সবই ত রোমান্সের পক্ষে আদর্শ জায়গা।'

'বোকামি করো না। সুখ চাইলে রাজধানী যেতে পারতাম। তা না, একেবারে সন্ন্যেসী হয়ে এখানে কয়েক হপ্তা আমি বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতে চাই।'

ইয়াঙ জানত যে তার বন্ধু ভীষণ অনুভূতিপ্রবণ, এক গুঁয়ে, এবং তা-ই বাধাও দিল না।

প্রথম দিনই য়ুয়ান আবিষ্কার করল যে পশ্চিমদিকে মন্দিরের দেয়াল ঘেঁষে এক ধনাঢ্য পরিবারের একটি চমৎকার বাগানবাড়ি আছে, পশ্চিমদিকের জানলা থেকে য়ুয়ানের চোখে পড়ল। দেয়ালের কাছাকাছি পর্যন্ত ছড়িয়ে-পড়া কুলগাছের ডাল-পালায় আধ-ঢাকা কালো রঙের টালির ছাদ দেখেই বোঝা যায় সেখানে একটা বড়োসড়ো বাড়ি এবং বাড়ির ভেতরে কয়েক খণ্ড উঠোনও আছে। চাকরের মুখ থেকে জানতে পারল, বাগানবাড়িটি মঠের সম্পত্তির একটি অংশ, এবং সুই নামে একটি পরিবার ঐ অংশটা দখল করে আছে। পরিবারের কর্তা, এখন মৃত, মঠের একজন পৃষ্ঠপোষক এবং মঠাধ্যক্ষের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, এবং যখনই শহরের বাইরে বেড়াতে যেতে ইচ্ছে হত তখনই তিনি সপরিবারে এই মঠে চলে আসতেন। শ্রীমতী সুই একটু ভীতু প্রকৃতির মহিলা, তাই স্বামীর মৃত্যুর পর অধিকতর নিরাপত্তার আশায় স্থায়িভাবে বসবাস করবেন বলে মঠেই চলে আসেন। সুই-পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের খাতিরে এবং বাগানবাড়িটি অংশত শ্রী[illegible] সুইয়ের স্বামীর অর্থানুকূল্যে নির্মিত হয়েছিল বলে মঠা[illegible]ও এই ব্যবস্থায় সম্মত হন।

তৃতীয় যামে যুবক য়ুয়ান দূর থেকে ভেসে আসা সেতারের মিষ্টি, মিহি ও বিষণ্ণ বাজনা—মেয়েলি হাতের আলাপ ও গৎ শুনতে পেয়ে বিছানা ছেড়ে বারান্দায় বেরিয়ে আসতে বাধ্য হল, নিভৃত রাত্রে নিস্তব্ধ মঠে ঐ মোহসঞ্চারী যন্ত্রসঙ্গীত অদ্ভুত উদ্দীপনা জাগাল য়ুয়ানের মনে।

পরদিন সকালবেলা, কৌতূহল ক্রমশ বেড়েই চলেছিল, য়ুয়ান মঠের মাঠে বেড়াতে বেড়াতে ঐ দেয়ালঘেরা বাগানবাড়িটা আবার দেখল, কিন্তু বাড়ির ভেতরের বিশেষ কিছুই তার নজরে পড়ল না। বাড়িটার সামনে দিয়ে একটা ছোট্ট নদী বয়ে গেছে, মন্দিরের পেছনেও ঐ একই নদী, এবং বাড়িটার গেট পর্যন্ত লাল রঙের একটা সুন্দর ব্রীজ, ঐ ব্রীজের উপর দিয়ে ওখানে পৌঁছনো খুবই সহজ। দরোজা বন্ধ ছিল, এবং গেটের ওপরে আঁটা পুরনো ছেঁড়া শাদা কাগজের চতুর্ভুজ

একটা পথ নিচের দিকে প্রায় পঞ্চাশ গজ পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে মঠের দরোজার নিকটবর্তী প্রধান সড়কের সঙ্গে মিশে গেছে। বিকশিত কুলফুলের গন্ধে বাতাস বেশ ভারি। ছোট্ট নদীটা দেয়ালের একটা ছিদ্রপথের ভেতর দিয়ে বাগানের প্রান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে প্রধান নদীর সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এই অপূর্ব নির্জনে বসবাসকারী সুখী পরিবার, এবং বিগত রাত্রে শোনা অপরিচিতা বাদিকার অপূর্ব যন্ত্রধ্বনি—এখনো যাকে চোখে দেখা গেল না,—য়ুয়ান বিমুগ্ধ চিত্তে ভাবছিল, কেমন তারা? ফিরে আসার সময় য়ুয়ান ঝুঝতে পারল মঠের যে অংশে সে আছে সেটা ঐ বাড়িটার পেছন দিক।

পুরো একটা সপ্তাহ কেটে গেল এইভাবে, এবং বাকি সপ্তাহ বা দিনগুলিও হয়ত এইভাবেই কেটে যেত, দ্বিতীয় সপ্তাহের মাঝামাঝি যা ঘটে গেল তা যদি না ঘটত,—এবং তাহলে বাগানবাড়ির ঐ সুখী মানুষদের কথা হয়ত ক্রমে ক্রমে বিস্মৃত হতে হত, কে জানে!

খবর রটল যে শহরে লুণ্ঠন এবং দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে। সৈন্যাধ্যক্ষ তুন চ্যানের মৃত্যু হয়েছে, এবং তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সুযোগে বিশৃঙ্খল সেনাবাহিনী শহরময় অবাধ লুণ্ঠনে মেতে উঠেছে। তারা দোকান-পাট সব লুঠ করছে, এবং প্রজাদের ঘর থেকে যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। কিছু সংখ্যক সৈন্য শহর লুঠ শেষ করে নদীর দিকে এগিয়ে আসছে।

ঠিক মধ্যাহ্নের কিছু আগে একদল পদাতিক সৈন্য গ্রামের কাছে এসে পড়ল। য়ুয়ান তখন কোলের ওপর সেও হাওজানের একখানি কাব্য রেখে একটা টেবিলের ওপর পা তুলে একটা বেতের চেয়ারে বসে বিশ্রাম করছিল। হঠাৎ সামনের বারান্দায় উত্তেজনাময় মেয়েলি কণ্ঠস্বর এবং চলাফেরার শব্দ শুনে য়ুয়ান কি ঘটল জানতে উঠে এল। য়ুয়ানের ঘরটা রাস্তার শেষ প্রান্তে। য়ুয়ান অবাক হয়ে গেল, একটা দরোজা সদাসর্বদার জন্য তালা দেওয়া থাকে, সেই দরোজাটা কখনো

তার নজরে পড়োন, দরোজাটা এখন খোলা, এবং একজন মধ্যবয়স্ক মহিলা, চল্লিশের কাছাকাছি বয়েস, এবং ছুটি মেয়ে ঘোরানো বারান্দা দিয়ে প্রধান মঠের দিকে প্রায় রণপায়ে ছুটে যাচ্ছিল। দামী পোশাক পরিহিতা মহিলা আগে আগে ছুটছিলেন, এবং সতের-আঠের বছরের একটি মেয়ে ও একটি পরিচারিকা তাঁকে অনুসরণ করে ছুটছিল। মেয়েটি একটা সাদাসিদে পুরনো ঘন নীল পোশাক পরেছিল, তার চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সে চুলগুলো হাতের মুঠোয় ধরে রাখতে চেষ্টা করছিল। য়ুয়ান নিশ্চিত হল যে এই মেয়েটিই সেই অপরিচিতা সেতারবাদিকা। মহিলাদের এভাবে মাথা নিচু করে পড়ি-মরি করে ছুটতে দেখে য়ুয়ান বুঝতে পারল তাঁরা কোনো কারণে ভীষণ ভয় পেয়েছেন।

তরুণীটির ঐ উদ্দীপনাময় ভঙ্গিটি য়ুয়ান খুব উপভোগ করল এবং তার অনন্য দেহসৌষ্ঠব তাকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করল। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে সেও দ্রুতপদে ওদের অনুসরণ করল। মঠের সন্ন্যাসী এবং চাকরবাকরদের মধ্যে একটা সোরগোল পড়ে গিয়েছিল। এক মহিলা কাঁদতে-কাঁদতে বর্ণনা করছিলেন কিভাবে মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে তার স্বামী মৃত্যু বরণ করেছেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কারো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তরুণীটি গভীর মনোযোগের সঙ্গে মহিলার কথা শুনছিল। তার মাথায় একরাশ ঘনকালো চুল, শুভ্র কাঁধ, ছোট্টো মুখ, মুখাবয়বও বেশ ছোটো। তার মাকে ভয়ানক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বলে মনে হচ্ছিল, ভয় পাচ্ছিলেন, হয়ত সৈন্যরা তাঁর বাড়িও চড়াও হতে পারে এই ভেবে, কেন না সকলেই জানে যে তাঁদের অবস্থা বেশ সচ্ছল। মঠাধ্যক্ষ বেরিয়ে এলেন, এবং মহিলাকে অভয় দিয়ে বললেন যে, বিপদ বুঝলে তিনি মেয়েদের লুকিয়ে থাকার মতো একটা গুপ্ত স্থানের ব্যবস্থা করে দেবেন। ইতর সৈন্যরা, যারা কেবল লুঠ করার জন্যেই বেরিয়েছে, মঠের পবিত্রতা নষ্ট করতে তাদের সাহস হবে না।

'মা, আমি দুর্ভাবনা করছি না,' শান্ত স্বরে তরুণী বলল, 'আমরা আমাদের বাড়িতেই থাকব, নচেৎ ওরা খালি পেয়ে আমাদের বাড়ি ডাকাতি করবে। প্রয়োজন মতো পেছনের দরোজা দিয়ে মঠের ভেতর ঢুকে পড়ার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে।'

বালিকার টিকোল নাক এবং মসৃণ গালে উজ্জ্বল সূর্যালোক ঠিকরে পড়েছিল। যদি যুগপৎ বুদ্ধি ও সৌন্দর্য নারীর ভূষণ বলে গণ্য না হয় তাহলে তার কপালটিকে ঠিক মেয়েলি বলা যাবে না। মহিলা মেয়ের উপদেশ শুনলেন। মনে হল মেয়ের বিচার-বিবেচনার ওপর তিনি অনেকখানি নির্ভর করে থাকেন।

বয়সে তরুণ বলে এবং শিষ্টাচারসম্পন্ন ভদ্রলোক হিসেবে বিপন্ন তরুণীকে সাহায্য করার তাগিদে য়ুয়ান মঠাধ্যক্ষের কাছে গিয়ে নিখুঁত এবং শিষ্টাচারসম্মত হাবভাবের সঙ্গে, তরুণীর দিকে না তাকিয়ে, মঠাধ্যক্ষকে বলল যে উপস্থিত পরিস্থিতিতে মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য সবরকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। সে আরো বলল যে তার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে যে আঞ্চলিক সামরিক অধিনায়কের বিশেষ পরিচিত, বন্ধুকে সে অনুরোধ করলে এখানকার নিরাপত্তার জন্য বন্ধু অধিনায়কের সাহায্য পৌঁছে দিতে পারে, মঠের নিরাপত্তার জন্য আধ-ডজন অস্ত্রধারী নিরাপত্তারক্ষীর ব্যবস্থা করে দিতে পারে।

'প্রস্তাবটা খুবই সঙ্গত,' য়ুয়ানের দিকে উকিলের মতো চোখ তুলে তরুণী বলল। মা যুবকের নাম জিগ্যেস করলেন, য়ুয়ান নিজের পরিচয় দিল।

এইভাবে সুই-পরিবারের সঙ্গে আকস্মিকভাবে আলাপের সুযোগ ঘটে যাওয়ায় হৃষ্টচিত্তে য়ুয়ান জানাল যে অনতিবিলম্বে সে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবে।

বিকেলে য়ুয়ান ছ-জন সৈন্য, এবং অবাধ্য সৈন্যদের সুই-ভবন ছেড়ে চলে যাওয়ার বিষয়ে আঞ্চলিক অধিনায়কের সই-করা একটা

নির্দেশনামা হাতে নিয়ে ফিরে এল। এরপর লুণ্ঠনকারী সৈন্যরা স্থই-ভবন ছেড়ে পালাতে এক মুহূর্তও দ্বিধা করল না।

নিজের সাফল্যে খুশী হয়ে য়ুয়ান স্বভাবতই সুন্দরী তরুণীটির কাছ থেকে একটা কৃতজ্ঞতার হাসি আশা করতে পারে। এই আশা নিয়ে সে যথারীতি স্থইদের সুসজ্জিত অভিজাত বৈঠকখানায় হাজিরও হল। মা সঙ্গে সঙ্গেই তার সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে এলেন। তাঁদের জন্য য়ুয়ান অনেক কষ্ট স্বীকার করেছে বলে তিনি তার যথেষ্ট প্রশংসা করলেন। য়ুয়ান বুঝতে পারল বিপদকালে সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রভাবের ব্যাপারে সে যা করেছে তার জন্যে মা তার ওপর খুবই প্রীত হয়েছেন। কিন্তু কিছুক্ষণ বসে থেকেও বালিকার দেখা না পেয়ে যথেষ্ট হতাশ হয়েই তাকে সেদিন ফিরে আসতে হল।

কিছুদিনের মধ্যে আঞ্চলিক অধিনায়কের নিজস্ব বাহিনী এসে পৌঁছলে শহরে আবার শান্তিশৃঙ্খলা ফিরে এল, রক্ষীদেরও সরিয়ে নেওয়া হল। শ্রীমতী স্থই য়ুয়ানকে একদিন দ্বিপ্রাহরিক ভোজে নেমন্তন্ন করলেন।

'আপনি আমাদের জন্যে যা করেছেন তার জন্যে আমরা আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই,' মা বললেন, 'এবং আমার পরিবারের সকলের সঙ্গে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।'

হুয়ান শ্যাঙ (আনন্দ) নামে বছর দশেকের একটি বালককে ডেকে মা য়ুয়ানকে 'দাদা' বলে অভিবাদন জানাতে আদেশ করলেন।

'ঐ আমার একমাত্র ছেলে', শ্রীমতী স্থই হেসে বললেন, 'ইঙইঙ, বেরিয়ে এসো, এবং যিনি আমাদের জীবন রক্ষা করেছেন সেই ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে যাও।'

মেয়েটি আসতে খানিকটা দেরি করল। য়ুয়ান ভাবল রীতিগত প্রাথমিক আলাপচারিতে হয়ত সঙ্কোচ বোধ করছে মেয়েটি, সাধারণত বড়ো-ঘরের মেয়েরা একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত যুবকের সামনে বসে কথা বলতে হবে ভেবে যেরকমটা করে থাকে।

মা অধৈর্যের সঙ্গে আবার ডাকলেন, 'ইঙইঙ, আমি তোমাকে এখানে আসতে বলছি। য়ুয়ান তোমার এবং তোমার মায়ের জীবন রক্ষা করেছেন। এখন সংস্কার মেনে চলবার কি খুব দরকার আছে ?'

মায়ের কথা শুনে এবার মেয়েটি বেরিয়ে এল, এবং সলজ্জভাবে অথচ সগর্বে নত হয়ে য়ুয়ানকে অভিবাদনও করল। একটা আঁটোসাটো সাধারণ পোশাক পরেছিল ইঙইঙ, অথচ তার অঙ্গবাসাদি ছিল সম্পূর্ণ নিখুঁত এবং বিনম্র। সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েদের মতো মায়ের পাশের চেয়ারে এমন নিঃশব্দে বসল ইঙইঙ যাতে দর্শনার্থীর মনে এই ধারণাই হয় যে, তাকে দেখতে পাওয়া রীতিমতো একটা ভাগ্যের ব্যাপার। সামাজিক প্রথা অনুসারে য়ুয়ান মাকে জিগ্যেস করল, 'আপনার মেয়ের বয়স কত ?'

'বর্তমান সম্রাটের কালেই ওর জন্ম,···সালে,—এই সতের বছর।'

যদিও ঘরোয়া ভোজ, এবং য়ুয়ানই একমাত্র অতিথি, তথাপি মেয়ে হয়ত যুবকের উপস্থিতি সম্পর্কেই অতিমাত্রায় সচেতন। খাওয়ার সময় সর্বক্ষণ সে একেবারে নিখুঁত এবং দূরত্বসূচক ব্যবহার রক্ষা করে গেল। য়ুয়ান কয়েকবার পরিচিত বিষয়ে কথাবার্তা উত্থাপন করতে চাইল,—তার মৃত বাবা বা ছোটো ভাইয়ের লেখাপড়ার ব্যাপারে, কিন্তু ইঙইঙ তাতে কোনো উচ্চবাচ্যই করল না। একটা সাধারণ মেয়ে, ধর্মশীলা কিংবা ছেনাল যা-ই হোক,—একজন যুবকের উপস্থিতিকে সে গ্রাহ্য করে থাকে এবং কিছু উপলব্ধি বা উপভোগও করে থাকে, এবং তার ব্যবহার থেকে তা প্রকাশও পায়। কিন্তু এই মোহময়ী বালিকাটিকে য়ুয়ানের প্রহেলিকা বলেই মনে হয়, একটা স্ফিঙ্কস্ বা পরী-রাজকন্যা, যাকে সাধারণ মানবিক অনুভূতি স্পর্শ করতেও পারে না। মেয়েটি যে খুব অনমনীয় এবং ধর্মশীলা—য়ুয়ান তা বিশ্বাস করতে পারছিল না। ভাবছিল ঃ তার বাইরের শৈত্য কি ভিতরের কোনো গভীর আবেগের মুখোশমাত্র, নাকি কনফুশিয়ান নিয়মনিষ্ঠায় পরিবর্ধিত বালিকাদের অতিরিক্ত গাম্ভীর্যের ছদ্মবেশ ?

ভোজনপর্বের সময়ে য়ুয়ান জানতে পারল যে বিধবা সুইয়ের কুমারী পদবী ছিল চেঙ, য়ুয়ানের মায়ের কুমারী পদবী ও তা-ই। এবং একই বংশোদ্ভব বলে, যথার্থত, সম্পর্কে মহিলা তার মাসি।

য়ুয়ান সম্পর্কে বোনপো হয় জানতে পেরে শ্রীমতী সুই ও তাঁর মনের উল্লাস গোপন করে রাখতে পারলেন না, বোনপোকে সানন্দে আর একখানা সেঁকা রুটি দেওয়ার প্রস্তাব করলেন, আর তখনই কেবল মেয়ের মুখটা হাসির আভায় একটু কোমল হয়ে উঠল।

বালিকার স্বভাবে য়ুয়ান যুগপৎ আকৃষ্ট ও বিরক্ত বোধ করল। এমন গর্বিত, গম্ভীর এবং আত্মকেন্দ্রিক মেয়ে এর আগে য়ুয়ান আর দেখে নি। অথচ যতোই নিজের অনুভূতির বিরুদ্ধে সে সংগ্রাম করতে লাগল, ততোই সে তার প্রতি সম্মোহিত বোধ করতে লাগল, এবং তাকে পাওয়ার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠতে লাগল।

এরপর নানান অছিলায় প্রায়ই সে তাদের বাড়ি আসতে লাগল। কখনো নিছক খবর নিতে আসা, কখনো বা ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে-আসা, ইত্যাদি। নিজের উপস্থিতিকে বেশ সরবে ঘোষণা করেই সে আসে, এবং ইঙইঙও নিশ্চয়ই আড়াল-আবডাল থেকে তাকে দেখে—যেমন ধনী পরিবারের মেয়েরা জাফরি-কাটা পর্দার আড়াল থেকে এরকম অনেক কিছুই দেখেশুনে থাকে। কিন্তু অগ্রসরমান শিকারী পশুকে দেখে হরিণী যেমন ভয় পায়, য়ুয়ানকে দেখে বালিকাও তেমনি। একদিন পেছনের বাগানে য়ুয়ান তাকে ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে খেলা করতে দেখতে পেল, কিন্তু য়ুয়ানকে দেখামাত্র সে ছুটে পালিয়ে গেল, এবং মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। 'ওরিয়োল, ওরিয়োল' সে চেঁচিয়ে বলল, কি আশ্চর্য দুর্বোধ্য ওরিয়োল।'

একদিন পরিচারিকার সঙ্গে য়ুয়ানের হঠাৎ দরোজার সামনে দেখা হয়ে গেল। হাঙইয়িঙ (অর্থাৎ গোলাপ) নামের এই পরিচারিকা বেশ সাধারণ সাদাসিদে মেয়ে, এবং একদিক থেকে দেখতেও বেশ সুশ্রী

ও আকর্ষণীয়, দেখে মনে হয় জগৎ সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহালও বটে। সুযোগ পেয়ে য়ুয়ান তার কাছে ইঙইঙ সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ায় তার মুখ রাঙা হয়ে উঠল, অথচ বিজ্ঞের মতো সে হাসলও বটে।

'বলতে পারো, তোমার কর্ত্রী (mistress) বাগ্‌দত্তা কিনা?' য়ুয়ান জিগ্যেস করল।

'না?—কিন্তু এ প্রশ্ন কেন?

'আমরা সম্পর্কে ভাইবোন, এবং তাই আমি ওর সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে চাই। তুমি জানো যে আমাদের দুজনের পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ আজ পর্যন্ত পেলাম না, সেরকম একটু সুযোগ পেলে আমি খুব খুশী হই।'

গোলাপ নিশ্চুপ, কেবল তাকিয়ে থাকে।

'ও কেন আমাকে এড়িয়ে যেতে চায় বলতে পারো?'

'আমি কি করে জানব?'

'ওকে দেখে এমন আশ্চর্য, রুচিবতী আর ভদ্র বলে আমার মনে হয়—মানে আমি সত্যিই ওর ভীষণ গুণমুগ্ধ।' য়ুয়ান কথাটা শেষ পর্যন্ত প্রকাশই করে ফেলল।

'আচ্ছা। তা আপনি তো মাকে বলেও ওঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে পারেন।'

'তা হয় না। মা আশেপাশে থাকলে তো ও মুখ খুলতেই চায় না। কেবল ওরই সঙ্গে দেখা করার কোনো সুযোগ করে দিতে পারো তুমি? ওকে দেখার পর থেকে আমি অন্য কিছু চিন্তা করতেই পারি না।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি', পরিচারিকা বলল, এবং হাত দিয়ে মুখটা চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে ছুটে পালাল।

'গোলাপ! গোলাপ!' চেঁচাতে চেঁচাতে য়ুয়ান তার পেছনে ধাওয়া করল। গোলাপ দাঁড়ালে সে বলল, 'গোলাপ, তোমাকে মিনতি করে বলছি, তুমি আমাকে সাহায্য কর।'

বলল, 'এরকম খবর পৌঁছে দেওয়ার দুঃসাহস আমার নেই। আমার কর্ত্রী খুব কড়া ধাতের মেয়ে। আজ পর্যন্ত কোনো যুবকের সঙ্গে একটি কথাও বলেছে বলে জানি না। কিন্তু শ্রীযুক্ত য়ুয়ান, আপনি একজন ভদ্রলোক, এবং আমার মনিব-পরিবারের যথেষ্ট উপকার করেছেন। আপনাকে আমিও পছন্দ করি। আপনাকে আমি একটা গোপন পরামর্শ দেই। সে কবিতা পড়ে, এবং লেখেও। সদাসর্বদা বই মুখে করে বসে থাকে, এবং ভাবনার রাজ্যে ভেসে বেড়ায়। আপনি একটা কবিতা লিখে তার কাছে পাঠিয়ে দেখতে পারেন। যদি কোনো উপায় আদৌ থাকে তবে একমাত্র এই উপায়েই আপনার প্রতি তার হৃদয়কে উন্মুক্ত করে তোলা সম্ভব। ভবিষ্যতে হয়ত এই উপদেশের জন্যে আপনাকে আমাকে ধন্যবাদ জানাতে হবে।' এই বলে ছেনালের মতো চোখ টিপে পরিচারিকা কেটে পড়ল।

পরদিন য়ুয়ান পরিচারিকার হাত দিয়ে একটি কবিতা পাঠাল।

নিঃশব্দ, নিবিড় চতুষ্ক সবুজ আলোয় পরিপ্লুত,
ওরিয়োলের কূজন থেমে গেছে, এবং বৃক্ষচ্ছায়ায় এখন সে নিদ্রিত
রুদ্ধদ্বার প্রেমিক বাগিচাসমুদ্রে ভাসমান ফুলের পাপড়ির দিকে
তাকিয়ে হারিয়ে গেছে।
আজি নিভন্ত প্রভাতী চাঁদকে নিরীক্ষণ করছি,
তোমার মুখচন্দ্রমার ধ্যানে আমি আত্মহারা,
একটু সদয় বাঁক – একটি সমুজ্জ্বল হাসির প্রত্যাশায়
আমি দ্বিধাকম্পিত।

সেদিন সন্ধ্যায় গোলাপ ইংইংএর কাছ থেকে, তারই লেখা একটি কবিতা নিয়ে এল, কবিতাটির নাম 'পূর্ণিমার রাত'।

পশ্চিমের কক্ষে আধখোলা দরোজা,
চন্দ্র-খচিত রাতে কে একজন অপেক্ষমান।

দেয়ালের ওপরে আন্দোলিত পুষ্পময়ী ছায়া—
আহা, হয়ত এসেছে আমার প্রেম।

তারিখটা ফেব্রুয়ারির চোদ্দ। য়ুয়ান আনন্দে পাগল হয়ে উঠল। এ-তো কোনো সঙ্কেতকুঞ্জে সুস্পষ্ট আহ্বান! যা ছিল স্বপ্নাতীত,—রাত্রে সেখানে মিলনের নির্দেশ—তারই আমন্ত্রণ!

ষোলো দিনের দিন কবিতার নির্দেশ মতো কুলগাছে চড়ে দেয়াল বেয়ে উঠে য়ুয়ান ভেতরের দিকে উঁকিঝুঁকি দেয়। সবিস্ময়ে দেখে, বাস্তবিকই, পশ্চিমের কক্ষের দরোজা হাট করে খোলা। তর্‌তর্‌ করে নিচে নেমে এসে সেই ঘরে সে ঢুকে পড়ে।

গোলাপ ঘুমুচ্ছিল, তাকে জাগাল। পরিচারিকা অবাক হয়ে গিয়েছিল। 'আপনি এখানে কেন এসেছেন? কি চান আপনি?' সে কম্পিত স্বরে জিগ্যেস করল।

'ও আমাকে আসতে আহ্বান করেছে', য়ুয়ান বলল, 'দয়া করে ওকে জানিয়ে এসো আমি এসেছি।'

দশ মিনিটকাল অসহ্য উদ্বেগ নিয়ে য়ুয়ান অপেক্ষা করতে লাগল। দশ মিনিট পরে ইংইং এল, 'দ্বিধায় কম্পিত পদে কম্প্র বক্ষে'। কিন্তু চোখেমুখে কি অস্থির উত্তেজনা, আর লজ্জা, অথচ তার গভীর কালো চোখ দুটিতে রহস্যের কি সীমাহীন কুয়াশা!

লজ্জার ক্ষণিক ঢেউ প্রশমিত হলে কিছুটা রুক্ষস্বরে সে য়ুয়ানকে উদ্দেশ্য করেই বলল, 'আপনাকে আমি আহ্বান করেছি শ্রীযুক্ত য়ুয়ান, কারণ, আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। আপনি আমার মাকে এবং আমাদের বাঁচাতে যা করেছেন তার জন্যে আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, এবং সে-সবের জন্যে ব্যক্তিগতভাবে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা পরস্পর সম্পর্কিত ভাইবোন জানতে পেরে আমি সত্যিই খুব আনন্দিত; কিন্তু আমি বিস্মিত হয়েছি আমার পরিচারিকাকে দিয়ে আপনার একটা প্রেমের কবিতা লিখে আমার কাছে পাঠানোয়। আমি এ ব্যাপারে মাকে কিছুই জানাব না তা

ঠিক,—জানাতে পারবও না, কেননা, তাতে আপনার ভালো হবে না ; তাই ভেবে স্থির করলাম আপনাকে একান্তে ডেকে ব্যক্তিগতভাবে এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করতে বলাই সর্বাপেক্ষা শ্রেয় হবে।' লজ্জায়—যেন অপরিসীম লজ্জাই চুপ করাল তাকে। শুনতে শুনতে য়ুয়ানের মনে হল বলবে বলে এই কথাগুলিই মেয়েটা দীর্ঘক্ষণ ধরে মুখস্থ করেছে।

য়ুয়ান বিবর্ণ হয়ে গেল। 'কিন্তু কুমারী সুই, আমি কেবল আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলার জন্যেই অনুমতি প্রার্থনা করেছিলাম, এবং আপনি আমাকে ঐ কবিতাটা পাঠিয়েছেন বলেই আমি এসেছি।'

'হ্যাঁ, আপনাকে আমি আমন্ত্রণই করেছি', বালিকা দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিল, 'ঝুঁকিটা আমিই নিয়েছি—সানন্দেই নিয়েছি। কিন্তু তাই বলে ভাববেন না যে আমি কোনো মন্দ অভিপ্রায়ে এই কাজটি করেছি। আমাকে ভুল বুঝবেন না আশা করি।' প্রচ্ছন্ন আবেগে তার গলাটা কেঁপে উঠল ; তারপর মুখ ফিরিয়ে দ্রুতপদে সে চলে গেল।

হতাশা এবং লজ্জায় য়ুয়ান খেপে গেল। এরকমটা হবে সে বুঝতে পারে নি, বিশ্বাসই করতে পারে নি। তাহলে পরিচারিকার হাত দিয়ে একটা সোজাসুজি জবাব না পাঠিয়ে ওরকম স্পষ্ট ব্যঞ্জনাময় কবিতা লিখে পাঠানোরই বা কি দরকার ছিল? কষ্ট করে ডাকিয়ে এনে এরকম জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শোনানোর কোনো মানেই হয় না। তবে কি, যে সব কথা বলল সে সম্পর্কে ভয় পেয়ে শেষ মুহূর্তে মত বদলেছিল মেয়েটা, কে জানে! কি আশ্চর্য খেয়ালি এই মেয়েজাতটা। ওদের বোঝা যার তার কর্ম নয়। এখন দেখে তো একটা ঠাণ্ডা পাথর প্রতিমা বলেই মনে হল। য়ুয়ানের ভালোবাসা মুহূর্তে ঘৃণায় রূপান্তরিত হল, কারণ, তার মনে হল মেয়েটা তাকে নিয়ে কৌতুক করেছে।

পরপর দু রাত কেটে গেল, য়ুয়ান নিজের বিছানায় ঘুমুচ্ছিল, ঘুমের ভেতর মনে হল কেউ যেন তাকে ঠেলা দিচ্ছে। জেগে উঠে আলো জ্বালিয়ে য়ুয়ান দেখতে পেল সম্মুখে গোলাপ দাঁড়িয়ে আছে।

'শোনো, ওঠো। ও আসছে।' ফিসফিস করে কথাগুলি বলে ঘর ছেড়ে গোলাপ চলে গেল।

চোখ মুছতে-মুছতে য়ুয়ান বিছানার ওপর উঠে বসল, সে যে জেগে আছে, বিশ্বাস করতে পারল না। গায়ে একটা কাপড় জড়িয়ে নিয়ে বসে-বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

শীঘ্রই ইঙইঙকে সঙ্গে নিয়ে পরিচারিকা ফিরে এল; ব্রীড়াময়, অস্থির, লাল হয়ে উঠেছে বালিকার মুখ; এবং দেখে মনে হচ্ছিল সাহায্যের জন্য পরিচারিকার ওপর ঝুঁকে পড়েছে। সমস্ত অহঙ্কার এবং উদ্ধত আত্মনিয়ন্ত্রণশক্তি কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে। কোনো ওজর দেখাল না, কিন্তু ব্যাখ্যাও করল না। ঘাড়ের ওপর ছড়িয়ে পড়েছিল একরাশ অবাধ্য চুল, এবং দীর্ঘক্ষণ সে আশ্চর্য দুটি চোখ মেলে য়ুয়ানের দিকে চেয়ে থাকল। কি নিবিড় কালো তার দৃষ্টি,—সেখানেও কি কোনো ব্যাখ্যা ছিল!

য়ুয়ানের বুক কাঁপছিল। আগের ঘটনার ঠাণ্ডা প্রত্যাখ্যানের চেয়ে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় এই আত্মসমর্পণ তার কাছে অধিকতর বিস্ময়কর বলে মনে হল। এবং মনোবাসিতাকে কাছে পেয়ে তার সমস্ত রাগ মুহূর্তে গলে জল হয়ে গেল।

পরিচারিকা একটা বালিশ নিয়ে এসে ক্ষিপ্র হাতে বিছানায় রেখে দিয়ে ঝড়ের বেগে আবার বেরিয়ে গেল। বালিকা সর্বপ্রথম আলোটা নিবিয়ে দিল, কিন্তু তখনো পর্যন্ত একটি কথাও বলে নি। য়ুয়ান তার দিকে এগিয়ে গেল, এবং নিজের ঘনিষ্ঠ দূরত্বে ঐ শরীরী উষ্ণতাকে অনুভব করে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। দ্রুততার সঙ্গে বালিকা য়ুয়ানের ঠোঁট দুটি নিজের ঠোঁটের ভেতরে গলিয়ে নিতেই য়ুয়ান বালিকার সর্বাঙ্গে একটা তীব্র শিহরণের প্রবাহ উপলব্ধি করল, এবং তার নিশ্বাসের দ্রুত ওঠা-নামার স্পন্দনও শুনতে পেল। আবার, একটি কথাও না বলে, বালিকা একটা স্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গিতে নিঃশব্দে বিছানার ওপর ডুবে গেল, তার পা দুটো শরীরের ভার আর যেন বইতে পারছিল না।

মঠের প্রভাতী উপাসনার ঘন্টাধ্বনিতে য়ুয়ানের ঘুম ভাঙল। সকাল হয়ে আসছে। গোলাপ এসে ইউইউকে জাগিয়ে চলে যেতে বলল। ইউইউ ওঠে, প্রভাতের অস্পষ্ট আলোয় পোশাক পরে নেয়। তারপর হাত দিয়ে মাথার চুলগুলো গোছগাছ করে নিয়ে পরিচারিকার পেছনে পেছনে চলতে থাকে, মুখে অবসাদের চিহ্ন। নিঃশব্দে দরোজা বন্ধ করে দেয় য়ুয়ান। সারারাতে ইউইউ একটি কথাও বলেনি, কেবল য়ুয়ানই বকবক করেছে। যখন য়ুয়ান ভালোবাসার কথা বলেছে, তখন ইউইউ কেবল চাপা দীর্ঘশ্বাস, শরীরী উষ্ণতা এবং ভিজে চুম্বন দিয়েই তার উত্তর দিয়েছে।

য়ুয়ান হঠাৎই উঠে বসল—যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল এমন বিস্ময়। অথচ এখনো এক আশ্চর্য রমণীয় সুবাস ছড়িয়ে রয়েছে ঘরময়, এক তোয়ালের ওপরে কিছু ফুল চিহ্ন দৃষ্টি এড়াল না তার। হ্যাঁ, সবই সত্যি। শিক্ষকের নাতি মেয়েটা—যাকে উদাসীন এবং নির্লিপ্ত বলেই মনে হয়েছিল, আর নিজেদের ক্ষমতা হারিয়ে সম্পূর্ণভাবে কামনাসিক্ত হয়ে আজ সে তার সর্বস্ব দান করে গেছে। একি নিছক কামনা, না ভালোবাসা? নিজের ইচ্ছাতেই তার কাছে এসেছে মেয়েটা। অথচ, য়ুয়ানের মনে পড়ল, কি কঠিন ভাষাতেই না সেদিন প্রত্যাখ্যান করেছিল মেয়েটা, বলেছিল: 'হ্যাঁ, আপনাকে আমি আমন্ত্রণই করেছি, চিঠিটা আমিই দিয়েছি। কিন্তু তাই বলে ভাববেন না যে আমি কোনো মন্দ অভিপ্রায়ে এই কাজটি করেছি। আমাকে ভুল বুঝবেন না আশা করি।'

কি ভাবে যে এসব কথা বলেছিল, কে জানে। তবে তার কাছে শেষপর্যন্ত সে যে স্বয়ংগতা হয়েছে, এ তো তার পক্ষে পরম সৌভাগ্য। এক দিন আগেও এরকম সম্ভাবনার কথা সে ভাবতে পেরেছে নাকি?

জীবন যে এত রোমাঞ্চকর এবং সুখকর এর আগে এমন করে কখনো সে উপলব্ধি করতে পারে নি, সে-সুযোগই তো আসেনি কখনো। সৌন্দর্য এবং নিশ্চেতন সুখের একটি অভিনব অজানা

জগতে এখন নির্বাসিত সে। তাই পরদিনও আগন্তুক রাত্রির জন্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতীক্ষা করে বসে থাকে সে—কখন ইঙইঙ একটি উজ্জ্বল রত্ন বা পতঙ্গের মতো এসে ভালোবাসার যাদুতে তার তুচ্ছ ঘরটাকে স্বর্গে রূপান্তরিত করে তোলে, এই আশায় অথচ পরের দিন রাত্রে যে আবার আসবে এমন কোনো ইঙ্গিতই দিয়ে যায় নি ইঙইঙ।

তাহলে কি মুহূর্তের কামনাবশে তার কাছে আসা স্থির করেছিল ইঙইঙ? এবং যা নেহাৎই অবিমৃষ্যকারিতার বশে করে ফেলেছে একদিন, সেই রোমান্সের সুখস্বপ্ন নিয়েই কাটিয়ে দেবে তার কুমারীজীবন? না, য়ুয়ান ঐ যুবতীর সম্পর্কে ভেবে কোনো কুলকিনারা করে উঠতে পারে না।

রাত্রির পর রাত্রি যায়, য়ুয়ান প্রত্যহ গভীর আশা আর তীব্র উদ্বেগ নিয়ে প্রতীক্ষা করে থাকে, তার শিরায় শিরায় উচ্চ রক্তস্রোত দাপাদাপি করে বেড়ায়,—হয়ত তার স্বপ্নকুমারী আরো একবার এসে তার সঙ্গে নিশিবাসরে মিলিত হবে। কিন্তু না, বিফল প্রতীক্ষা, আসে না। এরকম উদ্বিগ্ন করে তোলাই কি ঐ নারীর ছলনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল? য়ুয়ান ভাবে, এবং ভাবে।

প্রত্যেক রাত্রে নিজের ঘরে নিঃসঙ্গ য়ুয়ান বসে থাকে। প্রিয়তমার অভিসারকে বন্দিত করার জন্য সে ধূপ কিনে রেখেছে, অথচ প্রত্যহ সে লক্ষ্য করে ধূপ পুড়ে ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে যায়, ঠাণ্ডা অঙ্গারগুলো এক সময় নিঃশব্দে পাত্রের মধ্যে ঝরে পড়ে যায়, সে আসে না। ব্যর্থ এবং আশাহীন এই প্রতীক্ষা থেকে মনকে নিবৃত্ত করে সে বিষয়ান্তরে নিবদ্ধ করতে চায়, হালকা রোমান্স পড়তে চেষ্টা করে, কোনো গুরুগম্ভীর বিষয়ই ভালো লাগে না, এবং ঈষৎ পদধ্বনি অথবা দরোজা খোলার ক্ষীণতম শব্দ শুনতে পাওয়ার আশায় উৎসুক হয়ে বসে থাকে।

একদিন সে চোরের মতোই বারান্দার দরোজাটা পরীক্ষা করতে যায়, কিন্তু দেখতে পায় সেখানে শক্ত তালা ঝুলছে। প্রথম কয়েক

২

দিন ইওইওদের বাড়ি যাওয়ার ব্যাপারে ঔদাসীন্য দেখাতে চেষ্টা করে, কেননা, ইওইওের সঙ্গে গোপনে মিলিত হওয়ার পর, সে ভাবে সুইভবনে যতো কম যাওয়া যায় ততোই ভালো। তৃতীয় দিনের পর, যদিও সে আর এক মুহূর্তও সহ্য করতে পারে না, এবং সুই ভবনে গিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করে। তিনি পূর্ববৎ সস্নেহ সমাদরই করেন, এবং দ্বিপ্রাহরিক আহারে আমন্ত্রণ জানাতেও ভোলেন না।

ইওইওও আসে, মুখে সেই আগেকার পুরনো ঠাণ্ডা নিখুঁত ভাব, তাদের নিবিড়তার বাষ্পও তাতে ধরা পড়ে না. অন্য কারোর পক্ষে তা ঠাহর করা তো দূরের কথা। য়ুয়ান তার কাছ থেকে একটা ইঙ্গিতের অপেক্ষায় মরিয়া হয়ে ওঠে, কিন্তু ছলনাশিল্পে আশ্চর্য নিপুণ ঐ যুবতী। যখন সাহস ভরে তার দিকে তাকায় য়ুয়ান, তার চোখের পাতা পর্যন্ত কাঁপে না। য়ুয়ান ভাবে, হয়ত মায়ের মনে কোনো সংশয় এসেছে, তাদের গোপন সম্পর্কের কথা তিনি আঁচ করতে পেরেছেন। এই শীতল নীরবতার নিশ্চয় কোনো কারণ আছে।

ঘটনাহীন দুটি সপ্তাহ কেটে যায়। য়ুয়ান রোমান্সের ব্যাপারটা বন্ধু-ইয়াঙের কাছে পুরোপুরি চেপে যায়, এবং কোনো কোনো দিন ইয়াঙ রাত্রিটা থেকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলে, পাছে ইওইও এসে ফিরে যায় এই ভয়ে য়ুয়ান মঠে ফিরে যাওয়ার জন্য গোঁ ধরে। নিরুপায় হয়ে ইয়াঙকেও মানিয়ে নিতে হয়, অবাক হলেও তার গোঁ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করে না। সেদিন মঠে ফিরে য়ুয়ান যাঠ লাইনের একটি কবিতা লিখে ফেলল। একটি পরীর সঙ্গে মেলামেশার এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, আনন্দের উচ্ছ্বাস এবং তাকে পাওয়ার জন্য তার তীব্র আকাঙ্ক্ষা বর্ণনা করল সেই কবিতায়।

'এবং আদিগন্ত সমুদ্র
আর অভ্রংলিহ মেঘ
কিন্তু সেই পরী আর ফিরে এল না।'

একদিন, মধ্যরাত্রির পর, যেন দীর্ঘ প্রার্থনার উত্তরে বারান্দার দরোজা-খোলার শব্দ কানে এল হঠাৎ। য়ুয়ান ছুটে গিয়ে দেখল, গোলাপ দাঁড়িয়ে আছে। য়ুয়ানকে ডেকে গোপনে বলল যে তার তরুণী কর্ত্রী দরোজার তালার একটা চাবি তৈরি করিয়েছে, এবং এখন তারা পশ্চিমের কক্ষে একান্তে মিলিত হতে পারে। ইঙইঙ এমন ব্যবস্থা করেছে যে মনে হবে তালাটা যথাস্থানেই আছে, কিন্তু য়ুয়ান চাপ দিলেই তালাটা খুলে যাবে। একটা ছোটো পথ আছে যেখান দিয়ে পশ্চিমের কক্ষে প্রবেশ করা যায়। প্রবল উত্তেজনা সত্ত্বেও তাদের মিলনে দয়িতার নিখুঁত পরিকল্পনার ধূর্ততা এবং স্পর্ধায় য়ুয়ান অতিশয় মুগ্ধ হল।

এর পর থেকে প্রায় প্রত্যেক রাত্রেই ঐ পশ্চিমের কক্ষে ইঙইঙের সঙ্গে য়ুয়ানের মিলন হয়। যেদিন ইঙইঙ আসতে পারে না, সেদিন পরিচারিকা মারফৎ সে-কথা আগে থেকেই জানিয়ে দেয় ইঙইঙ। মধ্যরাত্রির পর সে আসে, এবং ভোর হওয়ার আগে-আগেই চলে যায়।

সুখে উন্মত্ত হয়ে ওঠে য়ুয়ান। বালিকা তার হৃদয়টি নিঃশেষে খুলে দেয়, গভীর কামনায় ভালোবাসে। দুজনে শপথ করে যে, যা-ই ঘটুক কখনো তারা পরস্পরের প্রতি পরস্পর বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, চিরকাল বিশ্বস্ত থাকবে। মেয়েটার ঐটুকু বুকে যে এতো ভালোবাসা ছিল অভিজ্ঞতা ছাড়া তা বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন। ইঙইঙ বালিকা হলেও মনটা তার পরিণত, এবং য়ুয়ান যা করে বা যা কিছু করার পরিকল্পনা করে সব তাতেই তার গভীর আকর্ষণ। নিবিড় অন্ধকারে নিঃশব্দে তারা শুয়ে থাকে, এবং ফিসফিস করে কথা বলে। য়ুয়ানের দুটো কানই সর্বদা সতর্ক থাকে, কেননা, তাদের গোপন মিলনের কাহিনী ফাঁস হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিও তো কম নয়। অপরপক্ষে, ইঙইঙ নিজের কৃতকর্মের জন্য একটুকু আফশোশ করে না। য়ুয়ান তার কৃতকর্মের ব্যাখ্যা চাইলে সে গভীর চুম্বন আর মৃদু গুঞ্জন সহকারে ফিসফিস করে বলে, 'তোমাকে ভালোবাসা ছাড়া আমার মুক্তি নেই, উপায়ও নেই।'

'তোমার মা যদি সবকিছু জেনে যান', একবার জিগ্যেস করেছিল য়ুয়ান।

'তাহলে তোমাকে জামাই বলে বরণ করে নিতে হবে তাঁকে', মিষ্টি হেসে জবাব দিয়েছিল ইঙইঙ। মস্তিষ্কের মতো তার স্নায়ুগুলোও সমান তীক্ষ্ণ ছিল।

'সময় মতো আমি তোমার মাকে সব বলব', য়ুয়ান বলেছিল; এবং ইঙইঙও এ বিষয়ে আর কথা বাড়ায় নি।

বিদায়ের সময় এসে গেল। য়ুয়ান ইঙইঙকে জানাল যে তাকে রাজধানীতে ফিরে যেতে হবে। ইঙইঙ অবাক হয় নি, কিন্তু শান্ত স্বরে বলেছিল, 'যদি যেতেই হয়, যাও। কিন্তু রাজধানী তো এখান থেকে মাত্র কয়েক দিনের পথ। তুমি গরমকালেই ফিরে এসো। আমি তা-ই চাই।' পরম নিশ্চিন্ততার সঙ্গেই বলেছিল কথাগুলি। অথচ বিদায়ের পূর্বরাত্রে প্রাত্যহিক মিলনবাসরে ইঙইঙের জন্য সারারাত্রি ধরে প্রতীক্ষা করল য়ুয়ান, কিন্তু ইঙইঙ এল না।

শরৎকালে জাতীয় পরীক্ষার প্রাক্কালে শেষ গ্রীষ্মে মাত্র কয়েক দিনের জন্য ফিরে এল য়ুয়ান। ইঙইঙের মা তাদের গোপন সম্পর্কের কথা জানতে পেরেছেন সেরকম কোনো লক্ষণ সে দেখতে পেল না। আগের মতোই তিনি তাঁদের বাড়িতে থাকার জন্য গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে য়ুয়ানকে আহ্বান জানালেন। য়ুয়ান ভাবল, মা হয়ত য়ুয়ানের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ের কথাও ভেবে রেখেছেন।

দিনের বেলাতেও ইঙইঙকে দেখতে পাওয়া যাবে ভেবে য়ুয়ান খুবই খুশী হল। দুজনে চমৎকার একটি সপ্তাহ কাটিয়ে দিল তারা। ইঙইঙের আগেকার লজ্জা-লজ্জা ভাবটা কেটে গেছে। য়ুয়ান বারান্দায় ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে বসে-বসেই দেখতে পায় ইঙইঙ ভাইয়ের সঙ্গে বাগানের পেছন দিক্‌কার ছোট্টো নদীটাতে ছোটো ছোটো

কাগজের নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে খুশীতে হাততালি দিচ্ছে। তাদের গোপন প্রণয়ের ব্যাপারে সে অপরিসীম সুখী।

য়ুয়ানের সুখে বন্ধু ইয়াঙও সুখী, ইঙইঙদের বাড়িতে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসে য়ুয়ান এবং ইঙইঙের ভালোবাসার ব্যাপারটা আঁচ করে ইয়াঙ মনে মনে হাসল।

মা-ও বুঝে ফেললেন ব্যাপারটা। য়ুয়ান চলে যাওয়ার আগের দিন মা ইঙইঙকে যুবকের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, "ও আবার ফিরে আসবে, নিশ্চয় ফিরে আসবে, জাতীয় পরীক্ষার জন্যেই কেবল তাকে যেতে হচ্ছে।"

সেই অপরাহ্ণে দুজনে নিভৃতে দেখা করার সুযোগ পেয়ে গেল। য়ুয়ানকে ভীষণ দুঃখিত এবং বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল, ইঙইঙের পানে চেয়ে চেয়ে ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল সে, কিন্তু তার ভালোবাসায় ইঙইঙের নিবিড় বিশ্বাস ছিল। বালিকার চরিত্রের আরও একটি দিক ছিল। য়ুয়ানের বাহুপাশে সে কাঁপত ঠিকই, কিন্তু সঙ্কটমুহূর্তে বেশ মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারত, অতিরিক্ত ভাবাবেগও প্রকাশ করত না। আজেবাজে কথা বলার পাত্রই নয় তার। খুব শান্ত স্বরে সে য়ুয়ানকে বলল, 'আজকের বিদায়কে চির-বিদায় ভেবে মনে দুঃখ পেয়ো না। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।'

মা য়ুয়ানকে বিদায়ী ভোজে আমন্ত্রণ করলেন, এবং নৈশ ভোজের পরে ইঙইঙকে সেতার বাজাতে বললেন। একদিন য়ুয়ান ইঙইঙকে বাদ্যযন্ত্রটি বাজাতে দেখেছিল, কিন্তু তাকে দেখামাত্রই ইঙইঙ বাজানো বন্ধ করে দিয়েছিল, য়ুয়ানের হাজার অনুরোধেও বাজাতে রাজী হয় নি। সে-রাত্রে অবশ্য সে বাজাতে রাজী হল। যন্ত্রটার পাশে বসল ইঙইঙ, আর বিনত গ্রীবার চারপাশে মাথার কুঞ্চিত কেশদাম বিক্ষিপ্ত-ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। ধীরে ধীরে এমন এক করুণ বেদনাময় সুর বাজিয়ে চলল ইঙইঙ, যা মুহূর্তে য়ুয়ানকে গভীরভাবে অভিভূত করে

ফেলল। হঠাৎ ইঙইঙের সমস্ত সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে গেল, ভেঙ্গে পড়ল ছেলেমানুষি কান্নায়, এবং ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মা তাঁকে ডাকলেন, কিন্তু সে আর ফিরে এল না।

প্রেমিক যুগলের পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল আর একবার। য়ুয়ান পরীক্ষায় ফেল করল। হয়ত ইঙইঙের কাছে ফিরে আসতে অতিশয় লজ্জা পাচ্ছিল সে, ইঙইঙের পাণিপ্রার্থনার সাহস পাচ্ছিল না একেবারেই। অথচ ইঙইঙ তার জন্যে অপেক্ষা করছিল, এবং তার কাছে ফিরে আসায় কোথায় যে য়ুয়ানের বাধা তা সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না। প্রথম-প্রথম য়ুয়ান তাকে ঘনঘন চিঠি লিখত, ক্রমে ক্রমে চিঠি লেখালেখিতে মাঝে মাঝেই বিরতি দেখা গেল। রাজধানী মাত্র কয়েকদিনের পথ, কিন্তু ইঙইঙ য়ুয়ানের ঢিলেমির নানা-রকম মনগড়া কারণ খুঁজে নেয়, এবং কখনো আশ্বস্ত হয় না।

এই সময় ইয়াঙ প্রায়শঃ ইঙইঙ এবং তার মাকে দেখতে আসতে থাকে। য়ুয়ান সম্পর্কে মা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, কারণ, য়ুয়ানের চেয়ে ইয়াঙ বয়েসে বড়ো এবং বিবাহিত। তিনি তাকে য়ুয়ানের চিঠিপত্রও দেখান। ইয়াঙ উপলব্ধি করল, কোথাও কোনো প্রমাদ ঘটেছে। তার ধারণা হল যে রাজধানীতে তার বন্ধু নিশ্চয় নতুন কোনো জীবন আরম্ভ করেছে, কেননা, সিয়ানে চিত্তবিক্ষেপকারী বস্তুর কোনো অভাবই নেই। য়ুয়ানকে সে একটা চিঠি লিখল, কিন্তু তার জবাব তার দুশ্চিন্তাকে আরো বাড়িয়েই তুলল কেবল। মেয়ে ব্যাপারটা সহজ করে তোলার জন্য মাকে বোঝাল যে আগামী শরৎকালের পরীক্ষা পর্যন্ত য়ুয়ান আত্মগোপন করে থাকতে চায়, পরীক্ষার পর সে নিশ্চয়ই আসবে।

বসন্ত ফিরে এল এবং গ্রীষ্মও প্রায় আসন্ন। একদিন ইঙইঙের কাছে য়ুয়ানের একটা কবিতায় লেখা চিঠি এল, চিঠির কবিতার প্রত্যেকটা শব্দ দ্ব্যর্থবাচক। য়ুয়ান লিখেছে অতীতে কি সুখ আর

ভালোবাসার দিন কাটিয়েছে তারা। তথাপি পংক্তিগুলোর ভেতর থেকে একটি অর্থ বেশ পরিষ্কার ভাবেই পরিস্ফুট হয়ে পড়ে, এবং বুঝতে কষ্ট হয় না যে য়ুয়ান তার কাছ থেকে চিরবিদায় প্রার্থনা করেছে। তাকে কিছু উপহারও পাঠিয়েছে, এবং ভাবী দীর্ঘ বিরহের ক্লেশ ও যন্ত্রণার দুঃখও প্রকাশ করতে ভোলে নি। তাদের এই বিচ্ছেদের সঙ্গে সে কিংবদন্তীর স্বর্গবাসী রাখাল এবং তন্তুবায় কুমারীর বিচ্ছেদের তুলনা করেছে—যারা অসীম ছায়াপথ অতিক্রম করে বছরে একবার মাত্র পরস্পরকে সাক্ষাৎ করতে পারে। কিন্তু, সে লিখছে, 'হায়! দীর্ঘ বিচ্ছেদে ছায়াপথের অপর পারে কি ঘটবে কে তা বলতে পারে! আবার ভবিষ্যতের পথ মেঘে-ঢাকা আকাশের মতো আবৃত, ছায়াময়। এবং কে জানে তখনো তুমি তুষারের মতো শুভ্র ও পবিত্র থাকবে কিনা। বসন্তে যখন পীচফুল প্রস্ফুটিত হয়, তার গোলাপি পাঁপড়ি ছেড়া থেকে গুণমুগ্ধদের কে নিরস্ত করতে পারে! সুখী আমি এইজন্যে যে প্রথম আমিই তোমার অনুগ্রহ লাভ করেছিলাম, কিন্তু আরো সৌভাগ্যবান কে, যে তোমাকে পুরস্কার হিসেবে অর্জন করবে? আঃ, মাত্র একটি বছরের প্রতীক্ষা, কিন্তু গোটা একটা বছরের প্রতীক্ষার পরেও কি সে আগের মতো অম্লান থাকবে? এই অনন্ত প্রতীক্ষার দুঃখভোগ অপেক্ষা চিরবিদায় নেওয়া কি আরো ভালো নয়?

পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সতর্কতার সঙ্গে কবিতাটি পড়ল ইঙইঙ। কবিতাটি যে অর্থ নির্দেশ করে, পড়ে ইঙইঙের একেবারে নিরর্থক, প্রলাপ বলে মনে হল। কবিতাটিতে বালিকার চরিত্রের প্রতি সরাসরি, অবিবেচনাপ্রসূত তীব্র বিদ্রূপই প্রকাশ পেয়েছে। যখন ইয়াঙ চিঠিটা হাতে-ধরে থাকা অবস্থায় ইঙইঙকে দেখল, তখন ইঙইঙের চোখ দুটো ফোলা। য়ুয়ানের নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে, অথবা গতিক বুঝে এখন কেটে পড়তে চাচ্ছে। যদি সে ভালোই বাসত তাহলে কিসের বাধায় সে এখানে আসতে পারছে না? এবং যে-ব্যাপারে সে নিজে দোষী সে-ব্যাপারে ইঙইঙকে নিন্দা করা তার উচিত হয় নি। ইয়াঙ মন স্থির করল।

'কুমারী স্থই, আমি একটা কাজে সিয়ান যাচ্ছি। আমি তার সঙ্গে দেখা করব, এবং আপনার জন্যে তার কাছ থেকে, একখানা চিঠি নিয়ে আসতে আমার কোনো কষ্টই হবে না।'

ইওইও তার দিকে চেয়ে শান্তভাবে বলল, 'আপনি আনবেন?' যে রকম শুষ্ক স্বরে কথাগুলো বলল ইওইও তাতে ইয়াও বিস্মিত না হয়ে পারল না। 'আপনি আমার জন্যে অযথা দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি ঠিক আছি। তাকে বলবেন আমি ঠিক আছি।'

ফিরে এসে ইয়াও সিয়ানে যাবার জন্য তোড়জোড় করে নিল। একমাত্র ইওইওর জন্যই তার এই যাত্রা। কি ঘটেছে তা তাকে অনুসন্ধান করতে হবে, এবং যুয়ানের মনের প্রতিক্রিয়ার কথাও তাকে জানাতে হবে। একজন সম্মানাস্পদ ব্যক্তি হিসাবে যুয়ানের বিয়েটা করা উচিত ছিল, যদিও ইওইও এমন চরিত্রের মেয়ে যে মরে গেলেও একম দাবী করবে না। সম্ভব হলে যুয়ানকে ফিরিয়ে আনবে

তিনদিন পর সে রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করল। ইওইওর কাছ থেকে যে-চিঠিটা সে নিয়ে এসেছিল যুয়ানকে সেটা দিল। চিঠিটা ছিল ইওইওর স্বভাবের মতোই অকপট এবং আত্মরক্ষায় যথার্থ মর্যাদাব্যঞ্জক :

"আমি তোমার শেষ চিঠি পেয়ে খুশী, এবং তোমার প্রীতিময় স্মৃতিচারণায় অভিভূত হয়েছি। তোমার পাঠানো চুলের অলঙ্কারগুলি এবং পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণ ওষ্ঠরঞ্জনী পেয়ে উদ্দীপিত এবং আনন্দিত হয়েছি। এইসব বুদ্ধিপ্রসূত উপাহারাদির আমি প্রশংসা করি, কিন্তু তোমার অবর্তমানে এসব আমার কি কাজে আসবে? সেগুলি তোমার কথাই আমাকে বারংবার স্মরণ করিয়ে দেয়, এবং কেবল তোমাকে দেখার আকাঙ্ক্ষাই বাড়িয়ে তোলে। তুমি ভালো আছো এবং রাজধানীতে তুমি তোমার লেখাপড়া চালিয়ে যেতে সমর্থ হচ্ছো জেনে আমি আনন্দিত। এই ছোট্টো একটা শহরে বন্দিনী হয়ে কেবল আমার নিজের জন্যই আমি দুঃখবোধ করি। ভাগ্যকে দোষ দিয়ে লাভ নেই,

ভাগ্যে যা ঘটবে তা মেনে নিতে আমি সদাপ্রস্তুত। শরৎকালে তোমার তিরোভাবের পর থেকে প্রতি মুহূর্তে তোমার অনুপস্থিতি অনুভব করি। যখন আমি পরিজনের মধ্যে থাকি তখন খুশী এবং সুখী থাকতে চেষ্টা করি, কিন্তু যখন নিঃসঙ্গ থাকি তখন আমি চোখের জল ধরে রাখতে পারি না। প্রায়ই তোমাকে স্বপ্নে দেখি এবং পুরনো দিনগুলোর মতো সুখে বুঁদ হয়ে যাই, তারপর ঘুম ভেঙে যায়, নিদারুণ দুঃখের অনুভূতিতে অর্ধ উষ্ণ লেপখানা আঁকড়ে নিশ্চুপ হয়ে পড়ে থাকি। মনে হয় কত দূরে আছো তুমি।

"একবছর হল তুমি গেছ। চ্যাঙ্গানের মত জাঁকালো শহরে থেকেও তোমার পুরোনো প্রণয়িনীকে ভুলে যাওনি বলে তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। কিন্তু আমাদের প্রতিজ্ঞার কথা আমি কখনো ভুলব না। আনুষ্ঠানিকভাবে মা আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে আমি সমস্ত আত্মসংযম হারিয়ে ফেলে নিজেকে তোমার কাছে নিঃশর্তে সমর্পণ করে দিয়েছিলাম। তোমার নিশ্চয় মনে আছে যে আমাদের প্রথম মিলন রজনীর পরে আমি শপথ করেছিলাম তোমাকে ছাড়া কখনো আর কাউকে ভালো-বাসব না, এবং আমরা চিরজীবন পরস্পরের কাছে বিশ্বস্ত থাকব। সেই ছিল আমার আশা এবং পরস্পরের কাছে আমাদের প্রতিজ্ঞা। যদি তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করো, ভালো, তাহলে আমি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুখী নারী হতে পারব। কিন্তু যদি তুমি নতুনের জন্যে পুরনোকে বাতিল করে দাও, ভাবব, আমাদের ভালোবাসা ছিল একটা নৈমিত্তিক ব্যাপার, আমি তথাপি তোমায় ভালোবাসব, কিন্তু চিরন্তন একটা ব্যথা নিয়ে আমাকে আমার কবরের মধ্যে যেতে হবে। এই পর্যন্ত, আর কিছুই বলার নেই আমার।

"নিজের প্রতি যত্ন নিয়ো। তোমাকে আমি আমার একটা জেড-খচিত আংটি পাঠালাম, এটা আমি ছেলেবেলা থেকে পরে আসছি, আমার আশা—এটা আমাদের ভালোবাসার স্মৃতিচিহ্ন হয়ে থাকবে

চিরদিন। জেড সমন্বয়ের এবং আংটির বৃত্তটি নিরবচ্ছিন্নতার প্রতীক। আর পাঠাচ্ছি রেশমী সুতোর দড়ি, এবং অশ্রু চিহ্নিত একটা বাঁশের তৈরি বেলন। এগুলি খুবই তুচ্ছ জিনিস। কিন্তু জেডের মতো তোমার ভালোবাসা কালিমাহীন এবং আংটির মতো নিরবচ্ছিন্ন হবে এই আশাই তারা বহন করে। বাঁশের ওপর আমার চোখের জলের দাগগুলি এবং সুতোর গোছগুলি হবে আমার ভালোবাসার স্মারক চিহ্ন এবং তোমার প্রতি আমার নিরবচ্ছিন্ন অনুভূতির নিদর্শন। আমার হৃদয় তোমার কাছে, কিন্তু আমার দেহ বহু দূরে। যদি কল্পনায় সম্ভব হয়, মুহূর্তে আমি তোমার পাশে চলে যাব। এই চিঠির মাধ্যমে আমার নিবিড় বাসনা এবং উদ্বেগ প্রকাশ করলাম এই জন্যে, যেন আবার আমাদের দেখা হয়। নিজের প্রতি ভালো করে যত্ন নিয়ো, সময়মতো খাওয়া-দাওয়া করো, এবং আমার জন্য দুর্ভাবনা করো না।"

'ঠিক আছে?' ইয়াং বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে দেখতে পেল চিঠি পড়তে পড়তে কি ভাবে লাল থেকে সাদা হয়ে যাচ্ছে তার মুখ। একটু থেমে ইয়াং বলল, 'কেন তুমি গেলে না বা তার সঙ্গে দেখা করলে না?'

তোতলামো করে নিজের লেখাপড়া সম্বন্ধে কিছু স্তোকবাক্য বলতে যাচ্ছিল য়ুয়ান এবং তার সঙ্গে কথা বলতে বেশ অস্বাচ্ছন্দ্যও বোধ করছিল মনে হল। ইয়াং সবই বুঝতে পারছিল।

'তুমি তার সঙ্গে ঠিক ব্যবহার করছ না', ইয়াং বলল, কি ব্যাপার আমাকে বলো।'

'বিয়ের জন্যে আমি ঠিক প্রস্তুত নই। লেখাপড়া শেষ করে আগে আমাকে দাঁড়াতে হবে। একথা সত্য যে তার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সে-ই আমার কাছে এসেছিল—আমি মনে করি না যে যুবক বয়সের একটা বোকামির জন্যে আমার সারাটা ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দেওয়া ঠিক হবে।'

'যুবক বয়সের বোকামি?'

'হ্যাঁ, তুমি কি মনে করো না যে একজন যুবক যা করে ফেলেছে তা তার করা উচিত হয়নি, এবং তার কাজ একটাই যে, কাজটা শেষ করা?'

ইয়াঙ রেগে উঠল। 'এটা তোমার কাছে যুবক বয়সের বোকামো হতে পারে। কিন্তু যে মেয়েটা তোমাকে চিঠি লিখেছে তার কি হবে?'

য়ুয়ানের মুখ ভয়ানক লাল হয়ে উঠল। 'একজন যুবক ভুল করতে পারে, পারে না? এবং মেয়েমানুষ নিয়ে তার সময় নষ্ট করা উচিত নয়। তার উচিত— '

'শয়তান', ইয়াঙ বলল, 'যখন তোমার মস্তিভ্রম হয়েছে তখন ব্যাপারটা সম্পর্কে নৈতিক মন্তব্য প্রকাশ করা তোমার সাজে না। জীবনে তোমার মতো নীতিবাদী এবং স্বার্থপর মানুষ আমি কমই দেখেছি।' ইয়াঙের এই বিশ্বাস দৃঢ় হল যে তার বন্ধু তার কাছে কিছু চেপে যাচ্ছে, এবং কিছু একটা কারণ আছে যা সে সততার সঙ্গে স্বীকার করতে ভরসা পাচ্ছে না। সপ্তাহকালের জন্য সে রাজধানীতে থেকে গেল এবং সময়ে জানতে পারল য়ুয়ান কি করছে। এক ধনী পরিবারের কুমারী উই নাম্নী একটি যুবতীর সঙ্গে তার একটা ব্যাপার চলছে। প্রচণ্ড ঘৃণা নিয়ে ইয়াঙ পৃচেঙয়ে ফিরে গেল।

কিন্তু বালিকার কাছে সব খুলে বলা তার পক্ষে একটা ভীষণ কঠিন কাজ হয়ে উঠল। তার ভয় হল সংবাদ পেয়ে মেয়েটা ভীষণভাবে ভেঙ্গে পড়বে। প্রথমে সে মাকেই বলল।

'আচ্ছা', তাকে দেখার পর ইংইং জিগ্যেস করল, 'আমার কোনো চিঠি আছে?'

ইয়াঙ চুপ করে থাকল। সে বলতে পারল না, এবং যখন সে কথা হাতড়ে বেড়াচ্ছে, দেখল, বালিকার মুখের ভাব দ্রুত বদলে যাচ্ছে।

'বেশ,' শেষ পর্যন্ত সে বলেই ফেলল, 'যে কবিতাটা তোমাকে সে পাঠিয়েছিল সেটা বিদায়সূচক কবিতা।'

ইংইং সেখানে নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে পাঁচ মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে থাকল। ইয়াঙের ভয় হল মেয়েটা বুঝি অজ্ঞান হয়েই যায়। কিন্তু তার কথাগুলো বেশ দাম্ভিকতাপূর্ণ এবং কঠিন শোনাল যখন সে বলল, 'বেশ, তাই হোক।' ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য সে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। এবং কামরার দরোজা পর্যন্ত যেতেই মূর্ছারোগগ্রস্তের মতো তার উচ্চহাস্য ইয়াঙের কানে এল।

ইয়াঙ ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ল, কিন্তু পরদিন মায়ের মুখ থেকে সে জানতে পারল বালিকা সুস্থ এবং স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, ইয়াঙ স্বস্তিবোধ করল, এবং আরো জানতে পারল যে মূর্ছারোগের পর থেকেই ইংইং রানীর মতো অহঙ্কারী এবং মিতভাষী হয়ে উঠেছে ভীষণ। সে মায়ের পরিবারের চেঙ নামে এক জ্ঞাতি-ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে। পরের বসন্তে ইংইং এবং চেঙের বিয়ে হল।

একদিন য়ুয়ান ইংইংয়ের বাড়ি এল, দূরসম্পর্কের জ্ঞাতি-ভাই বলে পরিচয় দিয়ে তার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করল। ইংইং তার সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকৃত হল, কিন্তু চলে যাওয়ার জন্য য়ুয়ান যেই প্রস্তুত হয়েছে, তখনই সে পর্দার আড়াল থেকে বাইরে বেরিয়ে এল।

'কেন আমাকে বিরক্ত করতে এসেছ? আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করেছিলাম, কিন্তু তুমি আর ফিরে আসোনি। আমাদের মধ্যে বলার মতো কোনো কথাই আর নেই। আমি যখন কাটিয়ে উঠতে পেরেছি তখন তোমারও পারা উচিত। এসো।'

য়ুয়ান একটা কথাও না বলে ফিরে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংইং মেঝেয় একটা আবর্জনার স্তূপের ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

চিয়েনিয়াঙ

—হ্ সুয়াঙ্গ্যু

লেখক হ্ সুয়াঙ্গ্যু (৭৬৬-৭০৫)। জনপ্রিয় এই গল্পটি বিখ্যাত চীনা নাট্যকার চেঙ তে-হুই কর্তৃক নাট্যায়িত হয়। চেঙ তে-হুই প্রচলিত কাহিনী অনুসরণ করে নাটকটি লেখেন, কিন্তু পরবর্তীকালে চু য়ু ইনর 'চিয়েনতেঙ হু সিনহুয়া' গ্রন্থে কাহিনীটির একটি জটিল রূপ দেখা যায়। সেখানে দেখি: দুই বোন, বড়ো বোন প্রণয়ীর কাছে বাগ্‌দত্তা। প্রণয়ী ফিরে এসে দেখে প্রণয়িনীর মৃত্যু হয়েছে। বড়ো বোনের প্রেতাত্মা ছোটো বোনের দেহে ভর করে, ছোটো বোন তার দিদির প্রণয়ীর সঙ্গে প্রণয়াবদ্ধ হয় এবং প্রণয়ীর সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে কিছুকাল অন্যত্র বাস করে। ছোটো বোন নিজের আত্মা থেকে বিযুক্ত হয়ে অসুস্থ এবং শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। পরে বড়ো বোনের আত্মা (আসলে ছোটো বোনেরই নিজের আত্মা) ছোটো বোনের দেহে ফিরে এলে সে আরোগ্যলাভ করে, কিন্তু প্রণয়ীকে চিনতে পারে না। পরে অবিশ্যি তাদের বিয়ে হয়, মৃত্যুপথযাত্রী বড়ো বোনের মধ্যস্থতায় তা সম্পন্ন হয়। এই পরিবর্তিত, জটিল কাহিনী পি আই-এন চিহচি-ও গ্রহণ করেন।[1]

সাতের বছরের তরুণ ওয়াঙ চাউ বাবাকে হারিয়ে একেবারেই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল। বয়সের তুলনায় শক্তসমর্থ এবং পরিণত ওয়াঙ নতুন জায়গায় একা-একা যাওয়ার সাহস ও যোগ্যতা দুই-ই অর্জন করেছিল। মৃত্যুপথযাত্রী বাবা তাকে দক্ষিণাঞ্চলের হেঙচাউয়ে তার পিসির কাছে গিয়ে বাস করতে বলে গিয়েছিলেন, এবং তিনি একথাও বলে গিয়েছিলেন যে সে তার পিসতুতো বোনের বাগ্‌দত্তা স্বামী। তার এবং পিসতুতো বোনের জন্মের আগে থেকেই বাবা এবং পিসি দুজনে মিলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাঁদের একজনের ছেলে এবং আর-একজনের মেয়ে হলে তারা পরস্পর বাগ্‌দত্ত থাকবে, বড়ো হলে তাদের বিয়ে

হবে। বাবার কথানতো বাড়িঘর বিক্রি করে ওয়াঙ চাউ একদিন যথারীতি দক্ষিণের উদ্দেশে যাত্রা করল। এর আগে, তখন সে খুব ছোটো, একবারই মাত্র তার বাবার সঙ্গে পিসির বাড়ি গিয়েছিল, এবং তখন তার বোনটির বয়েস ছয়ের কাছাকাছি। আবার দীর্ঘকাল পরে ওকে দেখতে পাবে ভেবে ওয়াঙের মনটা আনন্দে ভরে উঠছিল। তার ভাবতে মজা লাগছিল যে, সেই ছ-বছরের ছোট্টো বোনটি এখন অনেক বড়োসড়ো হয়েছে। এখনো কি আগের মতো রোগাই আছে? ও যখন গিয়েছিল বোনটা সব সময় ওকে আঁকড়ে থাকত, ভীষণ ন্যাওটা ছিল ওর, ওর সমস্ত কাণ্ডকারখানা অবাক হয়ে চোখ বড়ো-বড়ো করে দেখত খালি খালি। সেই হাসিখুশি মিষ্টি বোনটা আজও তেমনি আছে নাকি?

তাড়াতাড়ি পৌঁছনো দরকার, ওয়াং ভাবল, যদি ঠিক সময়ে হাজির না হওয়া যায় তাহলে সতের বছরের বোনের সঙ্গে আর কারো বাগ্‌দান হওয়ার সম্ভাবনা, হয়ত এ্যাদ্দিন তা হয়ে চুকেবুকেই গেছে বা। অথচ নদীপথে যাত্রার গতি ঢিমে হওয়ায় হ্‌সিয়াঙ নদীতে পৌঁছুতেই ওর পুরো একটা মাসই লেগে গেল। সেখান থেকে টাঙটিঙ এবং শেষমেশ অবিশ্যি পার্বত্য নগরী হেঙ চাউয়ে পৌঁছনো গেল একদিন।

ওয়াঙের পিসে চাঙ য়ি নানা রকম ওষধি আর ওষুধের ব্যবসা করে। ভদ্রলোকের চোয়ালটা বেশ চওড়া, আর গলার স্বরও বেশ বাজখাঁই। পঁচিশ বছর ধরে প্রত্যহ ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় দোকানে যায়, এবং এই দীর্ঘকালের মধ্যে নট-নড়ন নট-চড়ন, একটি দিনের জন্যও ছুটি নেয় নি। কোথাও বেড়াতে যাওয়ার কথা তো ভাবতেও পারে নি। সতর্ক, হিসেবি এবং গোঁড়া বলেই অল্প সময়ে অবস্থা ফেরাতে পেরেছে, দু-পয়সার মুখ দেখতে পেয়েছে, একজন খুচরো ব্যবসাদার থেকে পাইকারি ব্যবসাদার হতে পেরেছে, সম্পত্তি বাড়িয়েছে, নতুন একখানা পেল্লায় বাড়িও ফাঁদতে পেরেছে।

ওয়াঙ সটান দোকান গিয়ে দেখা করলে পিসে খানিকটা গোঁ গোঁ করে জিগ্যেস করলেন: 'তা এখানে মরতে এলে কেন?'

ওয়াঙ সব খুলে বলল। বুঝতে পারল, ভেতরে ভেতরে পিসেটা বেশ বোকাসোকা এবং ভীতু। তার প্রধান আত্মপ্রসাদ কেবল যথাবিধি ট্যাক্সো মেটানো আর পড়শীদের স্তুতিপ্রশংসায়। কল্পনাশক্তি হীন, ধীর স্থির এবং ভোঁতা এই লোকটার ভড়ং আর আত্মম্ভরিতার শেষ নেই, বোকার যেমন হয়ে থাকে আর কী।

যাই হোক, পিসে অনিচ্ছায় তাকে নতুন বাড়িতে নিয়ে এল, এবং, তাইয়ুয়ান থেকে আত্মীয় এসেছে বলে সগর্বে ঘোষণাও করল। ওয়াঙের পিসি সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এল।

পরক্ষণেই বৈঠকখানায় এসে ঢুকল নীলাম্বরী সুতনুকা সুন্দরী এক তরুণী। ওয়াঙ লক্ষ্য করল—হ্যাঁ, চিয়েনিয়াঙই তো,—সেই ছ-বছরের ছোট্টো বোনটি এখন পুরোপুরি একটি মহিলাই বনে গেছে। বিনুনিকরা একরাশ কালো চুল ছড়িয়ে পড়েছে ঘাড়ের ওপর,—কি সুন্দরই-না লাগছে। ওয়াঙকে চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গে চিয়েনের সুডোল মুখমণ্ডল খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মুহূর্তের দ্বিধা, তারপরেই চিয়েনিয়াঙ ছোট্টো একটা আর্তনাদ করে চেঁচিয়ে উঠল: 'তুমি—তুমি ভাই-চাউ।'

'তুমি-ই-ই—বোন-চি-য়ান।'

আনন্দের আতিশয্যে চিয়েনের চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল। 'তুমি কত্তো বড়ো হয়ে গ্যাছো!' সুদর্শন দাদাটির দিকে তাকিয়ে তরুণী উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল।

ওয়াঙ চাউ অপ্রচ্ছন্ন প্রশংসার দৃষ্টিতে বোনকে দেখছিল, আর মৃত্যুপথযাত্রী বাবার শেষ কথাগুলো মনে মনে স্মরণ করছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এই দুই উজ্জ্বল তরুণ-তরুণী পারিবারিক সংবাদের আদান-প্রদান এবং শৈশবের খেয়ালি দিনগুলোর স্মৃতিচারণে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কয়েক বছরের ছোট একটা ভাই ছিল চিয়েনের। একজন সম্পূর্ণ

অপরিচিত আগন্তুক তাকে 'ভাই' বলে সম্ভাষণ করায় তার বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রইল না। দীর্ঘকাল ধরে দুই পরিবারের মধ্যে কোনো যোগসূত্র না-থাকায় এই 'দাদাটি'র নাম কেউ কখনো উল্লেখও করেনি তার কাছে।

চিয়েনের মা ফিরে এসে মৃত দাদার ছেলেটিকে খুব সহৃদয় এবং উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল। শাদামাটা চেহারা মায়ের, অতি কোমল গাত্রবর্ণ, মাথার চুলে পাক ধরেছে। একটু লাজুক, অনুভূতিপ্রবণ, হাসলে দুটি ঠোঁটই নড়ে ওঠে। ওয়াঙ পিসিকে জানায় যে, সে স্কুলাস্কুলের পাঠ শেষ করেছে; এবং এরপর কি করবে সে জানে না। উত্তরে পিসি জানাল যে তার স্বামীর ব্যবসা-পত্তর বেশ ভালোই চলছে।

'আমি তো তা নিজের চোখেই দেখলাম,' ভাইপো বলল, 'তোমরা কি চমৎকার বাড়িতে বাস করো!'

'তবে বলি শোন। তোমার পিসে বাইরে খুব মজার লোক। এই নতুন বাড়িটা তৈরি হওয়ার পর আমি, আর ছেলেমেয়েরা অনেকদিন পরে পাশাপাশি করে তবে উঠে আসতে পেরেছি। ভাড়া না দিয়ে খালি খালি একগাদা টাকার ক্ষতি করেছি বলে তোমার পিসে এখনো কতো আক্ষেপ করেন। তা তুমি আমাদের কাছেই থাকো বাছা। আমি বরং তোমার পিসেকে বলে দোকানে একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেবো। তুমি তোমার নিজের কাজ করে যাবে, তাহলে আর ওদের ছেড়ে গেলাকে ভয় কিসের।'

সন্ধের আগে পিসে একটা দিনও আসে না। কিন্তু সেদিন বেশ সকাল-সকালই ফিরে এল—সকালবেলাকার মতোই রুক্ষ এবং গরম, খানিকটা ক্রুদ্ধও মনে হল। শালাকের মৃত্যুকে কোনো রকম গুরুত্ব তো দিলই না, উপরন্তু যেন ওটাকে একজন গরীব আত্মীয় অথবা অনাথ যুবক শিক্ষানবিশির জন্য পরীক্ষা দিতে এসেছে—এইরকম বিরক্তিকর মুখের ভাবখানা। অথচ পিসি বেশ দয়ালু, এবং সত্যিকার ভদ্রমহিলা। ওয়াঙের মনে হল—পিসের চেয়ে তার পিসি অনেক বেশি শিক্ষিত,

এবং স্বামী প্রভুত্বব্যঞ্জক ব্যবসায়ী মনোভাবকে পিসি খানিকটা কৌতুক হিসেবে নিতেই অভ্যস্ত যেন। অবিশ্যি পিসি স্বামীর সমস্ত আজ্ঞা রীতিমতো মান্যি করেই চলে বলে মনে হয়। চিয়েন্নিয়াঙ যাতে প্রাইভেট কোচিং-য়ে যথাযোগ্য শিক্ষালাভ করতে পারে সেদিকেও পিসির সতর্ক দৃষ্টি আছে বলে ওয়াঙের মনে হল।

যা হোক, দ্বিপ্রাহরিক আহারের সময় তেমন কথাবার্তা হল না, বাপ তো ব্যবসা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না, অথচ সারাটা সময় নিজের নিরেট উপস্থিতি এবং বাজখাঁই কণ্ঠস্বরে নিজেকে পরিবারের হর্তাকর্তা হিসেবে জানান দিতেও কিছুমাত্র কসুর করল না।

সময়কালে ভাইপো পরিবারের স্থায়ী সদস্য হিসেবে গণ্য হল বটে, কিন্তু ভাইবোনের মধ্যে ছেলেমেয়ের বিয়ের ব্যাপারে একদিন বাগ্‌দানের যে মৌখিক কথাবার্তা হয়েছিল, সে-সম্পর্কে পিসে বা পিসি কেউই কোনো উচ্চবাচ্য করল না। চিয়েনকে পাওয়ার সম্ভাবনা হয়ত আদৌ ছিল না, তথাপি নীলাম্বরী ঐ বালিকা ওয়াঙের মনোহরণ করেছিল। ওয়াঙের শান্ত, সংযত স্বভাব এবং শিষ্ট ব্যবহারও চিয়েনকে ভীষণ খুশি করেছিল। এবং দুজনের পছন্দতা আর মেলামেশা গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠল যখন চিয়েন ওয়াঙকে তার হৃদয় সমর্পণ করে বসল।

চিয়েনের মুখে নতুন খুশির ঝলকানি মায়ের নজর এড়াতে পারল না। চিয়েন যখন পরিবারের সকলের জন্য বিশেষ একটি পদ রান্না করে, চিয়েনের মনে হয় ও যেন কেবল ওয়াঙের জন্যই রান্না করছে, এবং অনাস্বাদিতপূর্ব এক আবেগ, সুখ ও গর্বে ওর হৃদয় ভরে যায়। ক্রমে ক্রমে যুবতীসুলভ সমস্ত লাজলজ্জা ভুলে যায়, ওয়াঙের জামা-কাপড় ধোয়ানো থেকে শেলাই-ফোঁড়াই সবকিছু নিজেই তত্ত্বাবধান করতে থাকে। ঘরগেরস্থালির কাজের কোনো ভাগাভাগি ছিল না। বেশ-কয়েকজন ঝি-চাকর আছে। কেবল সমস্ত সাংসারিক কাজ সাধারণভাবে দেখাশোনা করার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল মেয়েকে। কিন্তু এখন থেকে ওয়াঙের ঘরদোর পরিষ্কার করা এবং নানাবিধ সুখ-

স্বাচ্ছন্দ্যের খোঁজখবর নেওয়ার সমস্ত দায়িত্ব চিয়েন নিজের হাতেই নিল। ওয়াঙের ঘরের জিনিসপত্র পাছে অগোছাল করে এই ভয়ে চিয়েন নিজের ছোট্টো ভাইটিকেও ওয়াঙের ঘরে ঢুকতে দেয় না।

মা বুঝতে পারল মেয়ে ওয়াঙকে ভালোবাসে। একদিন তিনি শুষ্ক স্বরে জিগোস করলেন, 'চিয়েন, আমাদের সকলের খাবারে আজকাল এতো নুন দিচ্ছিস কেন রে?'

চিয়েন মায়ের কথা শুনে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে, কেননা, খাবারে ঠিকমতো নুন হয় না বলে ওয়াঙ তার কাছে কয়েকবার অভিযোগ করেছিল, এবং তার জন্যেই এই নুন-পোড়া।

ওয়াঙচাউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, জীবন এতো সুন্দর আর মধুর হতে পারে। রুক্ষ কটুভাষী পিসের সঙ্গেও সারাদিন দোকানে বসে থাকতে আজকাল বিরক্ত বোধ করে না ওয়াঙ। চিয়েন্নিয়াঙের জন্যে—চিয়েন্নিয়াঙকে কাছে পাওয়ার জন্যে এমন কাজ নেই সে পারে না। চিয়েন্নিয়াঙকে ভালোবেসে চিয়েন্নিয়াঙের সঙ্গে যোগ আছে এমন সব কিছুকে ভালবাসতে শিখেছিল ওয়াঙ। পিসিকে সে মা বলে মান্যি করত, চিয়েনের ভাইটিকে নিজের ভাই বলে মনে করত। খাওয়ার সময় চিয়েনের বাবা কথা বলত খুব কম, হাসি-ঠাট্টার তো বালাই-ই নেই, এবং সন্ধ্যায় প্রায়শঃ ব্যবসাসংক্রান্ত ডিনারের নেমন্তন্ন রক্ষা করতে বাইরে বেরিয়ে যেত।

হেঙচাউয়ের আবহাওয়া খুবই পরিবর্তনশীল। কখনো হঠাৎ পর্বতের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ঝড় ছুটে আসত, আবার কখনো প্রখর সূর্যতাপ গায়ের চামড়া ঝলসে দিত।

একদিন ওয়াঙ খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। কিন্তু চিয়েনের স্নিগ্ধ শুশ্রূষায় এমন মাধুর্য ছিল যে ওয়াঙ বিছানা ছেড়ে নড়তেই চায় না। এইভাবে প্রয়োজনের অনেক বেশিদিন সে বিছানায় পড়ে কাটাল।

'কিন্তু এখন তোমার দোকানে যাওয়া দরকার,' চিয়েন বলল, 'নতুবা বাবা রাগ করতে পারেন।'

'যেতেই হবে।' ওয়াঙ শুকনো মুখে জিগ্যেস করল।

একদিন চিয়েন্নিয়াঙ বলল, 'দেখতে পাচ্ছি বৃষ্টি পড়ছে। তুমি আরো জামাকাপড় পরো। নতুবা আবার নতুন করে অসুখে পড়লে আমি কিন্তু ভীষণ রাগ করব।'

'আমি খুশি হই, যদি আবার'—ওয়াঙ দুষ্টামি করে বলল, এবং যেটুকু বলতে বাকি থাকল চিয়েনের তা-ও বুঝতে কষ্ট হল না।

'বোকামো করো না,' ঠোঁট ফুলিয়ে চিয়েন্নিয়াঙ বলল, এবং ওয়াঙের গায়ে বাড়তি একখানা কাপড়ও জড়িয়ে দিল।

একদিন চিয়েন্নিয়াঙের এক জেঠিমা—বাবার দাদার বউ চ্যাঙ্গান থেকে বেড়াতে এলেন। বাবার দাদাটি বেশ ধনী। চ্যাঙ-য়ি তাঁর টাকাতেই ব্যবসা শুরু করে। তাদের এজমালি ও বিষয়সম্পত্তির ভাগবাঁটোয়ারাও এখনো বাকি। চ্যাঙ-য়ি এখনো সমান ভয় এবং বদান্যতার সঙ্গে পরিবারের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হিসেবে দাদাকে মান্যি করে থাকে। কাজেই জেঠিমাকে বেশ ঘটা করেই অভ্যর্থনা করা হল। পরিবারগত শ্রদ্ধা, ভীতু স্বভাব এবং ঐশ্বর্যের প্রতি সহজাত ভক্তি ইত্যাদি থেকেই বৌদির প্রতি চ্যাঙ-য়ি-র কি রকম মনোভাব প্রকাশ পেতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। রোজই নানারকম চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ডিনারের সময় চ্যাঙ-য়ি বৌদির সঙ্গে খোশামোদের সুরে যেভাবে কথা বলে, ঠাট্টাতামাশা করে এবং নিজেকে একজন পাক্কা ভদ্রলোক হিসেবে উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করে, যা সত্যিই অপূর্ব, সত্যি বলতে কী, সেরকম ব্যবহার সে নিজের স্ত্রীর কাছেও জীবনে কখনো করেছে কিনা সন্দেহ।

জেঠিমাও খুব খুশি হয়ে ভাইঝির জন্যে ধনী এবং অভিজাত পরিবারে পাত্রের খোঁজে উঠে-পড়ে লেগে গেলেন।

একদিন শহরের সবচেয়ে এক ধনী পরিবার—সিয়াঙ পরিবারের পার্টি থেকে ফিরে চিয়েন্নিয়াঙকে শুনিয়ে জেঠিমা তার মাকে বললেন, 'খাসা মিষ্টি মেয়ে তোমার। মেয়ের বয়স তো বছর আঠার হল, না?

তা আমি সিয়াঙদের সেজো ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের।বয়েস কথাবার্তা বলে এলাম। সিয়াঙদের অবস্থা কেমন, তা তো নিশ্চয় জানো—আরে, আমি ঐ ডাকসাইটে সিয়াঙদের কথাই বলছি—'

'কিন্তু দিদি,' মেয়ের মা আমতা-আমতা করে বলল, 'আমি যে আমার ভাইপোর সঙ্গেই চিয়েনের বিয়ে ঠিক করে রেখেছি অনেকদিন।'

'তার মানে এখানে তোমার যে ভাইপো থাকে তার কথাই বলছ?' জেঠিমা বললেন।

'তাতে কি?' মা বলল, 'ওদের দুটিকে খাসা মানাবে।' মাকে ভাইপোর পক্ষ নিয়ে কথা বলতে শুনে চিয়েন খুব লজ্জা পেল।

জেঠিমা হাসিতে ফেটে পড়ে বললেন, 'তুমি বদ্ধ পাগল ছোটো-বৌ। বলি, তোমার ভাইপোর আছে-টা কি? আমি সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছি, তাদের স্ট্যাটাস আমাদের মতোই।'

চিয়েন্মিয়াঙ উঠে দাঁড়াল, তারপর ঘর থেকে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল, এবং ঝনাৎ করে দরোজাটা বন্ধ করে দিল।

'কি অকৃতজ্ঞ মেয়ে রে বাবা!' জেঠিমা তাকেই লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'যার জন্যে চুরি-করা সে-ই বলে চোর! আমি কারো ভালো বই মন্দ করি না।...বুঝলে বোন, কি প্রকাণ্ড ওদের বাগানবাড়িটা—ঠিক আমাদের মতোই। মা হয়ে এরকম মুখ বুঁজে থাকলে চলে না। একবার ওদের বাড়ির ভেতরটা দেখে এসো,—তাহলে আমাকে ধন্যবাদ না-জানিয়ে পারবেই না। আরে, ওদের গিন্নি আমার মতোই এই এ্যাত্তো বড়ো একটা হীরের আংটি পরে থাকে।'

মা নিরুত্তর, মনে-মনে বড়ো-জাকে ক্ষমা করা ছাড়া আর কী-ই বা করার আছে। কিন্তু জেঠিমার কাছে বিয়ের ঘটকালি করাটাই স্বল্পকালীন হেঙচাউ-বাসের প্রধান আমোদ-প্রমোদ হয়ে দাঁড়াল। বিয়ের ঘটকালি মানেই ডিনার, পার্টি। ছুটির দিনগুলো বেশ হৈ-হুল্লোড় আর নাচা-নাচিতে কাটিয়ে দেওয়া যাবে, জেঠিমা ভাবলেন, এখান থেকে যাওয়ার

পরেও অনেকদিন পর্যন্ত এখানকার সুখস্মৃতি জাগরূক থাকবে মনে। মা তাঁকে নিরস্ত করতে চাইলেও বাবা খুশিতে-প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। চ্যাঙ-য়ি স্বপ্নেও এর চেয়ে সম্মানজনক এবং তৃপ্তিকর কিছু ভাবতেও পারে না। শহরের একটা পরিবারকেই চ্যাঙ হিংসে করত, এবং সে ঐ সিয়াঙ-পরিবার। সিয়াঙরা খুবই বনেদি। প্রবীণ মি. সিয়াঙ রাজধানীর একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। সিয়াঙদের সঙ্গে চ্যাঙের মেলামেশার ইচ্ছে অনেকদিনের, কিন্তু আজ পর্যন্ত সিয়াঙদের দিক থেকে এ ব্যাপারে কোনরকম উৎসাহ-ই দেখা যায়নি, এমন কি কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানেও সিয়াঙরা চ্যাঙকে নেমন্তন্ন করেনি। সুতরাং ফল হল এই যে, সিয়াঙদের সেজো ছেলের সঙ্গে চিয়েন্নিয়াঙের বিয়ের প্রস্তাব, মায়ের প্রতিবাদ সত্ত্বেও খুব ঘটা করে অভিনন্দিত হল। ওদিকে মেয়ে শয্যা গ্রহণ করে রীতিমতো হাঙ্গার স্ট্রাইক শুরু করে দিল।

'এতে কারো ভালো হবে না', মা স্বামীকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'এ বিয়েতে মেয়ের একেবারে ইচ্ছে নেই। ভেতরে গিয়ে দেখে এসো মেয়ে বিছানায় পড়ে কেঁদে-কেটে সারা হচ্ছে। সব আগে মেয়ে—তোমার কাছে সিয়াঙদের টাকাই বুঝি বড়ো হল!'

অবিশ্যি জোরজার করে চিয়েনকে বিছানা ছাড়ানো, খেতেও বাধ্য করা হল। দণ্ডিত আসামীর মতো মুখ বুঁজে চিয়েন নিরুপায়ভাবেই বাবার সব আদেশ পালন করল। কিন্তু—

এদিকে তরুণ প্রেমিকটি রীতিমতো ভেঙ্গে পড়েছে। নিরুপায় হয়ে শেষমেশ তিন সপ্তাহের মতো ছুটি নিয়ে একদিন সে হঠাৎ কোথায় অন্তর্ধান করল! হেঙ পর্বতের নীল অসীমে নিজের দুঃখ-বেদনাকে মিশিয়ে দিয়ে কিছুটা ভারমুক্ত হতে চেষ্টা করল। কিন্তু তিন সপ্তাহ পরেই চিয়েনের জন্যে মনটা ছটফট করে উঠল, চিয়েনের প্রতি নিরুদ্ধ বাসনা কিছুতেই শমিত করতে পারল না।

ওয়াঙ ফিরে এল। ফিরে এসে শুনল কি এক অদ্ভুত অজানা

রোগে চিয়েন্নিয়াঙ শয্যাশায়িনী। তার অন্তর্ধানের দিনেই বালিকা স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলে এবং নিজেকে পর্যন্ত চিনতে পারে না। সারাদিন বিছানায় পড়ে থাকে, কিছুতেই বিছানা ছাড়ে না। নিজের বাবা মা চাকরবাকর কাউকেই চিনতে পারে না। সকলে ভয় পেল মেয়েটা বোধহয় পাগল হয়ে গেছে। জ্বর নেই, জ্বালা নেই, সারাদিন বিছানায় পড়ে থাকে, খাদ্য-পানীয় স্পর্শ করে না। সবাই তার সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করে, কিন্তু তার দৃষ্টি উদাস, শূন্য। দেখে মনে হয় তার আত্মা দেহ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে, নতুবা আত্মাহীন দেহটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে আছে। সারাটা মুখমণ্ডল শাদা, পাণ্ডুর বর্ণে ছেয়ে গেছে! ডাক্তাররা পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, এরকম রোগের হদিশ তাদের শাস্ত্রে মেলে না, এবং কি যে রোগ তাও তাদের অজানা।

মায়ের অনুমতি নিয়ে ওয়াঙ রোগিণীকে দেখতে ঘরে ঢুকল। 'চিয়েন্নিয়াঙ! চিয়েন্নিয়াঙ!' ওয়াঙ ডাকল। মা অস্থৈর্যের সঙ্গে সব লক্ষ্য করছিল। ওয়াঙের ডাক শুনে বালিকার শূন্য দৃষ্টি হঠাৎ যেন সজীব হয়ে উঠল, চোখের পাতা কেঁপে উঠল, এবং মুখে রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়ল আবার।

'চিয়েন্নিয়াঙ! চিয়েন্নিয়াঙ!' ওয়াঙ আবার ডাকল।

চিয়েন্নিয়াঙের ঠোঁট নড়ে উঠল। খুশিতে আলাদা হয়ে গেল, এবং সে হাসল।

'তুমি!' শান্ত স্বরে বলল চিয়েন।

মায়ের চোখ ছলছল করে উঠল। 'চিয়েন্নিয়াঙ, মা—তোর চেতনা হয়েছে। এখন মাকে চিনতে পারছিস,—পারছিস, না?'

হ্যাঁ, মা। কিন্তু কি ব্যাপার। তুমি কাঁদছ কেন? আমি বিছানায় শুয়ে আছি কেন?'

এত যে কাণ্ড ঘটে গেছে বালিকা তার কিছুই স্পষ্টভাবে স্মরণ করতে পারে না। মা যখন বলল যে অসুস্থ হয়ে সে বিছানায়

পড়েছিল, মাকেও চিনতে পারছিল না, মেয়ে তা বিশ্বাসহ করতে পারল না।

কয়েকদিনের মধ্যে চিয়েন আবার সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠল। সে যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন তার বাবা ভয় পেয়েছিল বটে, কিন্তু এখন মেয়েকে সুস্থ হতে দেখে সে আবার তার সাবেকি কর্তৃত্ব-প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল। যখন মা বর্ণনা করল কিভাবে চিয়েন্নিয়াঙের গালের রক্তিমতা ফিরে এল,—সে যা নিজের চোখে দেখেছে,—যখন ভাইপো মেয়েকে দেখার জন্যে বিছানার কাছে এল, চাাঙ রেগে বলল, 'ভণ্ডামি! ডাক্তাররাও কখনো এরকম রোগ দেখেনি। নিজের বাপ-মাকে চিনতে পারে না। আমি এর বিন্দুবিসর্গও বিশ্বাস করি না।'

'তুমি তো নিজের চোখেই দেখেছ খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে মেয়ে কতোদিন বিছানায় পড়েছিল! আসলে রোগটা শরীরে নয়, রোগটা মনে। ওদের বিয়ের ব্যাপারটা সম্পর্কে তোমার নতুন করে বিবেচনা করা উচিত—'

'ওসব চুকেবুকে গেছে। তাছাড়া, তুমি নিশ্চয় একথা বলতে চাও না যে সিয়াঙদের সঙ্গে বাগ্‌দানের চুক্তি আমি ভেঙ্গে দিই। তারা এ গল্প বিশ্বাসই করবে না। আমি নিজেই তো বিশ্বাস করি না।'

জেঠিমা (তিনি এখনো বিরাজ করছেন) সব শুনে বিদ্রূপ করে বললেন, 'মেয়ের ন্যাকামোয় গা জ্বলে যায়! পঞ্চাশ বছর বয়েস হল, কিন্তু বাপেরজন্মেও শুনিনি যে মেয়ে বাপ-মাকেও চিনতে পারে না।'

বাপ-মায়ের অনুরোধের প্রস্তাব নিমেষে নাকচ করে দিল। এদিকে প্রেমিকযুগলের অবস্থা সত্যিই শোচনীয় হয়ে উঠল। ওয়াঙ চাউয়ের পক্ষে এই রকম অসহায় অবস্থা সহ্য করা একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠল। কিছুই করার নেই তার। কাজেই, একদিন হতাশা এবং নৈরাশ্যের সঙ্গে পিসিকে জানাল যে অচিরেই সে রাজধানী ছেড়ে নিজের শহরে ফিরে যাবে।

'হয়ত তোমার পক্ষে তাতেই মঙ্গল, পিসের অতি সংক্ষিপ্ত জবাব।

চলে-যাওয়ার পূর্বদিন রাত্রে ওয়াঙকে বিদায় জানানোর জন্যে ডিনারের আয়োজন করা হল। চিয়েম্নিয়াঙের হৃদয় ভেঙে যাচ্ছিল। দুদিন ধরে বিছানায় পড়েছিল, বিছানা ছেড়ে উঠলও না।

মায়ের অনুমতি নিয়ে ওয়াঙ বালিকার কাছে বিদায় চাইতে গেল। দুদিন খায়নি চিয়েম্নিয়াঙ, সত্যিসত্যিই তার খুব জ্বর,— সম্পূর্ণ অসুস্থই বলা যায়। ওয়াঙ বলল, আমি চলে যাচ্ছি, তোমার কাছে বিদায় নিতে বোন। এছাড়া, আমার করার আর তো কিছুই নেই।'

'দেখো, আমি ঠিক মরে যাব ভাই-চাউ। তুমি চলে গেলে আমি বাঁচব না। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি — তুমি যেখানেই যাও, — জীবিত অথবা মৃত যে কোন অবস্থায়— আমার আত্মা সবখানে তোমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকবে।'

ওয়াঙ বোনকে সমবেদনা জানাবার ভাষা খুঁজে পেল না আর। চোখের জলে তাদের ছাড়াছাড়ি হল, এবং হৃদয়ে একটি গভীর ক্ষত নিয়ে তরুণ প্রেমিকটি নিজের পথে যাত্রা করল।

নৌকোটা এক মাইল মতো গেছে। নৈশভোজের সময় হয়েছে। রাত্রির জন্যে নোঙর করা হল। ওয়াঙ চাউ বিছানায় শুয়েছিল, বিষণ্ণ ও নিঃসঙ্গ, অনর্থক অশ্রুপাত করছিল। মধ্যরাত্রে ক্রমশ তীরের-দিকে-এগিয়ে-আসা অতিপরিচিত রমণীর পদধ্বনি শুনে হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠে বসল ওয়াঙ।

'ভাই চাউ', একটি নারীকণ্ঠের নরম ফিসফিসানি তার কানে এল। বুঝি স্বপ্ন দেখছি, সে ভাবল, কেননা তার বোন যে অসুস্থ, এবং শয্যাশায়ী, এরকম অসম্ভব কি করে সম্ভব হতে পারে! নৌকার গলুইয়ের ভেতর দিয়ে উঁকি মেরে সে দেখল, অবিশ্বাস্যময় দৃশ্যটা: তীরের ওপর চিয়েম্নিয়াঙ দাঁড়িয়ে। সীমাহীন বিস্ময়ে নৌকা থেকে লাফ দিয়ে তীরে নেমে এল ওয়াঙ।

'আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি ভাই-চাউ,' বালিকা দুর্বল

কণ্ঠে বলল, এবং ওয়াঙের বাহুপাশে আবদ্ধ হল। ওয়াঙ তাড়াতাড়ি নৌকোয় নিয়ে এল চিয়েনকে। দৈবশক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে এরকম অসুস্থ শরীরে এতো অল্প সময়ে এতোখানি দূরত্ব কিভাবে অতিক্রম করে এল চিয়েন, ওয়াঙ তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। নৌকোয় ওঠার সময় ওয়াঙ দেখল চিয়েনের পায়ে জুতো নেই। তারপর অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ ধরে সুখে এবং আনন্দে তারা কেঁদেকেটে সারা হয়ে গেল। ওয়াঙের নিবিড় উত্তাপে, আদরে, চুম্বনে চিয়েন মুহূর্তেই যেন সুস্থ হয়ে উঠল।

'তোমার থেকে কেউ আমাকে সরিয়ে রাখতে পারবে না,' চিয়েন বলল, পরম নির্ভরতা এবং গভীর নির্ভয়তায় আবার চোখ মেলল!

সুদূর জলপথ। কিন্তু এই দীর্ঘ যাত্রাপথে মায়ের জন্যে কেবল একটিবার মাত্র দুঃখ প্রকাশ করল চিয়েন। মা যখন দেখবে না-জানিয়ে মেয়ে কখন, কোথায় চলে গেছে তখন একেবারে ভেঙ্গে পড়বে। ভেবে চিয়েনের ভীষণ কষ্ট হল।

অবশেষে সৃজেচুয়েন নামে এক দূরবর্তী শহরে পৌঁছল তারা। সেখানে কোনো-রকমে-দিন-গুজরানোর মতো স্বল্প বেতনের একটা চাকরি খুঁজে নিল ওয়াঙ। দুবেলা দুমুঠো জোটানোর জন্যে শহর থেকে এক মাইল দূরে একটা খামার বাড়ির একখানা ঘর ভাড়া নিল, ঐ দূরত্ব দুবার তাকে পায়ে হেঁটেই অতিক্রম করতে হয় প্রত্যহ। কিন্তু তবু অবিশ্বাস্য আর অপরিসীম সুখী সে। রান্নাবান্না ধোয়ামোছা সবকিছুই নিজের হাতে করে চিয়েন। সেও ভীষণ সুখী, পরিতৃপ্ত। ওয়াঙ তার ছোট্ট ঘরের হাতলভাঙ্গা চেয়ার, একখানা নড়বড়ে টেবিল, একটা শাদাশিদে বিছানার দিকে তাকিয়ে ভাবে সে যা চেয়েছিল সব পেয়েছে। বাড়ির মালিক চাষী লোকটি ভারি সরল, লোকটির স্ত্রীও ওয়াঙদের খুব ভালোবাসতো। নিজেদের বাগানের তরিতরকারি দেয় তারা, ওয়াঙের পয়সা বাঁচে, পরিবর্তে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাষীকে বাগানের কাজে সাহায্য করে।

শীত এল। চিয়েন্নিয়াঙ মা হল। ভারি মিষ্টি, আর নাদুস-নুদুস ওদের ছেলেটা। বসন্তকাল এল। ওয়াঙ অফিস থেকে ফেরে, দেখে দরোজার সামনে গালফোলা মোটাসোটা ছেলেটাকে নিয়ে বউ দাঁড়িয়ে আছে। সুখের পেয়ালা ভরে যায়। একজন গরীব লোকের বউয়ের মতো জীবন যাপন করতে হয় বলে ওয়াঙ কোনোরকম ওজর দেখায় না, কেননা, সে জানে তার দরকার নেই। যেরকম আরাম এবং বিলাসের মধ্যে থাকতে অভ্যস্ত তাতে বর্তমান পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়ার আশ্চর্য ক্ষমতায় চিয়েনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ওয়াঙের হৃদয় ভরে উঠে।

'আমার ইচ্ছে আমি আরো কিছু আয় করি, এবং তোমার জন্যে একটা ঝি রাখি', ওয়াঙ স্ত্রীকে বলে।

গালে মৃদু চাপ দিয়ে স্বামীকে চুপ করায় চিয়েন। এইরকমই তার উত্তর। 'তুমি আমাকে আসতে বলোনি, বরং আমিই তোমার পিছু ধাওয়া করেছিলাম'—সহজভাবে চিয়েন বলে।

এইভাবে কিছু উজ্জ্বল দিন কাটিয়ে দেয় তারা, প্রত্যেকটা সপ্তাহ ও দিন ছোট্ট ছেলেটাকে ঘিরে কেবলই নতুন আর বিস্ময়কর হয়ে ফুটে ওঠে। ছেলেটি সত্যিই ভারি মিষ্টি, এখন সে যা পায় তার ক্ষুদে হাত দুটো দিয়ে চেপে ধরতে চায়, এখন আঙুল দিয়ে নিজের নাক দেখাতে পারে, নিজের কান চেপে ধরতে পারে হঠাৎ, মোচড়াতেও পারে। কিছুদিন পরে শিশু হামাগুড়ি দিতে শেখে, নিজের ঠোঁট চুষতে এবং 'ম-মা' উচ্চারণ করতেও শেখে, এবং এই রকম নানান ঘটনার ভেতর দিয়ে প্রমাণ দেখাতে পারে যে ক্রমশই তার বুদ্ধি বাড়ছে। এই শিশুটিকে ঘিরে তরুণ পিতা-মাতারও সুখ ও আনন্দের শেষ নেই। কৃষক দম্পতির নিজেদের সন্তান নেই বলে চিয়েন্নিয়াঙের শিশুটিকে তারাও গভীরভাবে ভালোবাসে, এবং যত্নআত্তিতে চিয়েন্নিয়াঙকে সাহায্য করে।

এতো সুখ, এতো আনন্দ—তবু কি এক বিষাদ তাদের সমস্ত

সুখশান্তিতে কাটা হয়ে থাকে। বাবার সম্পর্কে বিশেষ উদ্বেগ না থাকলেও মা আর ছোট্টো ভাইটির জন্যে সারাক্ষণ চিয়েন্নিয়াঙ চিন্তা করে। চিন্তা করে, কষ্ট পায়, বুকটায় মোচড় দিয়ে ওঠে। ওয়াঙ চাউ চিয়েনকে এতো ভালোবাসে যে চিয়েনের মনের কথা বুঝে ফেলতে তার একটুকুও অসুবিধে হয় না।

'আমি জানি তুমি তোমার মায়ের কথা ভাবো', ওয়াঙ চিয়েনকে বলে, 'তুমি যদি চাও আমি তোমাকে মায়ের কাছেও নিয়ে যেতে পারি। এখন আমরা বিবাহিত, আমাদের একটি সন্তানও হয়েছে, কাজেই ওঁরা আমাদের আর কিছুই করতে পারবেন না। অন্তত তোমার মা তোমাকে দেখে আবার খুব সুখী হবেন।'

তার প্রতি দয়া, এবং তার সুখের জন্যে উদ্বেগে ওয়াঙের প্রতি কৃতজ্ঞতায় চিয়েন্নিয়াঙ কেঁদে ফেলে।

'তাই করো গো। আমি মরে গেছি ভেবে আমার মা নিশ্চয় পাগল হয়ে গেছে। ···আর এখন আমি আমার বাবা-মাকে এমন সুন্দর নাতিটিকেও উপহার দিতে পারব।'

আবার জলযাত্রা, একমাস পরে হেঙচাউয়ে নৌকা ভিড়ল।

'তুমি আগে যাও, বাবা-মাকে আমার সংবাদ দাও', চিয়েন্নিয়াঙ বলল। খোঁপায় গোঁজবার একটা সোনার ব্রোচ স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'যদি দেখো তাঁরা এখনো রেগে আছেন এবং তোমাকে বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছেন না,—তোমার কথা গল্প ভেবে বিশ্বাসই করতে চাচ্ছেন না, তখন তাঁদের এই অভিজ্ঞানটি দেখিও।'

বালুতীরে নৌকা নোঙর করল। চিয়েন্নিয়াঙ নৌকোর মধ্যে বসে অপেক্ষা করতে লাগল, ওয়াঙ চাউ শ্বশুর বাড়ির উদ্দেশে হাঁটা দিল।

নৈশভোজের সময়, বাবাও ঘরে আছে, ওয়াঙ আভূমিনত হয়ে নমস্কার করে চিয়েন্নিয়াঙকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে ক্ষমা চাইল। মা-ও ছিল, ওয়াঙকে দেখে খুশী হয়েছে বলে মনে হল, বেশ বুড়ো হয়ে

গেছে, মাথার চুল একেবারে শাদা হয়ে গেছে। ওয়াঙ জানাল তারা ফিরে এসেছে এবং চিয়েন্নিয়াঙ নৌকোয় অপেক্ষা করছে।

'তুমি বলছ কি!' বাবা বিস্ময়ে কপালে চোখ তুলে বলল, 'তোমাকে ক্ষমা করারই-বা কথা উঠছে কিসে? আমার মেয়ে তো গোটা বছরটা অসুস্থ এবং শয্যাশায়ী হয়ে বিছানাতেই পড়ে আছে।'

'তুমি চলে যাওয়ার পর থেকে চিয়েন্নিয়াঙ একটা দিনের জন্যেও বিছানা ছেড়ে ওঠেনি', মা বলল, 'এই একটা বছর যে কী কষ্টে কেটেছে আমাদের! এতো অসুস্থ হয়ে পড়ল যে একসময় সপ্তাহের পর সপ্তাহ খায়নি। আমি নিজেকেই কখনো ক্ষমা করতে পারব না। আমি তার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে বিয়ে ভেঙে দেবোই, কিন্তু সে এতোই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে আমার কথা শুনতেই পায়নি—যেন তার আত্মা আগেই দেহ ছেড়ে চলে গেছে। আমি প্রত্যেক দিন তোমাকে প্রত্যাশা করেছি।'

'কিন্তু আমি তোমাকে নিশ্চিত করে বলছি পিসি, যে চিয়েন্নিয়াঙ সম্পূর্ণ সুস্থ এবং এখন সে নৌকোতেই আছে। এই দেখো তার অভিজ্ঞান।'

ওয়াঙ সোনার ব্রোচটা দেখাল। মা গভীর মনোযোগের সঙ্গে নেড়েচেড়ে দেখে ব্রোচটা চিনতে পারল। বাড়ির সকলে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল।

'আমি বলছি সে নৌকোয় আছে। আমার সঙ্গে একজন চাকর পাঠিয়ে দাও,—সেই দেখুক।'

বাবা-মা হতবুদ্ধি হয়ে গেল। একজন চাকরকে ওয়াঙের সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হল, সঙ্গে পালকি-চেয়ারও দেওয়া হল। চাকরটা নৌকোর কাছে এসে অবাক—দেখে অবিকল আর এক চিয়েন্নিয়াঙ।

'বাবা, মা ভালো আছেন?' এগিয়ে এসে চাকরকে জিগেস করল মেয়েটি।

'হ্যাঁ, ভালো আছেন।' ভয়ে-ভয়ে যন্ত্রচালিতের মতো উত্তর দিল চাকরটা।

এদিকে চাকরের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় গোটা পরিবারটা তীব্র উৎকণ্ঠা ও বিহ্বলতায় মূক, একজন ঝিকে সোনার ব্রোচটা দিয়ে অসুস্থ মেয়ের কাছে পাঠান হল। ওয়াঙ ফিরে এসেছে শুনে শয্যাশায়ী বালিকাটি চোখ মেলে তাকাল এবং হাসল, ব্রোচটা দেখে বলল, 'সত্যিসত্যিই এটা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম।' বলে ব্রোচটা চুলের মধ্যে গুঁজে দিল।

ঝিয়ের অলক্ষ্যে কখন বিছানা ছেড়ে উঠে মেয়েটা স্বপ্নোত্থিতের মতো নিঃশব্দে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে চলতে শুরু করেছিল, কেউ জানে না। সোজা নদীতীরের উদ্দেশে হাঁটতে লাগল সে, মুখে মিষ্টি হাসি। চিয়েন্নিয়াঙও নৌকো থেকে নেমে আসছিল। ওয়াঙ-চাউ শিশুটিকে ধরে দাঁড়িয়ে চিয়েন্নিয়াঙকে পালকি-চেয়ারে তুলে দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। সে-ও নদীতীরে দাঁড়িয়ে-থাকা অবিকল চিয়েন্নিয়াঙের মতো-দেখতে একটি মেয়েকে দেখতে পেল, আরো দেখল, মুখোমুখি হতেই তারা একটি দেহের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল, এবং চিয়েন্নিয়াঙের পোশাক একটি জোড়ায় রূপান্তরিত হয়ে গেল।

ঝি এসে যখন খবর দিল অসুস্থ মেয়েটি শয্যা থেকে নিক্রান্ত হয়ে কোথায়ও চলে গেছে, তখন বাড়িসুদ্ধ লোক ভীষণভাবে ব্যস্ত ও উত্তেজিত হয়ে ছোটাছুটি আরম্ভ করে দিয়েছে। যখন চিয়েন্নিয়াঙকে পালকি-চেয়ার থেকে একটা মোটাসোটা সুন্দর শিশুকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল, তখন সকলেই নির্বাক, এবং অভিভূত। তারা বুঝতে পারল, বালিকার আত্মা—তার সত্যকার সত্তা ওয়াঙের সঙ্গেই চলে গিয়েছিল। কারণ, ভালোবাসার পাখা জেলখানার গরাদও ভেঙ্গে ফেলতে পারে। অসুস্থ শয্যাশায়ী যে মেয়েটিকে তারা এক বৎসর দেখছিল সে ছিল তার ছায়া—যা সে পেছনে ফেলে

গিয়েছিল,—আত্মাহীন খোলসটা—যেখান থেকে চেতনাময় আত্মা চলে গিয়েছিল, সেই এক বছর আগে, ওয়াঙের সঙ্গে সঙ্গেই।

ঘটনাটি ৬৯২ খ্রীষ্টাব্দের। এই কাহিনীটি দীর্ঘকাল ধরে প্রতিবেশীদের কাছে গোপন করা হয়েছিল। সময়ান্তরে চিয়েন্নিয়াঙ আরও কয়েকটি সন্তানের জননী হয়, এবং চিয়েন্নিয়াঙ ও ওয়াঙ-চাউয়ের দাম্পত্যজীবন সুদীর্ঘও হয়েছিল, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাদের সম্পর্কে কখনো ছেদ পড়েনি, এমনকি কমা-সেমিকোলন পর্যন্ত নয়।

সতীত্ব

বক্ষ্যমান গল্পটি একটি প্রচলিত জনপ্রিয় উপাখ্যানের বিবর্ধিত রূপ। উপাখ্যানটিতে আছে: এক বিধবার সম্মানে একটি স্মারক-তোরণ নির্মিত হতে চলেছে, কিন্তু এই সম্মান-পুরস্কার লাভের অব্যবহিত পূর্বে বিধবাটি একজন ভৃত্যের দ্বারা প্রলুব্ধ হন, এবং সম্মান-পুরস্কারলাভে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন।]

সাচাউ একটা ছোট্টো শহর।

তার একদিকে নিরাবরণ সৌন্দর্যের উঁচু নীল পাহাড়, আর এক দিকে জলাভূমিশোভিত রমণীয় ওয়িশন হ্রদ।

পুরনো সড়কের পাশে একসারি পাথরের তোরণ।

চীনের গ্রামগঞ্জ বা শহরের খুবই পরিচিত দৃশ্য। সজ্জিত প্রবেশ-দ্বারের মতো এই সব স্মৃতিসৌধ অতীতের নারী-পুরুষের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়: প্রধানত সেইসব নারী-পুরুষ—যে পুরুষেরা পাণ্ডিত্যের জন্যে ব্যাপক সম্মান অর্জন করেছিলেন, কিংবা যে-স্ত্রীলোকেরা ধার্মিকতার জন্যে ভূয়সী সুখ্যাতি অধিকার করেছিলেন।

এই সব তোরণ সতীত্বের স্মারক। যে-সব নারী অল্প বয়সে বৈধব্যলাভ করে মৃত স্বামীর স্মরণে আজীবন সতীত্ব বরণ করেছিলেন, তাঁদের সম্মানে সম্রাটের কাছ থেকে নির্দেশ নিয়ে এইসব তোরণ নির্মাণ করা হয়েছিল। লোকে নারীর—বিশেষত বিধবার এই সতীত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ: সর্বদেশে, সর্বকালে।

'মিছয়া, ভেতরে এস', যুবতী শ্রীমতী ওয়েন তাঁর মেয়ের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বললেন, 'রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তোমার বয়েসের মেয়েদের পক্ষে বেমানান।'

লজ্জাবনতমুখী মিহুয়া ভেতরে আসে।

অসামান্য রূপবতী এই মেয়েটি, প্রস্ফুটিত, হাস্যময়ী, রক্তিম দুই ঠোঁট, শাদা ঝকঝকে দাঁতগুলি, চাঁপা-ফুলের মতো গায়ের রঙ। সরল, স্বাধীন, কষ্টসহিষ্ণু: এরকম মেয়েদের একমাত্র গ্রামাঞ্চলেই দেখা যায়। যদিও সে অবনতমুখে ঘরে এল, তবু তার গতি ছিল মন্থর, কিন্তু চিত্ত ছিল চঞ্চল।

'আরো অনেক মেয়ে দেখছে', আত্মপক্ষ সমর্থনে মাকে সে বলল, এবং চুপ করল।

একদল সৈন্য, সংখ্যায় সত্তর-আশি জন হবে,—রাস্তার ওপর দিয়ে মার্চ করে এগোচ্ছিল। তাদের পদধ্বনি রাস্তার দুই পাশে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। নারী পুরুষ সকলেই তাদের দেখার জন্যে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। বয়স্কা মহিলারাও বাইরে বেরিয়ে এসে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু তরুণীরা বাঁশের জাফরির পর্দার আড়াল থেকেই দেখছিল। তারা যাদের দেখার দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু তাদের কেউই দেখতে পাচ্ছে না। কৌশলটি চমৎকার।

কিন্তু মিহুয়া পর্দার বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল, এবং বাড়ির বাইরে একটা উঁচু পড়ো পাথরের চাঁইয়ের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। কাজেই সৈনিকেরা সকলেই তাকে দেখতে পাচ্ছিল। লম্বা চেহারার ক্যাপটেন দলের পেছনে পেছনে যাচ্ছিল, তার চোখ পুরোপুরি নিবদ্ধ ছিল যুবতী মিহুয়ার ওপর, অনেক দূর থেকেই সে তাকে নিরীক্ষণ করতে করতে আসছে। যখন ক্যাপটেন তাকে অতিক্রম করে গেল, যুবতীটি তাকে একটা স্থির ও স্মিত হাস্য দিয়ে অভ্যর্থনা করেছিল। সে যুবতীটিকে দেখতে দেখতে মার্চ করে যাচ্ছিল, যুবতীর সুন্দর মুখের ওপর থেকে একবারও দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় নি।

তার ব্রিগেড সাচাউয়ের ত্রিশ মাইল দূরবর্তী একটি স্থান থেকে আসছিল একদল ডাকাতকে অনুসন্ধান করতে, ওই ডাকাতরা পাহাড়ের মধ্যে আত্মগোপন করে আছে, এবং সেখান থেকে পার্শ্ববর্তী জেলা-

গুলিতে ক্রমান্বয়ে ডাকাতি করে যাচ্ছে। হ্যাঙচোয়াঙের মতো ছোটো শহরে সৈন্যদের থাকার জায়গার অভাব বলে কয়েকটা মঠে সৈন্যদের থাকার বন্দোবস্ত করতে হয়েছিল, এবং অফিসারদের শহরে কোথাও থাকার জায়গা খুঁজে নিতে বলা হয়েছিল—সেখানে তারা আরামদায়ক শয্যায় অন্তত রাত্রিবেলা নিদ্রা যেতে পারে।

নির্দেশটা ক্যাপটেনের মগজে ক্রিয়া করে চলেছিল, এবং সে যদি যুবতীকে দেখার জন্যে বারবার পেছন ফিরে থাকে, কিংবা তার বাড়ি খুঁজে বের করতে সচেষ্ট হয় তাহলে তাকে ক্ষমা করাই যেতে পারে।

সৈনিকদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে সেদিন বিকেলেই সে মিহুয়াদের বাড়ি হাজির হল, এবং জিজ্ঞাসা করল তাদের পরিবারে সে আতিথ্য পেতে পারে কিনা। এই বাড়িতে থাকেন দু'জন বিধবা, মেয়েটির মা এবং ঠাকমা, কিন্তু ক্যাপটেন তার খবর রাখত না। সে পরিস্থিতিটা বিশ্লেষণ করে বোঝানোর চেষ্টা করল। অভিযানটা কয়েক মাসই চলতে পারে, বেশির ভাগ সময়ই সে বাইরে থাকবে, কেবল শহরে থাকাকালে রাত্রিবেলায় নিদ্রার জন্যে তার একটি আশ্রয়ের প্রয়োজন, তারা যদি সে-ব্যবস্থা করে দিতে পারে তাহলে সে কৃতার্থ বোধ করবে। তারা পরস্পরের নাম জানল, এবং বাড়িতে একজনও পুরুষ নেই জেনে ক্যাপটেন অতীব বিস্মিত হল।

সকালবেলায় যে মেয়েটিকে ক্যাপটেন দেখেছিল এখন সে-ও উপস্থিত ছিল, এবং সে উত্তেজনা সহকারে অপেক্ষা করছিল তার মা এবং ঠাকমার 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' শোনার জন্যে। ঠাকমার শরীরের চামড়া কুঁচকে গেছে, বয়স ষাট, তিনি মাথার চারপাশে কালো ভেলভেটের একটা বন্ধনী জড়িয়ে রেখেছিলেন। মেয়েটির মা, যুবতী শ্রীমতী ওয়েন লম্বা, একটু রোগা, এবং এখনো রূপবতী মহিলা, বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি, নাকটি চমৎকার টিকলো, মুখটিতে সংবেদনশীলতার ছাপ আছে। তাঁকে দেখে যথেষ্ট রুচিবতী এবং তরুণীদের মতো গভীর বিনম্র বলেও মনে হয়, অবিশ্যি তাঁর তরুণীসুলভ

প্রাণোচ্ছলতা অনেকটাই ম্রিয়মাণ এবং আবেগের উষ্ণতাও অনেকখানি কম,—তবে একেবারে প্রচ্ছন্ন নয়—বরং সযত্নে সুরক্ষিত ও সুলালিত। তিনি মুখের ওপর যেন আবেগহীনতার একটি সূক্ষ্ম ওড়না টেনে রেখেছেন, এবং ক্যাপটেন প্রথম দর্শনে ওষ্ঠে যে-হাসির কম্পন জাগিয়ে তুলেছিল তার প্রত্যুত্তরে তাঁর ওষ্ঠদ্বয় তৎক্ষণাৎ কঠিন হয়ে উঠেছিল। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একটা যে রহস্যের বিস্ময় ফুটে উঠেছিল তা ছিল গভীর এবং অতলান্ত।

অনুক্রমিক তিনটি প্রজন্মের তিন মহিলার কাছে একজন অপরিচিত পুরুষকে আশ্রয়দানের ধারণাটা খুবই চমকপ্রদ ঠেকেছিল ঠিকই, এবং যুবক অফিসারটির প্রতি একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ মাত্র ধারণাটিকে অভিনন্দিত করতে যে-কোনো রমণীহৃদয়ই উন্মুখ হয়ে উঠতে পারে। ক্যাপটেনের চেহারাটি বেশ আকর্ষণীয়, লম্বা, ছিপছিপে, চওড়া কাঁধ, সুগঠিত স্বাস্থ্য, ঘন কালো চুল। সচরাচর সৈন্যবিভাগে যে রকম চোঁতকা, অশিক্ষিত, ন্যক্কারজনক, আত্মম্ভরী, আস্ফালনকারী প্রাণী দেখা যায়, ক্যাপটেন তাদের থেকে স্বতন্ত্র ; অন্যদের মতো নিখুঁত, কৃত্রিম, কঠিন স্বভাবের পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গেও তার মিল নেই। পিয়াঙের সামরিক শিক্ষালয় থেকে যারা স্নাতক হয় তাদের কথাবার্তা পরিশীলিত, এবং আদব-কায়দাও বেশ অভিজাত।

তার নাম লি সাঙ, সাঙ তার ব্যক্তিগত নাম।

'মহাশয়াগণ, আমি খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আপনাদের বিরক্ত করতে চাই না। আমি যা চাই তা হল একটি শয্যা, হাত-মুখ ধোয়া বা স্নান করার জন্যে ভালো জায়গা এবং কখনো-সখনো এক-আধ-কাপ চা।'

'কিন্তু আমাদের বাড়ি ঠিক আপনার বসবাসের যোগ্য নয় অফিসারমশাই।' শ্রীমতী ওয়েন বললেন। 'তবে আপনার যদি আপত্তি না থাকে আপনার যখনই শহরে থাকার প্রয়োজন হবে আপনি আমাদের এখানে থাকলে আমরা নিশ্চয়ই আনন্দিত হব।

বাড়িটা যথেষ্ট নোংরা এবং একটু অন্ধকারও বটে। আসবাবগুলি খুবই দামী, কিন্তু পুরনো, কাঠের নক্সাগুলোর রঙ চটে গেছে; কিন্তু ঘরগুলো খুব পরিষ্কার, সাজানো-গোছানো। অনায়াসেই তারা একটা বাঁশের খাটের ব্যবস্থা করতে পারে। মিহুয়া মায়ের সঙ্গে একঘরে শুতে পারে। ঠাকমা সদাসর্বদাই পাহারায় থাকবেন, কাজেই গল্প-গুজব যে বেশিদূর এগোতে পারবে না তাতেও নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

ক্যাপটেনকে প্রথম দেখার পরেই দুই বিধবার সর্বপ্রথম বোধোদয় হল যে তাদের মিহুয়ার যোগ্য একটা পুরুষকে অন্তত পাওয়া গেল, এবং মিহুয়া বিবাহ বা বাগ্‌দানের বয়েসে পা দিয়েছে।

মিহুয়া অসামান্য রূপবতী, মায়ের মতোই সুগঠিত টিকলো তার নাম, এবং উজ্জ্বল দুটি চোখ, কিন্তু শারীরিক গঠন মায়ের মতো অতো আকর্ষণীয় নয়।

অবিশ্যি তার গুণমুগ্ধের সংখ্যা অল্প নয়, এবং সে তা ভালো করেই জানে। বিবাহযোগ্য অনেক যুবকের মনোহারিণী সে। কিন্তু ওয়েন পরিবারের পুরুষদের দুর্ভাগ্য সম্পর্কে অদ্ভুত একটা গোঁড়ামি আছে এশহরে। পরিবারের দুজন বিধবা আছেন, এবং বাবা ও ঠাকুরদা বিয়ের অল্প পরেই মারা যান। পরপর দুবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটায়, এবং একই ঘটনা হয়ত তৃতীয়বারও ঘটতে পারে এই ভয়ে স্থানীয় অভিভাবকদের ধারণা মিহুয়াকে বিয়ে করার পরিকল্পনা করা আর আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়া প্রায় একই কথা। এই বাড়িটা ছাড়া যেহেতু বিষয়-সম্পত্তি বলে তাদের আর কিছুই নেই, কেউই তাদের সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী ছিল না। মিহুয়ার প্রতি অনুরক্ত যুবকেরা মিহুয়ার সঙ্গে বিবাহের ব্যাপারে বাবা-মার কাছ থেকে উৎসাহ পেত না, বরং তার উলটো, তাঁরা একবাক্যে বিবাহের উদ্যোগে বাধা প্রদান করতেন। এবং সেজন্যেই মিহুয়া এখন উনিশ বছরের পুরুষ্ট যুবতীতে পরিণত হয়েছে স্বাভাবিক নিয়মে, কিন্তু এখনো বিবাহ-প্রসঙ্গে তেমন কেউ উচ্চবাচ্য করে না।

যখন ক্যাপটেন লি সাঙ এল, তখন থেকেই এই তিনজন প্রাণীর পরিবারে একটা রীতিমতো পরিবর্তন সূচিত হতে থাকল। লি মিছুয়ার প্রতি প্রগাঢ় আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগল, এবং তিনজন মহিলার সাহচর্যও উপভোগ করতে থাকল। সে যথেষ্ট আমুদে, ঠাকমার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং যুবতী শ্রীমতী ওয়েনের প্রতি শিষ্টাচারী। জমিয়ে গালগল্প করতেও সে ওস্তাদ, হাসিখুশি, প্রীতিময়। বিধবাদের পরিবারে সেই প্রথম বয়ে আনল পুরুষের কণ্ঠস্বর, উচ্ছ্বাসময় হাস্য—দীর্ঘকাল যা এ বাড়ির মানুষের কাছে অপরিচিত ছিল।

কাজে কাজেই তারা আশা করেছিল যে সে চিরকাল তাদের সঙ্গেই থাকবে।

ক্যাম্প থেকে ফিরে ক্যাপটেন ভিতরকার হলঘরে শ্রীমতী ওয়েনকে দেখতে পেল। ঘরের মধ্যে একটা বুককেস ছিল। তাতে পাঁচমিশেলি বই—ক্লাসিক এবং সাহিত্য, থাকত। কিছু বই ছিল পুরনো কাঠের ব্লকের সংস্করণ, ফিকে নীল কাপড়ে জড়ানো ছিল বইগুলো,—মহিলাদের পক্ষে খুব সুপাঠ্য বা সহজপাঠ্য ছিল এমন কথা বলা যায় না। কিছু সস্তা ধরনের রোমান্স এবং নাটক, কিছু শিশুপাঠ্য গ্রন্থও ছিল, সংগ্রহটি মোটামুটি খুবই সাধারণ এবং বিশেষত্বহীন। বইগুলোর দিকে নির্দেশ করে লি সাঙ শ্রীমতী ওয়েনকে বলল, 'বেশ চমৎকার একটা সংগ্রহ আছে আপনার।'

'ও, ইচ্ছে হলে দেখতে পারেন। ওগুলোর মালিক ছিলেন আমার স্বামী।'

'শিশুপাঠ্য বইগুলো কি. বিষয়ের ওপর লেখা?' যে বাড়িতে একটিও শিশু নেই সে বাড়িতে এতগুলো শিশুপাঠ্য গ্রন্থের সমাবেশ একটু বিস্মিত করতেই পারে।

বিধবাটি একটু লজ্জিত হলেন। 'আমার শিক্ষাদীক্ষা খুবই সামান্য। তথাপি আমি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে এবং তরুণীদের পড়িয়ে থাকি।'

প্রমাণের অভাব নেই। বেশ কয়েক কপি 'স্ত্রীলোকের কর্তব্য', লেখিকা দ্বিতীয় শতকের মহিলা ঐতিহাসিক প্যান চাও, চার-পাঁচ কপি 'পরিবার নির্দেশিকা', লেখিকা সৃস্রেক কওয়াঙ—অর্থাৎ সাধারণ মেয়েদের শিক্ষার জন্য যে-সব বই দরকার লাগে, সেগুলি সবই আছে।

'এই রকম ভাবে আপনি জীবন যাপন করেন? আশ্চর্য তো! খুবই অবাক লাগে আপনারা শাশুড়ী বউ দুজনে মিলে কিভাবে সংসার চালিয়ে থাকেন।

শ্রীমতী ওয়েন হাসলেন। 'ও, যে করে হোক একজনকে চালিয়ে তো নিতেই হয়। মার এবং আমার বয়েস কম ছিল যখন, আমরা তখন সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ করতাম। এখন আমি বাড়িতেই পড়াই। মেয়েরা আসা-যাওয়া করে। অবিশ্যি পড়ুয়ারা খুবই ক্ষণস্থায়ী; কেউ দু-চার মাস—কেউ বা বড়জোর একবছর পর্যন্ত টেঁকে। অনেক পরিবার আমার কাছে মেয়েদের পাঠাতে চায়, কারণ আমি ঠিকমতো নৈতিক শিক্ষা দিয়ে থাকি—ভালো স্ত্রী হতে হলে যেমনটা দরকার।'

লি সাও চু শি-রচিত 'নির্বাচিত কথাপঞ্জি' নামক বড়ো আকারের একটা বইয়ের পাতা উলটোচ্ছিল, বইটা—ঠিক দর্শনের বই নয়,—কনফুসিয়াস-পন্থী নীতিবাদীদের প্রিয় একটি বই। শ্রীমতী ওয়েন বললেন, 'বইটা আমার স্বামীর। মেয়েদের পক্ষে বইটা বেশ কঠিন। আমি আপনাকে বলেছি নিশ্চয় যে আমার শিক্ষাদীক্ষা খুবই সামান্য। মোটামুটি কাজ-চালানো গোছের লেখাপড়া শিখলেই তো মেয়েদের চলে যায়—যা স্ত্রী মেয়ে বউ হিসেবে কি ভাবে তাদের চলা দরকার বা চলা উচিত,—স্ত্রী বা জননী হিসেবে ধর্মকর্ম, আনুগত্য, সতীত্ব বা এই ধরনের যা কিছু ঠিক মতো পালন করা বা মান্য করে চলা,—এই আর কী।'

'আমি সুনিশ্চিত যে মেয়েরা ওই ধরনের নিয়ম-নীতি সম্পর্কে যথার্থ শিক্ষাই আপনার কাছ থেকে পেয়ে থাকে। আপনার স্বামী, নিশ্চয়ই একজন গোঁড়া কনফুসিয়াস-পন্থী ছিলেন।'

বিষয়টা মহিলার পক্ষে যন্ত্রণাসূচক ছিল বলে তিনি নীরব থাকলেন। যুগপৎ বিনয় এবং অহংকার মিশ্রিত তাঁর কথাবার্তা, তাঁর যুবতীসুলভ চাহনি, সহজ বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার ক্যাপটেনের মনে একটি গভীর প্রভাব মুদ্রিত করেছিল। সে তাঁর কন্যার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল, এবং বুঝতে পেরেছিল যে মেয়ের চেয়ে মা অনেক বেশি রুচিবতী, তাঁর মধ্যে ধৈর্যশক্তি বা সহিষ্ণুতা এতো প্রবল যে একটা তৃপ্তিকর সামঞ্জস্যবোধ তাঁকে কখনো অসুখী হতে দেয় নি। লি সাঙ জানত না যে যে-বিধবাদের সঙ্গে সম্প্রতি সে বাস করছে তাঁরা বংশ-গরিমায় যথেষ্ট কুলীন, এবং তাঁদের বংশের লোকেরা—আত্মীয়-স্বজনেরা সকলে যুবতী শ্রীমতী ওয়েনের সতীত্বের স্বীকৃতি হিসেবে একটি তোরণ লাভের চেষ্টা করে যাচ্ছে।

লিংচেঙ থেকে ফিরে একদিন ক্যাপটেন আবিষ্কার করল যে বাড়ির পেছনে একটা শাকসব্জির বাগান আছে, রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে বাগানে যাওয়া যায়। একদিন সকালে মিহুয়া বাজারে গিয়েছিল কিছু কেনাকাটা করতে, এবং ক্যাপটেন তাকে দেখে নি।

সে জিজ্ঞাসা করল : 'ঠাকমা কোথায় ?' যদিও সে মিহুয়ার কথাই ভাবছিল তখন।

'মনে হয় বাগানে আছেন। আসুন—দেখবেন', শ্রীমতী ওয়েন বললেন।

বাড়ির আয়তনের তুলনায় বাগানটা বেশ বড়ো-সড়ো। বাগানে গোটাকয়েক নাশপাতি গাছ ছিল,—কিছু বুনো ফুলগাছ, কয়েক সারি বাঁধাকপি, পেঁয়াজ এবং আরো পাঁচরকম সবজি। প্রতিবেশীদের বাড়ির দেয়াল বাগানটাকে ঘিরে রেখেছে, কেবল পুবদিকের দরোজা দিয়ে বাগানে যাবার একটা সরু রাস্তা আছে। দরোজার পাশে একটা একঘরের কোঠাবাড়ি, যেটা অনেকটাই রক্ষীদের ঘরের মতো দেখতে। আসলে এটা মুরগীছানাদের একটা খোঁয়াড়।

ঠাকমা একটা পুরনো কাঠের চেয়ারে বসে ছিলেন, রোদ

পোয়াচ্ছিলেন, এবং শ্রীমতী ওয়েন আগেকার দিনের মতো চূড়ো-করে খোঁপা বেঁধে কালো পোশাক পরে ক্যাপটেনের সঙ্গে বাগানটার চার পাশে পরিক্রমা করছিলেন। তাঁর মুখে বিনয় এবং অহংকারের আশ্চর্য এক ছায়া-আলো, প্রফুল্লকর, এবং তাঁর চোখ দুটিতে খুশির ঝিলিক। ক্যাপটেনের নিশ্চিত ভাবে মনে হল যে তিনি চাওয়ামাত্র যে কোনো সময়ে আবার বিয়ের পিঁড়েতে তাঁকে বসিয়ে দেওয়া যায়।

'আপনারা নিজেরাই কি বাগানটার দেখাশুনো করেন?'

'না', শ্রীমতী ওয়েন বললেন, 'বুড়ো চ্যাঙই দেখাশুনো করেন।'

'বুড়ো চ্যাঙ কে?'

'আমাদের বাগানের মালী। যখন কখনো-কখনো বিক্রি করার মতো তরমুজ, শসা এবং বাঁধাকপি হয়, তখন ও বেশ ভালো দামেই বিক্রি করে আসে। জীবনে ওর মতো সৎ লোক আমি আর দুটো দেখিনি।' বাড়িটার দিকে নির্দেশ করে শ্রীমতী ওয়েন বললেন, 'ওখানেই ও ঘুমায়।'

ঠিক সেই সময় দরোজা দিয়ে মালীর প্রবেশ। উদোম গা, কেননা গ্রীষ্মকাল, এবং রোদে তার সুগঠিত তামাটে পেশীগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

লোকটার বয়েস বছর চল্লিশের মতো, একালের ফ্যাশানে মাথার চারপাশের চুল গোল-করে ছাঁটা। মুখে সততার একটা ছাপ খুব স্পষ্টভাবেই ফুটে আছে। তদুপরি, মুখ দেখে মনে হয়, তার কোনো দুশ্চিন্তা বা দুর্ভাবনা নেই, এবং তার গায়ের চামড়া বেশ চিকন এবং মসৃণ।

কর্ত্রী বুড়ো চ্যাঙকে ক্যাপটেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। 'বুড়ো চ্যাঙই' মালীর পরিচিত নাম, এবং সকলে মালীকে ওই নামেই ডেকে থাকে। একটা পাতকুয়োর কাছে গিয়ে চ্যাঙ একপাত্র জল তুলে হাতের তেলোয় খানিক জল পান করল, এবং বাকি জল দিয়ে হাত দুটো ভালো করে ধুয়ে নিল। যখন সে জলপান করছিল রোদ

এসে পড়েছিল তার স্পষ্ট চমৎকার পেশীর ওপর। ক্যাপটেন লক্ষ্য করল : তার অতিথিসেবিকার সংবেদনশীল ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে।

'ও না-থাকলে যে কী করতাম জানি না।' শ্রীমতী ওয়েন বললেন, 'কোনোরকম মজুরি নেবে না। অবিশ্যি সাহায্য করতে হবে এমন কেউই নেই ওর, দুবেলা দুমুঠো খাওয়া আর ঘুমনোর জন্য একটু জায়গা ছাড়া আর কোনো কিছুর দরকারও বোধ করে না। টাকা দিয়ে কী করবে তা নাকি ও ভেবেই পায় না। ওর মা যখন বেঁচে ছিলেন তখন তিনিও আমাদের সঙ্গেই থাকতেন, তখনও এমনি বাধ্য সন্তান ছিল ও। এখন ও একেবারে একা এবং আত্মীয়-স্বজন বলতে ওর কেউই নেই। ওর মতো পরিচ্ছন্ন, সৎ এবং পরিশ্রমী লোক বড়ো একটা দেখা যায় না। গেলো বছর ওর জন্যে একটা জ্যাকেট বানিয়ে দিয়েছিলাম, এবং অনেক বলে-কয়ে তবে জ্যাকেটটা নেওয়াতে পেরেছি। আমাদের পরিবারের জন্যে ও যা করে তার তুলনায় আমাদের কাছ থেকে কিছুই নেয় না।'

দুপুরের খাওয়ার পর যখন ক্যাপটেন আবার বাগানে ফিরে এল, তখন বুড়ো চ্যাঙ মুরগীছানাদের খোঁয়াড়টা ঠিকঠাক করছিল। লি সাঙ সাহায্য করতে এগিয়ে এল। পরবর্তীকালে, সে ভেবে খুব মজা পেত যে এই মুরগীছানাদের খোঁয়াড়ই একদিন শ্রীমতী ওয়েনের ভাগ্য পুরোপুরি বদলে দিয়েছিল, এবং আমাদের জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার ভবিষ্যতে কতো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনই-না ঘটাতে পারে।

লি সাঙ মালীর সঙ্গে শ্রীমতী ওয়েনের সম্পর্কে গল্প জুড়ে দিয়েছিল।

'কি আশ্চর্য মহিলা।' চ্যাঙ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিল, 'উনি 'দয়া করেছিলেন বলেই আমার মা বুড়ো বয়েসে কি সুখ আর আরামেই-না কাটিয়ে যেতে পেরেছেন। লোকের মুখে শোনা যাচ্ছে যে রাজপ্রাসাদ-শিক্ষক ওয়েন ওঁদের মা-মেয়ের সতীত্বের স্মারক-তোরণ লাভের জন্যে

খুবই চেষ্টা করছেন। বৃদ্ধা শ্রীমতী ওয়েন কুড়ি বছর বয়েসে বিধবা হন; তাঁর একমাত্র পুত্র আমার কর্ত্রীকে বিয়ে করেন। অনেকদিন আগের কথা—শুনেছি একদিন সকালে মাথায় চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে মেঝের ওপর পড়ে অজ্ঞান হয়ে যান এবং তাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। মাত্র আঠার বছর বয়েসে তরুণী শ্রীমতী ওয়েন বিধবা হন, সেই সময় তিনি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। সন্তান হল, মেয়ে। আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন না ওঁর মতো যুবতী বয়সে কেউ আজীবন বৈধব্য বরণ করুক। যদি একটা ছেলেই না থাকে যার দ্বারা বংশরক্ষা হবে—তাহলে বেঁচে থেকে লাভ কি? কিন্তু তা হয় নি। বৃদ্ধা মহিলা কন্যা সন্তানের বদলে একটা শিশুপুত্রকে দত্তক নিতে চেয়েছিলেন, সেই সন্তান পূর্বপুরুষের যজ্ঞাগ্নি বয়ে নিয়ে যাবে, কিন্তু তাতে উনি রাজী হননি। কেউ গুণোত্তর হারে সন্তান লাভ করে—ছয় সাতটি পর্যন্ত ছেলের বাবা বা মা হয়, কেউ-বা নিঃসন্তান থাকে। লোকে বলে এই পরিবারের পুরুষদের ভাগ্য খুবই মন্দ, কেউই দত্তক হিসেবে নিজের ছেলেকে দান করতে চায় না। সুতরাং আমার কর্ত্রী মেয়েটাকেই রেখে দেন। আমার চোখের সামনেই তো মিহুয়া এমন সুন্দর মহিলা হয়ে উঠল। ক্যাপটেন, আপনি ওকে বিয়ে করুন না? ওকে স্ত্রী হিসেবে পেলে যে-কোনো পুরুষই সৌভাগ্যবান হবেন।'

মালীর সরল ব্যবহারে লি সাং স্মিত হাস্য করল। মিহুয়ার সৌন্দর্য এবং আকর্ষণক্ষমতা সম্পর্কে মালীর এতো কথা না বললেও চলত।

'সতীত্বের স্মারক-তোরণ কি?'

'আপনি জানেন না? এই শহরে একমাত্র হু-পরিবারেরই সতীত্বের স্মারক-তোরণ আছে, এবং ওয়েন-বংশোদ্ভূতেরা তাতে কিছু ঈর্ষাবোধ করে থাকে। তাঁরা এই শহরের এই দুইজন বিধবা সম্পর্কে রাজ প্রাসাদ-শিক্ষক ওয়েনকে পত্র লেখে। তিনি নিজেও ওই একই বংশোদ্ভূত। সকলে বলে রাজ-শিক্ষক ওই দুজন বিধবার সম্মানে

সতীত্বের একটা স্মারক-তোরণ স্থাপনের জন্যে সম্রাটের কাছে আবেদন করবেন।'

'ব্যাপারটা কি সত্যি?'

'আপনার সঙ্গে তামাশা করে লাভ কী ক্যাপটেন সাহেব? বিশেষ করে যে নারী সম্রাট কর্তৃক সম্মানিত হতে চলেছেন তাঁকে নিয়ে! লোকে বলে তোরণ স্থাপনের অনুজ্ঞাসহ সাধারণত সম্রাট এক হাজার রৌপ্যমুদ্রাও মঞ্জুর করে থাকেন। তাহলে শ্রীমতী ওয়েন যেমন ধনবতী তেমনি সম্মানিতাও হবেন। এবং উনি তার যোগ্য। আমার কর্ত্রী যুবতী, সুন্দরী এবং ওঁকে অনেক লোকই বিয়ে করতে রাজী হবেন। কিন্তু ওয়েন-পরিবারে উনি সারাজীবন থেকে যেতে চান ওঁর শাশুড়ীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে—বুড়ো বয়সে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করার জন্যে। এবং সেই কারণেই আপনি ওঁর প্রশংসা না করে পারেন না। আর এই কারণেই তো স্মৃতিসৌধ নির্মিত হবে ওঁর সম্মানে। এবং তারপর তিনি আশা করেন মিল্লুয়ার বিয়ে হলে তারাই স্বামীর পূর্বপুরুষদের যজ্ঞাগ্নি রক্ষায় সক্ষম হবে। এমনই আশ্চর্য মহিলা উনি!'

ক্যাপটেন আসে, যায়। ডাকাতদের পিছু-ধাওয়া করার চেয়ে মিল্লুয়ার পিছু-ধাওয়ার আগ্রহ তার অধিকতর। মিল্লুয়া ক্যাপটেনকে ভালোবেসে ফেলে, যেন তার আগে আর কোনো নারী কোনো পুরুষকে ভালোবাসে নি, এবং সাড পুরোপুরি ধরা দিতে বাধ্য হয়। মেয়েটি তার ভালোবাসা গোপন করতে চেষ্টা করে না, এবং খোলাখুলি জানিয়ে দেয় ক্যাপটেনের কি তার ভালো লাগে এবং কেন-ই বা ভালো লাগে। কিন্তু তৃতীয় যে-কেউ বুঝে নিতে পারে একটি মেয়ে যখন সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে ভালোবাসে তখন তার প্রতি মনোযোগী না হওয়ার উপায় থাকে না। মেয়েটি একটু ছেলেমানুষ, প্রাণবন্ত, এবং কখনো-কখনো স্পষ্টত সর্বনাশী। এই সবের জন্যেই সে ক্যাপটেনের মনোহারিণী হয়ে উঠেছিল।

মেয়ের ব্যবহার থেকে এবং ক্যাপটেনের সংযত অথচ স্পষ্ট মনোভাব থেকে পরস্পরের ভালোবাসার ব্যাপারটা বড়োরা স্বভাবতই আঁচ করতে পেরেছিলেন। লি সাঙের বয়েস সাতাশ, অবিবাহিত। ঠাকমা পূর্বাহ্নেই বিশ্বাস করেছিলেন যে এই যোটকটির ভাগ্য পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিল।

সম্ভাব্য অসঙ্গত আচরণ সম্পর্কে সর্তকতামূলক ব্যবস্থা অবশ্যই নেওয়া হয়েছিল। ঠাকমা পশ্চিমের ঘরটায় শুতেন এবং শ্রীমতী ওয়েন ও তাঁর কন্যা শুতেন পূবদিকের ঘরটায়। রাত্রের খাওয়া শেষ হলে ভেতর থেকে খিল লাগিয়ে দেওয়া হত এবং শ্রীমতী ওয়েন নিজের ঘরের দরোজায় স্বহস্তে খিল তুলে দিতেন। কিন্তু শ্রীমতী ওয়েন জানতেন যে যখন লি সাঙ ক্যাম্পে থাকে তখন মিহুয়ার সঙ্গে অনায়াসেই বাইরে মিলিত হয়। মিহুয়া বিকেলবেলায় অন্তর্ধান করে এবং রাত্রে খাওয়ার সময় ঘরে ফেরে। যখন ক্যাপটেন শহরে থাকে না তখনই এই রকমটা ঘটে থাকে।

একদিন রাত্রিবেলায় খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে যাওয়ার দু-ঘণ্টা পর মিহুয়া ফিরে এল। সময়টা জুলাই মাস, দিনগুলো খুবই লম্বা। শহরের বাইরে একটা রাস্তা ধরে সাঙ এবং মিহুয়া ঝিলের পাশ দিয়ে ছায়াচ্ছন্ন পথ বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে কখন বৃক্ষশোভিত একটি পাহাড়ে উঠে এসেছিল। সুবর্ণময় সন্ধ্যায় রৌদ্রালোক শীতল হয়ে আসছিল, এবং পাইন বনের ভেতর দিয়ে রোমাঞ্চকর বাতাস বইছিল। শিলাময় মৃত্তিকায় সবুজ শ্যাওলা সূর্যালোকে ঝলমল করছিল। ঝিলের শেষে এবং সবুজ তীরভূমির অদূরে মনোহর হ্রদ। ক্যাপটেনকে বাহুপাশে আবদ্ধ করে মিহুয়ার হৃদয় ভরে উঠেছিল। ইতিপূর্বেই তারা আজীবন পরস্পরকে ভালোবাসবার প্রতিজ্ঞায় শপথ নিয়েছে। মিহুয়া সাঙকে মায়ের যৌবনকালের সৌন্দর্যের কথা শোনাচ্ছিল,—কতো লোক তার মাকে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল এবং তিনি সে-সব প্রত্যাখ্যান

করেছিলেন। মিহুয়া অদ্ভুত স্বরে ক্যাপটেনের কানে কানে বলেছিল, 'আমি হলে কখ্‌খনো-না পুনর্বিবাহ করতাম।'

'তুমি তোমার মায়ের জন্য গর্ববোধ করো না?'

'নিশ্চয় করি। কিন্তু আমি ভাবতে ভালোবাসি যে একটি স্ত্রীলোক একটি পুরুষকে নিয়ে সুখের ঘর বাঁধবে,—ঠিক এভাবে নিজেকে কষ্ট দেবে না। হয়তো বাড়িতে আমি কনফুসীয় নীতিকথা এতো শুনেছি যে তাতে আমি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

মিহুয়া যুবতী। সন্ন্যাসিনী মা-ঠাকমার উদাহরণ তার রমণী-হৃদয়ের বসন্তকে কোনোরকমেই নিরুদ্ধ করে রাখতে পারে না।

'তা যা হোক,' সাঙ বলল, 'উনি যা করেছেন একজন ধর্মশীলা নারী তা-ই করে থাকেন।'

'নারীজীবনের সার্থকতা কিসে?' মিহুয়া প্রশ্ন করে নিজেই দ্রুত উত্তর দিল, 'বিবাহিত জীবন, একটি সংসার, ছেলেমেয়ে, তাই না? অতো অল্প বয়সে বাবাকে হারিয়ে বেঁচে থাকা মায়ের পক্ষে খুব সোজা ব্যাপার ছিল না, বিশেষত আমরা এতো দরিদ্র—আমি মায়ের প্রশংসা না করে পারি না। কিন্তু—'

'কিন্তু কি?'

'কিন্তু সতীত্বের স্মারক-তোরণে আমার আস্থা নেই।'

ক্যাপটেন গোঁ গোঁ শব্দ করে উঠল।

'আমি যখন বড়ো হলাম তখন থেকে এ সম্পর্কে আমি অনেক ভেবেছি। আমার মা খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষী মহিলা এবং এ বিষয়ে তিনি খুব স্থিতধী-ও। বিধবার সতী হওয়া এবং আমার মা যেভাবে সতী হিসেবে সম্মানিত—এদুয়ে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। আমি জানি না কেন আমি এইসব কথা বলছি।'

সাঙ সতীত্বের তোরণ সম্পর্কে মিহুয়াকে জিজ্ঞাসা করল, এবং তার মা ও ঠাকমাকে সেই তোরণ পাইয়ে দেওয়ার জন্যে তাদের

গোত্রের লোকেরা চেষ্টা করছে বলে যে গুজব ছড়িয়েছে তা সত্যি কিনা জানতে চাইল।

'আমি আমার মায়ের জন্যে গর্বিত,' মিজুয়া বলল, 'কিন্তু আমাদের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর আমরা এখান থেকে চলে যাব। ঠাকমার শরীর ভয়ানক ভেঙ্গে গেছে। এমনি নিঃসঙ্গভাবে আরো কুড়ি বছরের গৌরবময় বন্দী-জীবন—যতক্ষণ না তিনি সাধ্বীর গৌরব নিয়ে মরছেন,—কি হবে এই দীর্ঘ পরমায়ু নিয়ে?

লি সাঙ মিজুয়ার কথা শুনে খুবই অবাক হয়ে যায়। তার মতো জীবনানুরাগিনী যুবতী ভুল বলবে তাই-বা মনে করা যায় কি করে? নিজেদের ঘরে দুটি বিধবার প্রেমহীন জীবন আশৈশব সে প্রত্যক্ষ করেছে, তাঁদের সুখদুঃখের অংশও ভাগ করে নিতে হয়েছে তাকে এবং হয়ত সে যা বলছে খুব বুঝেই বলছে।

পাহাড়ের আড়ালে সূর্য অস্ত যাচ্ছে বুঝতে পেরে হঠাৎ মিজুয়া বলে উঠে, 'ও, সাঙ! আমাকে দৌড়াতে হবে। এরকম দেরি হয়েছে আমি বুঝতেও পারি নি।'

ক্যাপটেনের পরবর্তী অনুপস্থিতির অধ্যায়ে কিছু একটা ঘটে থাকবে। শ্রীমতী ওয়েন প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জানতে পারেন প্রেমিকযুগলকে শহরে প্রায়ই দেখা যায় এবং একদিন শহরের পশ্চিমে পাহাড়ের দিকে যে পথটা চলে গেছে সেই পথের নির্জনে, দূরে। মায়ের সতর্ক দৃষ্টি থেকে কোনো কিছুই এড়াতে পারেনি। সজল চোখে তরুণী তার অপরাধ স্বীকার করে, এবং বলে যে ক্যাপটেন তাকে বিয়ে করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে। শ্রীমতী ওয়েন প্রচণ্ড রেগে গেলেন।

'আমি ভাবতেও পারিনি কখনো আমার নিজের মেয়ে এভাবে এই পরিবারের সুখ ডোবাবে। আমি এবং তোমার ঠাকমা এই শহরে দৃষ্টান্ত হয়ে আছি। আজ তুমি ওয়েন-পরিবারের মুখে চুনকালি দিলে। যখন পড়শীরা জানবে সারাটা শহরে টি টি পড়ে যাবে। আমার নিজের পেটের মেয়েই আমার শত্রু।' ... ...

'আমি এজন্যে লজ্জিত নই', মিহুয়া চোখ মুছে বলল, 'আমি ওকে ভালোবাসি বলে আদৌ লজ্জিত নই! আমার বিয়ের বয়স হয়েছে। যদি ওকে তোমার পছন্দ না হয় তাহলে আমার জন্যে একটা ভালো পাত্র দেখো,—আমি যুবতী, এবং এই বাড়ির প্রেমহীন জীবন আমি ঘৃণা করি। তোমার কথাই ধরো, মা, তোমার ফাঁপা জীবন—যাকে তোমরা ধর্মানুসারী বৈধব্য বলে থাকো, তার মধ্যে কোনো মহত্ত্ব আমি দেখতে পাই না।'

বিস্ময় ও বিহ্বলতায় যুবতী শ্রীমতী ওয়েনের গলা বুঁজে এল।

'কি বলছিস তুই?' মেয়ের প্রায় অভাবিত, খোঁচা-দেওয়া কথায় শ্রীমতী ওয়েনের মাথা ঘুরতে লাগল।

'হাঁা', মিহুয়া বলল, 'মা, তুমি আবার বিয়ে করলে না কেন? তুমি তো এখনো যুবতী।'

'তোর মাথায় বজ্রাঘাত হোক।'

একমাত্র পরিপূর্ণ শিশুই এমন নগ্ন সারল্যের সঙ্গে অপ্রিয় সত্যকে বোমার মতো সজোরে নিক্ষেপ করতে পারে। মাকে কতোখানি আঘাত সে করল, এবং তার কথাগুলি মায়ের মর্মস্থানটিতে কি রকম ক্ষতের সৃষ্টি করল সে-সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই ছিল না। মায়ের পুনর্বিবাহের চিন্তা যেমন জঘন্য, তেমনি অচিন্তনীয়, ঘৃণাজনকও বটে। 'আমি এতোদিন ধরে এই শিক্ষাই দিয়েছি! তোর কি লজ্জাঘেন্নার বালাইও নেই?'

শ্রীমতী ওয়েন একেবারে ভেঙে পড়লেন এবং মর্মান্তিক দুঃখে চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। একটা বাক্য, একটা পদবন্ধ, এমন কি একটা শব্দ সময়ে-সময়ে যে কী অঘটন ঘটাতে পারে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। যে মানসিক যন্ত্রণা তিনি সহ্য করেছেন, অথচ দীর্ঘ উনিশ বছর যাবৎ যা কাউকে বলতে পারেন নি, এখন সমস্তই লবণাক্ত অশ্রু হয়ে অবিরল ধারায় তাঁর দুচোখ বেয়ে ঝরে পড়ল। এমন কি নেই যা তিনি সহ্য করেন নি? এখন তাঁর নিজের মেয়ে তাঁকে উপহাস

করছে এবং দীর্ঘকাল ধরে যে আত্মত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধন তিনি করেছেন—যার মূল্য একমাত্র তিনিই জানেন—তা-ই নিয়ে বিদ্রূপ করছে? তিনি নিজে যখন ছোট্টো মেয়েটি ছিলেন তখন থেকে কখনো বিধবার সতীত্ব ধর্ম বা বিধবার আদর্শের বৈধতা সম্পর্কে কাউকে কোনো প্রশ্ন করতে শুনেছেন বলে মনে পড়ে না। এরকম প্রশ্ন তো সূর্য আছে কিনা-ধরনের প্রশ্নের সামিল! দ্বিতীয়বার বিবাহ করার প্রসঙ্গ যে সত্যিই অমূলক বা চিন্তাতীত তা নয়, কিন্তু অতীতের দীর্ঘ বছরগুলিতে সত্যিসত্যিই তা-ই ছিল। অনেক কাল আগে তা ঘনিষ্ঠ চিন্তার বিষয় ছিল ঠিক কথা। কিন্তু দ্বিতীয়বার বিবাহের কথা কোনো অসতর্ক মুহূর্তে মনে এলেও সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা মন থেকে দূর করে দিয়েছেন। বস্তুত এরকম কিছু ভাবাই যায় না—এখনো না।

শ্রীমতী ওয়েন মেয়েকে ধমকানোয় ছেদ দিলেন। একরাশ দুঃখে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গেলেন। মিহুয়া ভয় পেল, আর একটা শব্দও করল না। কিন্তু মেয়ের বিদ্রূপে মা সম্পূর্ণভাবে যেন বিধ্বস্ত হয়ে গেলেন। বিধবার কঠিন জীবনের গভীর শূন্যতার কথা—মিহুয়া যা বলেছে তা তো মিথ্যে নয়। তিনি টেবিলের ওপর মাথা রেখে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে লাগলেন। ক্যাপটেনের সঙ্গে মিহুয়ার প্রেমের সম্পর্ক তো সত্যি এবং বিশ্বাসযোগ্য। প্রথম যৌবনে যদি তিনিও এরকম যুবকের দেখা পেতেন, তবে হয়তো তিনিও সংযম রাখতে পারতেন না।

শ্রীমতী ওয়েন স্থির করলেন যে ক্যাপটেন বাড়ি ফেরা পর্যন্ত তাঁরা অপেক্ষা করবেন। সে হয়তো এখন শহরে আছে, মেয়ে হয়ত তাকে সাবধান করে দিতে কিংবা তার সঙ্গে পালিয়েও যেতে পারে। তিনি মিহুয়াকে ঘরের মধ্যে তালাচাবি লাগিয়ে বন্দী করে রাখলেন।

তিন দিন পরে সাং ফিরে এলে শ্রীমতী ওয়েন একাই তাকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন, কিছুটা বিষণ্ণ মুখেই।

'মিহুয়া কই?'

'সে ভালোই আছে। ভেতরে।'

'বাইরে বেরল না কেন?'

'আমি এই প্রশ্নটার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।' শ্রীমতী ওয়েন জবাবে বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম আপনি হয়ত শহরেই আছেন এবং কেন ও সঙ্কেতস্থানে গেল না তাই ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন।'

'সঙ্কেতস্থান—মানে?' বিস্ময়ের স্বরে সাঙ জিজ্ঞাসা করল, 'আমি আজ সকালেই এসেছি।'

'মিথ্যে কথা বলবেন না। আমি সবই জানি।'

তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন চাপা মেয়েলি ক্রোধ প্রকাশ পেল যেমনটা এর আগে সে কখনো শোনে নি। তাতে বিনয় ও অহঙ্কারের সেই অদ্ভুত মিশ্রণও ছিল, যা ইতিপূর্বেই তাকে মুগ্ধ করেছিল।

ক্যাপটেন চুপ করেছিল। বাড়ির পেছন দিক থেকে মিহুয়ার কান্নাজড়ানো স্বর ভেসে এল: 'আমাকে বেরুতে দাও: সাঙ, আমি এখানে। সাঙ, আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাইরে নিয়ে যাও!' সে বিলাপে ভেঙ্গে পড়ল।

'ব্যাপার কি?' সাঙ চিৎকার করে বলল এবং সাবেগে ভেতরের দিকে এগিয়ে গেল। সে মিহুয়াকে বন্ধ দরোজায় করাঘাত করতে এবং আর্তস্বরে কাঁদতে শুনল।

যুবতী শ্রীমতী ওয়েনও ভেতর বাড়ির দিকে সাঙকে অনুসরণ করলেন এবং ঠাকমাও তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ক্যাপটেনের দিকে ধীর পায়ে এগুতে এগুতে অশ্রুসজল চোখে বৃদ্ধা সাঙকে বললেন, 'যুবক, তুমি কি ওকে বিয়ে করবে?'

সাঙের মুখ বিস্ময়ে অবনত হয়ে গেল। সে এখন সবই বুঝতে পারল। মিহুয়া তখনো ঘরের ভেতরে কেঁদে চলেছে, 'সাঙ, সাঙ, আমাকে বের করে নিয়ে যাও।'

'নিশ্চয়ই তাকে বিয়ে করব। এখন দরোজাটা খুলে দেবেন এবং ওর সঙ্গে আমাকে দুটো কথা বলতে দেবেন কি?'

দরোজা খুলে গেল, মিহুয়া বেরিয়ে এল, এবং ক্যাপটেনের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল, 'আমাকে নিয়ে চলো, সাঙ, আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো।'

এবার মায়ের কাঁদাকাটার পালা। ক্যাপটেন বারবার ক্ষমা চাইল এবং তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু মনে হল কোনো কিছুই তাঁর এই কান্নাকে প্রশমিত করতে পারবে না, এই মুহূর্তে ক্যাপটেনের কাছে ব্যাপারটা খুব দুর্বোধ্য, বলেই মনে হল।

যে পর্যন্ত ঘটনাটা অগ্রসর হয়েছে ক্যাপটেন সেখান থেকেই শুরু করল। সে জানাল যে, সে যা করেছে তার জন্যে সে ক্ষমাপ্রার্থী, মিহুয়াকে বিয়ে করা ছাড়া অন্য কোনো মতলব তার মাথায় ছিল না। সে তাঁদের ক্ষমার জন্যে অনুনয়-বিনয় করল। মিহুয়াকে সে যথাশীঘ্র বিয়ে করতে চায়, এবং আশা করে যে সে কর্তব্যপরায়ণ জামাতা হিসেবে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারবে। নিজের সুখে গুরুজনদের আকস্মিকভাবে আহত করে মিহুয়া সেখানে বসে পড়ল।

সঙ্কট কেটে যাওয়ায় প্রেমিকযুগলকে আর খারাপ বলে কারো মনে হল না। বিবাহপ্রস্তাব দেওয়াতে ক্যাপটেনের প্রতি সকলেই খুশী হল। ডাকাতদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শীঘ্রই সম্পন্ন হল। ক্যাপটেনের পরিবারের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা হতেই তাড়াতাড়ি সাচাউয়েই ক্যাপটেনের সঙ্গে মিহুয়ার বিয়ে হয়ে গেল।

বিশ্বজগতে মানুষের মন এমনি এক বিচিত্র বস্তু যার সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যৎবাণীই করা চলে না। মিহুয়া এবং ক্যাপটেনের সংক্ষিপ্ত অথচ প্রচণ্ড রোমান্স সমাপ্ত হল। কিন্তু শ্রীমতী ওয়েনের মনে এর এক অদ্ভুত প্রভাব মুদ্রিত হয়ে গেল।

মাস তিনেক পরে ঠাকমা মারা গেলেন। পারলৌকিক কাজকর্মে যোগ দিতে ক্যাপটেন এল একাই।

শ্রীমতী ওয়েন লি সাঙকে জানালেন যে জ্ঞাতি ঠাকুর্দা

রাজ-শিক্ষকের কাছ থেকে একটা চিঠি এনে দেখিয়েছেন, যাতে এই বার্তা আছে যে তিনি সতীত্ব তোরণের জন্যে সম্রাটের কাছে সুপারিশ করেছেন। তোরণ-প্রাপ্তির বিষয়টি প্রায় সুনিশ্চিত। সংবাদটি আত্মীয়স্বজনদের যথেষ্ট উৎসাহিত করেছে, এবং দুজন বিধবার সতীত্বে তাদের খুবই কায়েমি স্বার্থ আছে বলে মনে হচ্ছে। এখন ওয়েন-পরিবারের মধ্যে মৃত এবং জীবিত দুই বিধবাই 'সতীশিরোমণি' আখ্যায় পরস্পরের কাছে উল্লিখিত হয়ে চলেছেন।

আশ্চর্য, খুব একটা উৎসাহবিহীন ভঙ্গিতে শ্রীমতী ওয়েন জামাতাকে এসব কথা বললেন, এবং কখনো কখনো মনে হল ব্যাপারটা সম্পর্কে তাঁরই কোথায় যেন সংশয় আছে।

'কেন, এতো চমৎকার—অভূতপূর্ব ব্যাপার।' উচ্ছ্বসিত স্বরে লি সাঙ বলল, 'আপনি উৎসাহবোধ করছেন না?'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা। মিঙয়া কেমন আছে?'

লি সাঙ জানাল যে তারা খুব শীঘ্রই একটি সন্তানের অধিকারী হতে চলেছে। শ্রীমতী ওয়েন কাঁপতে আরম্ভ করলেন। 'এই খবরটা দিতে এতো দেরি করলে কেন? এটাই তো আসল খবর!'

'ও, তবে আপনার তোরণ-লাভের চেয়ে এই খবরটা কম গুরুত্বপূর্ণ, মা।' ক্যাপটেন বলল।

'তোরণ!' শ্রীমতী ওয়েন ঘৃণাসূচক মুখভঙ্গি করে বললেন, 'ও নিয়ে আর কথা বলতে ইচ্ছে করে না।'

এমন এক দুর্লভ সম্মানের প্রতি তাঁর ঔদাসীন্য লি সাঙকে অবাক করল। কুড়ি বছরের নিঃসঙ্গ গৌরবময় বন্দিজীবনের যে-কথা তার স্ত্রী বলেছিল, লি সাঙ এখন তা স্মরণ করল। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, তিনি নিজেই আজ সেই রকম চিন্তাই করতে চলেছেন।

'তুমি কি মনে করো ওটা আমি গ্রহণ করব?' শ্রীমতী ওয়েন অপ্রাসঙ্গিকভাবে পূর্ব বিষয়ে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন। কি অদ্ভুত প্রশ্ন!

'কিন্তু গ্রহণ না-করা তো বোকামি·········' লি সাঙের কণ্ঠস্বর শুকিয়ে এল, কেননা তার মনে সন্দেহ এল। 'অবশ্যই, তোরণ-পুরস্কার লাভ করলে আপনার বৈধব্য পবিত্র হয়ে উঠবে, স্বয়ং সম্রাট যখন স্বীকৃতি দিতে যাচ্ছেন—'

শ্রাদ্ধাদি চুকে গেলে শ্রীমতী ওয়েন একাই তাঁর বাড়িতে ফিরে এলেন। সম্মুখ এবং পশ্চাদ্ভাগের হলগুলো এখনো শোকজ্ঞাপক পাকানো কাগজে আবৃত ছিল, এবং হলের মধ্যভাগে পর্যন্ত একটা শাদা সিল্কের কাপড় টানানো ছিল,—স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেটের উপহার,—যার উপর খোদিত করা ছিল এই কথাগুলি: 'একটি দরোজা, দুজন সতী।'

সেই বাড়িতে একা বাস করতে হয় বলে শ্রীমতী ওয়েন এখন ভবিষ্যতের ভাবনা-চিন্তা করার অফুরন্ত সময় পান। আগামী দিনের কথা যতো ভাবেন, ততোই ভয় পেতে থাকেন। মাত্র কয়েক মাস আগেও তাঁর মেয়ে, ক্যাপটেন এবং শাশুড়ী হাসি-হুল্লোড়ে বাড়িটা ভরিয়ে রাখতেন। একটার পর একটা অনেকগুলি ঘটনা ঘটে গেল—মিহুয়ার রোমান্স এবং বিবাহ, শাশুড়ীর মৃত্যু, অকস্মাৎ এই খ্যাতিলাভ এবং নবজাতক সন্তান।

পারলৌকিক অনুষ্ঠানে বৃদ্ধ চাাঙ অস্বাভাবিক তৎপরতা দেখিয়েছিল, এবং এখন কর্ত্রীকে বিষণ্ণ দেখে সে তাঁকে আরো সাহায্য করতে এগিয়ে এল। প্রত্যহ সে মিহুয়ার বাসস্থানের কাছাকাছি বাজারে যায়, শ্রীমতী ওয়েনকে ঘরগেরস্থালি ঝঞ্ঝাট থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেয়, এবং শাকসব্জি বিক্রি করে বেশ কিছু পয়সাও ঘরে আনে। রান্নাঘর থেকেই শ্রীমতী ওয়েন বিশ্বাসী সং মালীর কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করেন, এবং কখনো-কখনো তীব্র নিঃসঙ্গতা বোধ করলে তার সঙ্গে কথা বলার জন্যে বাগানেও যান। বাগানটা চারদিক থেকে ঘেরা, এবং প্রতিবেশীরা কেউই তাঁদের দেখতে পায় না। ক্রমে একধরনের ঘনিষ্ঠতা জন্মে যায়।

অথচ এদিকে একদিন রাজ-শিক্ষকের কাছ থেকে পারলৌকিক উপহার হিসেবে একশত মুদ্রা নিয়ে আসেন খুড়ো-শ্বশুরমহাশয়। একটা স্মৃতি-তোরণ এবং এক সহস্র মুদ্রা এখন একটা বাস্তবিক এবং সুনিশ্চিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

বৃদ্ধ খুড়ো-শ্বশুর চলে যাওয়ার পর একটা সমাধানে পৌঁছানো খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে ওঠে শ্রীমতী ওয়েনের কাছে। কেননা যে কোনো রকম সমাধানে পৌঁছানোতেই যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে। বুড়ো চ্যাঙ সমস্ত অন্তঃকরণ উজাড় করে তাঁকে অভিনন্দন জানায়। সে তার কর্ত্রীকে নিয়ে গর্ববোধ করে। আগে কোনো ধারণা ছিল না বটে, কিন্তু কর্ত্রী যে শীঘ্রই খুব বিখ্যাত মহিলা হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠবেন এখন সে-বিষয়ে তার কোনো সন্দেহই থাকে না। শ্রীমতী ওয়েন বেশ কয়েকবার কথা উত্থাপন করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু একজন ভদ্রমহিলা, বিশেষত একজন সতী বিধবা কিভাবে একজন পুরুষকে প্রস্তাব করতে পারে? কয়েকবার তিনি শাকসব্জি সম্পর্কে আলোচনা করতে বাগানে গেলেন। কিন্তু ওপরে নীল আকাশ এবং শাদা সূর্য, এবং তাঁর বিনম্রতা এবং দীর্ঘকালের অনুশীলন মনের কথা ব্যক্ত করা থেকে তাকে বাঁচিয়ে দিল। তিনি পারলেন না। চ্যাঙ এতোই সৎ এতোই বিশ্বস্ত। সে কখনো তাঁকে একজন রমণী বলে ভাবতে পারেনি। কিন্তু যখন সবকিছুই ঘটে গেল, তখন সে ছিল নিরুপায়।

মিছুয়া এবং ক্যাপটেনের মেয়ে হলে পরে তারা শ্রীমতী ওয়েনের কাছে এল নবজাতক নাতনীকে দেখাতে। সুন্দর স্বাস্থ্যবান শাদা এবং উষ্ণ শিশুটিকে কোলে নিয়ে বুকের ওপর চেপে ধরে কানের কাছে সুর করে গান করতে শ্রীমতী ওয়েন ভীষণ রোমাঞ্চ বোধ করলেন। বহুকাল তিনি কোনো শিশুকে ওভাবে কোলে নেন নি, এবং কতো অল্প বয়েসে তিনি ঠাকমা বনে গেছেন—তাঁর খুশীর শেষ থাকে না আর।

'মিছুয়া, তুমি বিবাহিত জীবনে সুখী হয়েছ বলে আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। ছেলে এবং স্বামী সম্পর্কে তুমি সত্যিই গর্ব করতে পারো।'

মিছুয়ার চোখে জল এসে গেল। তার মনে হল মা অনেক বেশি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছেন, এবং তাকে পুরোপুরি ক্ষমা করেছেন।

কিন্তু প্রথম দিনই মিছুয়া লক্ষ্য করল মা নিঃশব্দে একা একা বসে থাকে, সারা মুখে দুশ্চিন্তার বিষণ্ণ ছায়া। আগে যে আত্মকেন্দ্রিক, সুখী নারীকে দেখেছে মিছুয়া, ইনি যেন তিনি নন।

এর পরেই ক্যাপটেন সেই বিস্ময়কর খবরটি জানতে পারল। বাগানে আসার সময় ক্যাপটেন দেখল বৃদ্ধ চ্যাঙ মাটি কোপাচ্ছে। সে আসতেই চ্যাঙ তাকে তার শোবার জায়গাটিতে টেনে নিয়ে গেলে ক্যাপটেনের বিস্ময়ের সীমা রইল না। মালীর মুখে সুখ, উত্তেজনা এবং হতবুদ্ধিতা বিমিশ্র আলোছায়া শোভা পাচ্ছিল।

'অনুগ্রহ করে আমাকে বলুন আমি এখন কী করি, ক্যাপটেন। আমি একজন অশিক্ষিত লোক।'

'ব্যাপারটা কি?'

বৃদ্ধ চ্যাঙ এক মুহূর্ত দ্বিধা করল।

'আমার কর্ত্রীর কথা বলছি,' সে বলল।

'আমার শাশুড়ী কি কোনো অসুবিধায় পড়েছেন?'

'না। কিন্তু, ক্যাপটেন, কেবল আপনিই আমাকে সদুপদেশ দিতে পারেন। আমি বুঝতে পারছি না কি করা উচিত।'

'ব্যাপারটার সঙ্গে তুমিও কি জড়িয়ে পড়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'কি অসুবিধায় পড়েছ আমাকে খুলে বলো। আমি চলে যাওয়ার পর তোমাদের দুজনের মধ্যে কিছু হয়েছে কি?'

ঠিকমতো গুছিয়ে কথা বলার অভ্যাস ছিল না মালীর, সে খুব শ্লথ গতিতে বলতে লাগল। সে যা বলতে আরম্ভ করল ক্যাপটেন তা আদপেই বিশ্বাস করতে পারছিল না।

বৃদ্ধ চ্যাঙ ধীরে গম্ভীরভাবে বলে যাচ্ছিল।

ক্যাপটেন বুঝতে পারল তার সতী শাশুড়ী সমস্যার সমাধানের জন্য যে ঘোরালো পথ অবলম্বন করেছিলেন মিত্রয়ার মতো তরুণী হলে অনায়াসে একটা সাধারণ ভঙ্গি কিংবা চুম্বনেই সেই সমস্যার সমাধান করতে পারত।

গ্রীষ্মের রাতগুলোয় গরম পড়ে ছিল ভীষণ এবং বৃদ্ধ চ্যাঙ মাদুরের ওপর অর্ধনগ্ন হয়ে ঘুমোত। সপ্তাহখানেক আগে একদিন রাত্রে কর্ত্রীর ডাক শুনে চ্যাঙ জেগে যায়, 'বুড়ো চ্যাঙ!—চ্যাঙ্!' পশ্চিম আকাশে বিদায়ী সূর্য ঢলে পড়েছে, তার ফিকে আলো এসে পড়েছিল চ্যাঙের বিছানার ওপর, এবং সে দরোজার কাছে তার কর্ত্রীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে পড়ল এবং তিনি কিছু চাচ্ছেন কিনা জানতে চাইল।

'না,' শ্রীমতী ওয়েন বললেন, 'সত্যিই তুমি খব ঘুম-কাতুরে। আমি মুরগীছানার চেঁচামেচি শুনে ভাবলাম হয়ত বনবেড়ালেই ধরল একটাকে।'

মুরগীর খোঁয়াড়ে যেতে হলে বৃদ্ধ চ্যাঙের শোয়ার জায়গাটার পাশ দিয়ে যেতে হয়। রাত তিনটের কাছাকাছি তখন। শিশিরের জলে ঘাসগুলো ভিজে গেছে।

'শুতে যাও', বিধবা বললেন, 'গায়ে জামা নেই—ঠাণ্ডা লেগে যাবে।' কিন্তু বুড়ো চ্যাঙ তাঁকে রান্নাঘরের দরোজা পর্যন্ত এগিয়ে না দিয়ে ছাড়বে না।

চ্যাঙ ভাবল রাত্রিবেলায় পাহাড় থেকে বনবেড়াল শিকারের লোভে খোঁয়াড়ে আসে। কিন্তু কোনোদিন মুরগীছানাদের চেঁচামেচি শুনেছে বলে তার মনে হল না। অবিশ্যি সে বেশ নাক-ডাকিয়েই ঘুমোয়।

পরের দিন শ্রীমতী ওয়েন তাকে বললেন, 'খোঁয়াড়টা ভালো করে বন্ধ করো এবং দেখো যেন কিছু ওর ভেতরে ঢুকতে না পারে।'

'চিন্তা করবেন না।' সে বলল।

এরকম ঘটনা এর আগে কখনো ঘটেনি, কিন্তু তৃতীয় রাত্রিতে বেড়াতারের ভেতর দিয়ে ঢুকে একটা কালো রঙের মুরগীকে নিয়ে পালিয়ে গেল বলে মনে হল। বৃদ্ধ চ্যাঙ জেগে গেল, যখন সে উপলব্ধি করতে পারল কেউ একখানা চাদর দিয়ে তাকে ঢেকে দিচ্ছে, এবং তার কর্ত্রী তাকে নাড়া দিচ্ছে।

'ব্যাপার কী?' উঠে বসে সে জিজ্ঞাসা করল।

'একটা বনবেড়ালকে দেখতে পেলাম। দেয়ালের ওপর লাফ দিয়ে পালিয়ে গেল।'

চ্যাঙ তাড়াতাড়ি গায়ে একটা জামা গলিয়ে নিয়ে কর্ত্রীর সঙ্গে খোঁয়াড়ে এসে দেখল সেখানে একটা গর্ত করেছে। কর্ত্রী যেখানটায় বনবেড়ালটাকে দেখেছিলেন তাকে সেই জায়গাটা দেখালেন। কোনো পদচিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল না, কিন্তু দেয়ালের ওপরে কালো মুরগীটার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখতে পাওয়া গেল,—তার গলায় একটা রক্তাক্ত ক্ষত।

নিজের গাফিলতির জন্যে বুড়ো চ্যাঙ ক্ষমা প্রার্থনা করল, কিন্তু বিধবা খুবই সদয়ভাবে তাকে বললেন, 'কিন্তু আমাদের বিশেষ ক্ষতি তো হয় নি! কাল সকালে প্রাতরাশের সঙ্গে মুরগীর ঝোলও রান্না করে নেব।'

'আপনার ঘুম এতো পাতলা কেন?' বুড়ো চ্যাঙ জিজ্ঞাসা করল।

'ও, আমি অনেক রাত্রি পর্যন্ত না ঘুমিয়েই শুয়ে থাকি। ঘুমের ভেতরে আমি মৃদুতম শব্দও শুনতে পাই।' শ্রীমতী ওয়েন উত্তর দিলেন।

চ্যাঙ তার ঘরে ফিরে গেল, কিন্তু তার কর্ত্রী তখনো দরোজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেন। কর্ত্রীর পোশাকে এবং আঙুলের ডগায় রক্তের ছোপ লেগে ছিল, তার নজরে পড়ল। মৃত মুরগীটাকে মেঝের ওপর নিক্ষেপ করে কর্ত্রীর হাত ধুয়ে দেওয়ার জন্যে সে খানিকটা জল ঢালল, এবং জিজ্ঞাসা করল তিনি এককাপ চা পান করবেন কি না।

প্রথমে তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন, কিন্তু পরক্ষণে জানালেন পান করবেন। এখন তিনি পুরোপুরি সজাগ ছিলেন, এবং আবার তক্ষুনি ঘুমোতে যাবেন বলে মনে হল না।

'আমি এখানে চা-টা নিয়ে আসব?' বুড়ো চ্যাঙ জিজ্ঞাসা করল।

'না।' তিনি বললেন, 'এখন বাইরে থাকতে খুব ভালো লাগছে।'

'আমি এক্ষুনি করে আনছি।'

'তাড়াতাড়ি করার দরকার নেই,' শ্রীমতী ওয়েন বললেন।

তিনি তার বিছানার ওপর বসলেন, এবং মাদুর, ময়লা চাদর, ওয়াড় নেড়েচেড়ে দেখলেন, এবং মনে মনে বললেন, 'বুড়ো চ্যাঙ, আমি জানিনা তোমার কোনো ভালো চাদর নেই। কালই তোমাকে আমি একটা চাদর দেবো।'

পরদিন সকালে মুরগীর ঝোলের পাত্রটা সামনে রাখার সময় তিনি আরো একবার তাকে বনবেড়াল সম্পর্কে সতর্ক করে দিলেন।

খোঁয়াড়টা সারিয়েছ তো?

সে জানাল সে সারিয়েছে, অবশ্যই সারিয়েছে।

'সেই বেরালটাই আবার আজ আসতে পারে।' তিনি বললেন।

'আপনি কি করে জানলেন?'

'কেন, গত রাতে সে যা চেয়েছিল তা পায় নি। সে খুবই নিরীহ। মুরগীটাকে প্রায় তুলে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ভয় পেয়ে ফেলে পালিয়েছিল। মুরগীটা সে চায় এবং কোথায় মুরগী থাকে তা সে জানে। তারপর, যদি সে বিবেচক বেড়াল হয়, তাহলে তার আজ রাতে আবার আসা উচিত। ব্যাপারটা পরিষ্কার হল কি?'

'সুতরাং আমি দৃঢ় সঙ্কল্প হলাম,' মালী তার গল্প চালিয়ে যেতে থাকল, 'বসে-বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগলাম, এবং কর্ত্রীকে দুর্ভাবনা করতে বারণ করলাম। আমি আলোটা কমিয়ে দিলাম, এবং ঝোপের পেছনে একটা টুল নিয়ে এসে বসলাম, হাতে একটা মোটা

লাটি নিয়ে অপেক্ষা করছি—বনবেড়ালটা এলেই এক ঘায়ে ওর মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো—যেন আর কখনো ও আমার বাগানে পা ফেলতে সাহস না করে। আকাশে মাথার ওপরে চাঁদ উঠল, তবু তখনো বেড়ালের সাড়াশব্দ নেই, এবং তারপর সেই চাঁদ নিচে গড়িয়ে গেল, তখনো বেড়ালের টুঁ-শব্দটি শোনা গেল না।

'বেশ শীত করছিল এবং আমি ফিরে যাব বলে মনঃস্থির করেছি, তক্ষুনি আমার কর্ত্রীর মৃদু কণ্ঠস্বর কানে এল, 'বুড়ো চাঙ !'

'আমি ঘুরে তাকালাম এবং দেখলাম আমার কর্ত্রী আপাদমস্তক শাদা পোশাকে আবৃত হয়ে পরী মাকুর মতো আশ্চর্য জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আমার ঘরের দিকে এগিয়ে আসছেন।

আমার খুব কাছে এসে ফিসফিস করে বললেন, 'তুমি কি কিছু দেখেছ ?'

'না, কিছু না', আমি উত্তর দিলাম।

'চলো তোমার ঘরে অপেক্ষা করি।' তিনি আমাকে বললেন।

'আমার জীবনে এমন আশ্চর্য রাত আর কখনো আসে নি।

আমরা দুজন সেখানে বসে, আমি আর আমার কর্ত্রী, যখন সমস্ত বিশ্বচরাচর নিদ্রামগ্ন এবং নীরব। ওইদিন সকালে তিনি আমাকে একখানি বিছানার চাদর উপহার দিয়েছিলেন। চাদরটা এতো শাদা আর আনকোরা নতুন ছিল যে তার ওপর বসার ইচ্ছা হচ্ছিল না আমার,—পাছে তাতে ভাঁজ পড়ে যায়। ঠাসাঠাসি করে বসে আমরা দুজনে রুপালি চাঁদের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। জানলার ফাঁক দিয়ে অজস্র রুপালি আলো ঘরের ভেতর ছড়িয়ে পড়েছিল। মনে হচ্ছিল যেন আমরা দুজনে বহু—বহুকাল ধরে' পরস্পরের চেনাজানা।

'আমরা বসে বসে গল্প করছিলাম, অথবা আমার চেয়ে বরং আমার কর্ত্রী বেশি কথা বলছিল—নানান রকমের কথা—বাগান সম্পর্কে, জীবন এবং প্রেম সম্পর্কে, হৃদয়ের সুখ ও দুঃখ সম্পর্কে। তিনি আমার

অতীত জীবনের কথা জানতে চাইলেন,—কেন আমি বিয়ে করিনি তা-ও জানতে চাইলেন। আমি তাঁকে বললাম যে বিয়ে করে স্ত্রীর ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা আমার সাধ্যায়ত্ত ছিল না।'

'যদি তোমার ভরণ-পোষণের সামর্থ থাকত, তাহলে কি বিয়ে করতে?' শ্রীমতী ওয়েন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

'নিশ্চয় করতাম।' বৃদ্ধ চ্যাঙ উত্তর দিয়েছিল।

বিধবা নিবিষ্ট দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল, তার দৃষ্টি গভীর স্বপ্নময়, এবং মালীর চোখে প্রায় অপার্থিব বলে মনে হল। তার শীর্ণ মুখের ওপর চাঁদের বিনম্র আলো ঝরে পড়ছিল। বৃদ্ধ চ্যাঙ প্রায় শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল।

'তুমি কি বাস্তব, নাকি। পূর্ণচন্দ্রের ভেতর থেকে শুভ্র বসনে বেরিয়ে এসেছ মাকুর মতো কোনো অপরূপ পরী?' সে জিজ্ঞাসা করল।

'বৃদ্ধ চ্যাঙ, বোকামো করো না। নিশ্চয়ই আমি বাস্তব।

যখন তিনি একথা বললেন, তাঁকে তার আরো অপার্থিব বলে মনে হল, এবং তাঁর চোখ তার দিকেই চেয়ে ছিল, তবু চেয়েও ছিল না যেন। মালী তাঁর দিকে না তাকিয়ে নিস্তার পেল না।

'আমার দিকে ওরকম করে চেয়ে থেকো না। আমি সত্যিকার একজন নারী। আমাকে ছুঁয়ে দেখো।'

তিনি তাঁর বাহুযুগল বাড়িয়ে দিলেন। বৃদ্ধ চ্যাঙ তাঁর বাহু স্পর্শ করে দেখল এবং শ্রীমতী ওয়েন কেঁপে কেঁপে উঠলেন।

'আমি ভীষণ দুঃখিত। আপনি কি ভয় পেলেন?' ক্ষমা প্রার্থনার স্বরে মালী জিজ্ঞাসা করল। 'এই রাত্রির মতো কোনো চন্দ্রখচিত রাত্রিতে চাঁদের দেশ থেকে কোনো এক পরী—পরী মাকুই যেন বের হয়ে এল—এক মুহূর্তের জন্যে আমার তা-ই মনে হয়েছিল।'

বিধবা মৃদু চাপা হাসি হাসলেন এবং বৃদ্ধ চ্যাঙ মুক্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

'আমি কি ওইরকম সুন্দরী, চ্যাঙ?' তিনি বললেন। 'আমার

সাধ তোমার এই ধারণা যেন চিরকাল এমনিই থাকে। মানুষ এবং মানুষী পৃথিবীতে যেমন পরস্পরকে ভালোবাসে, বলো, পরী মাকুও কী তেমনি ভালোবাসতে পারে?'

'আমি কি করে জানব?' সং চ্যাঙ বলল, কর্ত্রীর ইঙ্গিত ধরতে পারল না। 'পরী মাকুকে তো আর আমি কখনো দেখি নি।'

তারপর শ্রীমতী ওয়েন এমন একটা প্রশ্ন করলেন যা মালীকে বিহ্বল করে তুলল। "আজ রাতে যদি তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়, কি করবে তুমি? তুমি কি তাকে ভালোবাসবে? আমি যদি পরী মাকু না হয়ে একজন সত্যিকার নারী হই তাহলে কাকে তুমি বেশী ভালোবাসবে?'

'মালিকানী, তুমি ঠাট্টা করছ। সে-সাহস আমার কোথায়?'

'আমি ঠাট্টা করছি না, বরং ভেবেচিন্তেই বলছি। মিছুয়া এবং ক্যাপটেন—স্বামী এবং স্ত্রী যেমন সুখী,—আমরা যদি সে-ভাবে পরস্পরে ভালোবাসি তাহলে কি তুমি সুখী হবে?'

'মনিবানী, আমি তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারছি না। আমার এমন সৌভাগ্য হবে আমি তা বিশ্বাস করতে পারছি না। কিন্তু সতীত্বের তোরণের কি হবে?'

'চুলোয় যাক তোমার সতীত্বের তোরণ। আমি তোমাকে চাই। আমরা দুজনে সুখী হতে পারি এবং বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত সুখে বসবাস করতে পারি। লোকে কি বলবে-না-বলবে আমি তা গ্রাহ্য করি না। কুড়ি বছর ধরে বৈধব্য পালন করেছি,—যথেষ্ট হয়েছে। অন্য কোনো সতী বিধবা ওই পুরস্কার পাক। আমি কোনো পুরস্কার চাই না।'

তিনি তাকে চুম্বন করলেন।

'ক্যাপটেন, আমি কি করতে পারি?' গল্প শেষ করে গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করে বৃদ্ধ চ্যাঙ চিৎকার করে উঠল। 'সম্রাটের প্রতি-বন্ধকতা করার আমি কে? কিন্তু আমার কর্ত্রী বলেন, এই ঠিক। তিনি এখন আমাকে বিয়ে করতে বলছেন, নতুবা পরে বিয়ের জন্যে

তাঁকে শত অনুরোধ করলেও তিনি আর রাজী হবেন না। কল্পনা করুন আমার মনিবানী তা-ই বলছেন। তিনি বলেন তিনি আমাকে নিয়েই সুখী হবেন এবং এখন যেভাবে তাঁকে সাহায্য করছি তেমনি ভাবে সাহায্য করলেই তাঁর চলে যাবে। ক্যাপটেন, আমি কি করব বলে দিন।'

খুব ধীরে ধীরে বিষয়টা ক্যাপটেনের মগজে ঢুকল, কেননা, প্রথমে সে খানিকটা বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল, মালীর কথার প্রত্যেকটা শব্দের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করছিল। খানিকক্ষণ খাবি খেয়ে হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল, "কি করবে? বোকারাম কোথাকার। বিয়ে করে ফ্যালো।'

বিদ্যুৎ গতিতে ক্যাপটেন মিলুয়ার কাছে সংবাদটা বয়ে নিয়ে এল।

'মায়ের ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল, আমি আরো সুখী এখন,' মিলুয়া বলল। এবং তারপর সে ফিসফিস করে স্বামীর কানে কানে বলল, 'মা নির্ঘাত ওই কালো মুরগীটাকে নিজেই হত্যা করেছিল। চ্যাঙের মতো পুরুষেরই সতীত্বের তোরণের মতো কোনো পুরস্কার পাওয়া উচিত।'

সেদিন সন্ধ্যায়, নৈশভোজের পর, শ্রীমতী ওয়েনকে ক্যাপটেন বলল, 'মা, আমি ভাবছি—আমি নিশ্চিত যে আমাদের এই শিশুকন্যা আপনাকে গভীরভাবে হতাশ করেছে। আমরা জানি না কবে আমরা শিশুপুত্র লাভ করব, যে ওয়েন পদবি গ্রহণ করতে পারবে।'

শ্রীমতী ওয়েন চোখ তুলে তাকালেন। ক্যাপটেন নিচের দিকে চোখ নামিয়ে গম্ভীরভাবে বলে গেল, 'আমি ভেবে চলেছি। আপনি আমার কথায় হাসবেন না বা আমাকে বিদ্রূপ করবেন না। ঠাকমা মারা গেছেন এবং আপনি ভীষণ নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে চলেছেন। চ্যাঙ একজন সৎ ব্যক্তি। যদি আপনি আমাকে তার সঙ্গে কথা

বলতে আদেশ করেন, আমার মনে হয় আপনাকে বিয়ে করার পর সে খুশী হয়ে ওয়েন পরিবারের নাম গ্রহণ করবে।

শ্রীমতী ওয়েন লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠলেন। তিনি বলতে লাগলেন, 'হ্যাঁ, ওয়েন পরিবারের 'নাম······' এবং কক্ষান্তরে ছুটে পালিয়ে গেলেন।

মালীর সঙ্গে শ্রীমতী ওয়েনের বিবাহ সম্পন্ন হওয়ায় ওয়েন-বংশীয়েরা ক্রুদ্ধ হতাশায় জ্বলে উঠল।

'স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্ দেবা ন জানন্তি', খুড়ো-ঠাকুর্দা বলেই ফেললেন।

অসূয়া

[মাঙ-যুগের সঙ্কলন চিঙপেন যুঙ্ক শিয়াওশুয়ো। লেখক অজ্ঞাত। এটি সম্ভবত সেই ধরনের গল্প যা সাধারণত চায়ের দোকানের শ্রোতারা উপভোগ করে থাকে। গল্পটা এমনভাবে বোনা হয়েছে যে, গল্পের শেষে, কেবল একজন নয়, অনেক জনের একটা দল ছদ্মবেশ খসিয়ে স্বপ্রকাশ হয়েছে যে তারা সবাই ভূত, এবং এর থেকেই চরম ভীতির মুহূর্তের সৃষ্টি। 'অসূয়া' (Jelousy) পরবর্তীকালে মিঙ সংগ্রহ চিঙশি তঙইয়েন এ পরিবর্ধিত আকারে সঙ্কলিত হয়।]

যু চঙ, রাজধানীর একজন পরিত্যক্ত, স্বেচ্ছানির্বাসিত প্রবাসী। তার প্রাইভেট স্কুলের ছাত্রেরা রোজ যখন বাড়ি ফিরে যায় তখন সে একধরনের সুখজনক নিঃসঙ্গ জীবনের ভারি অদ্ভুত এক অনুভূতি আস্বাদ করে থাকে। নিজের চা নিজে একা একা পান করতে তার একেবারেই খারাপ লাগে না। বরং স্ত্রীভূমিকাবর্জিত বাসাবাড়িটার ভেতর দিকের উঠোনে বসে থেকে সে আশ্চর্য এক গোপন মাধুর্য উপভোগ করে থাকে।

চমৎকার একটা বেডরুম আছে তার। একটা ড্রেসিং-টেবিল, একটা পুরনো প্রসাধনী আধার, তার ওপরে সহজেই ভাঁজ করা যায় এমন একটা আয়না, আর চেনা-অচেনা নানারকম মেয়েলি প্রয়োজনের জিনিসপত্র, এবং সবকিছুতে মেয়েলি হাতের নিবিড় স্পর্শ। পাউডারের দাগধরা ড্রয়ারে ছুঁচ, রিবন, চুলের কাঁটা, এইসব। ঘরে ঢুকলেই সঙ্গে সঙ্গে নাকে এসে লাগে মিহি সৌরভের মিষ্টি আঘ্রাণ। যু বুঝতে পারে, মৃগনাভির এই উত্তেজক গন্ধ চিরস্থায়ী বাসা বেঁধেছে ঐ ঘরে। অথচ ঠিক কোথা থেকে আসছে গন্ধটা তার দৃশ্যময় অস্তিত্ব কিছুতেই ঠাহর করে উঠতে পারে না যু। এবং স্ত্রীলোকের সাজঘরের এই পরিবেশ তার অবিবাহিত জীবনের কল্পনার সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে

মেতে ওঠে সহজেই। ভাববিলাসী বলেই কি-রকম মেয়ে এখানে বাস করত নিজের মনে তার স্বপ্নময় ছবি আঁকার চেষ্টা করে সে। কেমন সে-মেয়ে? দীর্ঘাঙ্গী, নাকি তন্বী? কেমন ছিল তার কণ্ঠস্বর? আমূল গৃহবাসী বলেই এইসব কল্পনা বিশ্বাস করার জন্যে একটা সত্যিকার রক্ত মাংসের নারীর প্রয়োজন উপলব্ধি করত য়ু।

হ্যাংচাউয়ের মতো বড়ো শহরে, য়ু কল্পনা করত, নিশ্চয়ই খুব রহস্যময়ী, মনোহারিনী, সেরা সেরা সুন্দরী মেয়ে ছিল সব। আফিমের মতো নেশালু ছিল তাদের শরীর? নাকি টোল পড়ত তাদের নিভাঁজ রক্তিম গালে?

এই কারণেই, বৃত্তিপরীক্ষা এবং সাহিত্য প্রতিযোগিতায় অনুত্তীর্ণ হয়েও, নিজের বাস্তুভিটে ফুচাউয়ে ফিরে যাওয়ার বদলে এই শহরটায় থেকে যাওয়া অনেক হার্দা বলে মনে হয়েছিল তার। মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছিল যে: হ্যাংচাউ থেকে ফুচাউ অনেক দূরের পথ, এবং বেশ ব্যয়সাপেক্ষ, এবং পরের বছরের পরীক্ষার সময় কাল পর্যন্ত কেবল হ্যাংচাউয়েই ত থাকা উচিত তার। সাহিত্যে ভাগ্যহীন, কিন্তু ভালোবাসায় ভাগ্যবান। বিবাহযোগ্য সুদর্শন যুবক সে। তার কাছে এই শহরের কিছু ঋণ আছে বৈকি। মনের মতো কনে পেলে বিয়ের পিঁড়েয় বসতে রাজী ত সে এক্ষুনি। কল্পনা যদি সত্যি হয়ে ওঠে, শয়তানের বাগান থেকে একটা কিশমিশ পেড়ে নিতে সবুর সইবে না তার একটি দণ্ডও।

'আহ, আমি যদি তেমন, কোনো ধনী, সুন্দরী, একাকিনী একটি নারীরত্নের সাক্ষাৎ পেতাম!' য়ু মনে মনে ভাবে।

নিজের ঘরখানি তার পছন্দসই। ঘরের বাইরের দেওয়াল মাটির ইটের তৈরি, চুনকাম বিহীন (এবং ভাড়াও নামমাত্র), অথচ কি মোহ আর যাদু এর চার দেয়ালের ভেতরে। শহর থেকে দূরে; একেবারে নির্জন। এবং তাই এতো সস্তা। কিন্তু গোটা গল্পটা তা নয়। আরো আছে। যেমন: একজন নির্জন প্রবাসী শিক্ষার্থী শান্ত রজনীর

নিভৃতে বসে আছে, হঠাৎ মাথা তুলতেই সে দেখতে পায় এক মোহময়ী বিদেহী রমণী প্রদীপের কম্প্র আলোর দিকে তাকিয়ে তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে; রমণী প্রতি রাত্রে গোপনে তার কাছে আসে, তার সঙ্গে সহবাস করে, তার টাকা বাঁচায়, অসুখে শুশ্রূষা করে—বিস্ময়ের স্বপ্ন বাস্তব হয়ে ওঠে—এরকম কতো গল্পই ত সে শুনেছে। মনে মনে বলে: কোনো প্রেতরমণীর সঙ্গেও সহবাস করতে উৎসুক সে—যদি এই ঘরে কেউ বাস করে। কেন সেই রমণীকে মৃত ভাববে সে—যখন সে তাকেই চায়? ভাবে: রাত্রিকালে যখন নিবিড় ঘুমে আচ্ছন্ন থাকবে সে, তখন যেন সেই প্রিয় রমণীর কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। অথচ, সতর্কভাবে কান পেতে থেকেও অভিলাষী নারীকণ্ঠের বদলে প্রতিবেশীর বেড়ালছানার কান্না শুনতে হয় তাকে। এই রকম করুণ হতাশায় রাত কাটে য়ু-র। একটি সত্যিকার রক্তমাংসের মেয়েকে বিয়ে করলে হয় না?

একথা ঠিক যে, শহরে নিঃসঙ্গ অবিবাহিত একজন আগন্তুক যুবকের সুবিধা অনেক বেশি। অনেক বাপ-মা মেয়ের সঙ্গে এমন ছেলের বিয়ে দিতে চায় যার স্বজনপরিবৃত বড়ো সংসার নেই। এবং য়ু-র আশাও সেইখানে।

একদিন ওড়পো এল। এই বাড়িটায় আসার আগে য়ু যখন চিয়েনটাঙ গেটে থাকত তখন থেকে ওড়পোর সঙ্গে তার চেনাজানা। পেশায় ঘটকী বলে য়ুর-জন্যে ঘটকালি করতে চেয়েছিল ওড়পো। কিন্তু তখন রাজধানীতে সদ্য আগমনের উত্তেজনা এবং পরীক্ষাদি নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত ছিল য়ু। এখন মানসিকভাবে প্রস্তুত, তখন ছিল না।

খুব চমকপ্রদ ভঙ্গিতে বৃদ্ধা ওড়পো ফিসফিস করে য়ুকে জানাল যে সে তার সঙ্গে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চায়, এবং তারপরেই য়ুকে তাকে অনুসরণ করতে সঙ্কেত করল। বৃদ্ধার ঘাড়ের ওপর একখণ্ড কেকের মতো পাতলা পাক-ধরা চুলের খোঁপা। য়ু লক্ষ্য করল,

এপ্রিলের এই ভ্যাপসা গরমেও তার গলায় একটা লাল কাপড় জড়ানো। য়ু ভাবল গলায় ঠাণ্ডা বসেছে নিশ্চয়।

'তুমি খুশী হবে এরকম একটা প্রস্তাব তোমায় দিতে পারি,' রোমান্টিক কণ্ঠস্বরে জানাল বৃদ্ধা। অকুণ্ঠিত হাসি এবং মনোরম বাগ্‌ভঙ্গি মহিলার দুটি বিশেষ গুণ। তার রোমান্সের এই বৃত্তিতে গুণ দুটি অবশ্যই মূলধন।

য়ু বসতে বলল, এবং মুখোমুখি চেয়ারটা টেনে নিয়ে গিয়ে ঘনিষ্ঠ-ভাবে জানতে চাইল ওঙপোর কাজকারবার কেমন চলছে। প্রায় এক বছর পরে এই তাদের প্রথম দেখা-সাক্ষাৎ।

'আমার খবর জেনে আর কি হবে? আমার মনে আছে তোমার বয়েস বাইশ। সে-ও বাইশ।' গলার লাল কাপড়টা একটুখানি টেনে বলল,—যেন গলায় কোনো ক্ষত হয়েছে,—হয়ত ঘুমন্ত অবস্থায় চামড়ার মসৃণ বালিশ থেকে মাথাটা গড়িয়ে পড়ে গেছল, য়ু ভাবল।

'কে?'

'যে মেয়েটির কথা আমি তোমাকে বলতে এসেছি।'

'বাইশ হতে পারে এরকম যে কোনো মেয়ের কথাই তুমি বলতে পারো,' য়ু একটু বিশ্বাসের সুরে বলল, 'যতক্ষণ তুমি হ্যাঙচাউয়ের মিষ্টি মোহময়ী মেয়েদের একটিকে আমার জন্যে যোগাড় করতে না পারছ ততক্ষণ বিয়ের জন্যে আমার তেমন তাড়াহুড়ো নেই।'

ওঙপো কয়েকটা বিবাহযোগ্যা পাত্রী সম্পর্কে প্রস্তাব দিল, কিন্তু খোঁজ-খবর নিয়ে বোঝা গেল সবগুলোই খুব সাধারণ এবং নিকৃষ্ট মানের।

'তোমরা ঘটকীরা সবাই কথার ভেল্কি দেখাতে পারো। প্রতিপদের চাঁদকে তোমরা পূর্ণিমার চাঁদের সূচনা বলে বোঝাও, আর অমাবস্যার চাঁদকে ঢাকতে গিয়ে এই বলে থাকো যে 'তুমি ত ওর আর-একটা পাশ এখনো দেখো নি।' কিন্তু আমি চাই পূর্ণিমা।

একথা সত্যি যে ওঙপোর কাজ হল শহরের বিবাহযোগ্য যুবক-যুবতীর দুই হাত এক-করা—এবং তা যে সব সময় সন্তোষজনক হয়ে

থাকবে তা নিশ্চয়ই বলা যায় না। অথচ বাইশ বছরের একজন যুবক এখনো অবিবাহিত থেকে যাবে—ঈশ্বরের চোখে তা একটা ঘোরতর অপরাধ বলে সে মনে করে।

'কি রকম মেয়ে তোমার পছন্দ?'

'আমি এমন একজন যুবতীকে চাই, অবশ্যই যে সুন্দরী, বুদ্ধিমতী এবং সম্পূর্ণভাবে নিঃসঙ্গ।'

'এবং হয়ত যে তোমার হাজার খানেক স্বর্ণমুদ্রা এবং একটি সুন্দরী তরুণী পরিচারিকাকেও যৌতুক দিতে রাজী, তাই—য়্যাঁ?' ওভ্‌পো জুড়ে দিয়ে বলল, এবং এমনভাবে হাসল যেন য়ুকে সে পরাস্ত করতে পেরেছে। 'সে একেবারে একা গো, এবং তার কোনো আত্মীয়-টাত্মীয় নেই।' যদিও ঘরে আর তৃতীয় কোনো প্রাণী ছিল না, তথাপি ওভ্‌পো য়ুর আরো কাছাকাছি চেয়ারটা টেনে নিয়ে কানে কানে বলল।

গভীর মনোযোগ দিয়ে য়ু তার কথা শুনল।

ওভ্‌পো একজন সত্যিকার সুন্দরী বাঞ্ছিতা যুবতীর নাম করল। মেয়েটি একজন প্রসিদ্ধ বাঁশি-বাজিয়ে। কিছুদিন হল সে তার আগেকার মনিবের কাজ ছেড়ে দিয়েছে। সম্রাটের সেজো ছেলের শিক্ষক ছিল এই মনিব। এই ধরনের ধনী পরিবারের মেহ্‌ফিলখানায় সময়সময়কার জন্যে অভিনেত্রী এবং গায়িকাদের যে একটা দল থাকে, মেয়েটি তাদেরই একজন। লোকে এই যুবতীকে লি রানিয়া বলে জানে। কুমারী লি স্বাধীন, আত্মনির্ভরশীল। সংসারে কেবল ধাত্রীমাতা ছাড়া তার আর কেউ নেই, এবং এই ধাত্রীও তার সাহায্যের ওপর নির্ভর করে না, সে-ও স্বাধীনভাবে উপার্জন করে থাকে। মেয়েটির নিজের কাছেই কয়েক হাজার স্বর্ণমুদ্রা আছে, এবং নিজের ঝিকেও সে সঙ্গে নিয়ে আসবে।

'মনে হচ্ছে পাত্রী বেশ ভালোই,' য়ু বলল, 'কিন্তু সে আমার মতো একজন দরিদ্র শিক্ষককে বিয়ে করতে রাজী হবে কেন?'

'তার নিজেরই বিস্তর টাকা-পয়সা আছে,—টাকা-পয়সার লোভ

সে করে না। একজন নিঃসঙ্গ, আত্মীয় পরিজনহীন শিক্ষককেই সে বিয়ে করতে চায়। এক ধনী ব্যবসায়ী তাকে প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু একজন ব্যবসাদারকে বিয়ে করতে তার ভীষণ আপত্তি। আমি ঐ বিয়েতে তাকে প্ররোচিত করেছিলাম,—কিন্তু ভারি জেদী মেয়ে। 'না', আমাকে সে বলল, 'আমার জন্যে একটা শিক্ষক-পাত্র জোগাড় কর,—যার গুরুজন কিংবা আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। এবং তাই তোমার কথা আমার মনে হয়েছে, এবং তোমার কাছে তার হয়ে প্রস্তাবও নিয়ে এসেছি। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ—তুমি কতো ভাগ্যবান।'

'সে থাকে কোথায়?'

'শুভ্র-সারস-হ্রদের কাছে ধাই-মার সঙ্গে থাকে। যদি দেখতে বা আলাপ-পরিচয় করতে চাও, সে-ব্যবস্থাও করতে পারি।'

'এর চেয়ে ভালো প্রস্তাব আর কি হতে পারে?'

কয়েকদিন পরে পূর্বনির্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুসারে য়ু একটি রেস্তোরাঁয় গেল। সেখানে যুবতীর ধাত্রীমাতা শ্রীমতী চেনের সঙ্গে য়ুর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। দিনটা ছিল খুব উজ্জ্বল এবং ঝকঝকে। অথচ কোনো কারণবশত মহিলার চুল ভেজা ছিল, এবং চুল থেকে ফোঁটা-ফোঁটা জল ঝরছিল। 'আমার এরকম ভেজা চেহারার জন্যে নিশ্চয় আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন,' শ্রীমতী চেন ব্যাখ্যা করে বলল, 'দুর্ভাগ্যক্রমে রাস্তায় এক ভিস্তিঅলার সঙ্গে ধাক্কা লাগায় আমার এই অবস্থা।'

'উনি কোথায়?' য়ু জিজ্ঞাসা করল।

'ও ত পাশের ঘরেই আছে। ওর সঙ্গে যে অল্প বয়েসি মেয়েটি আছে সে ওর পরিচারিকা, চিন্-এর্। খুব ভালো মেয়ে। রান্নাবান্না সেলাই-ফোঁড়াই—বাড়ির সব কাজই করতে পারে।'

শ্রীমতী চেন্ য়ুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে পাশের ঘরে গেল, তার চলে-যাওয়ার সময় ভিজে পায়ের অদ্ভুত সব ছাপ পড়ে গেল মেঝেয়। গুওপো য়ুর সঙ্গেই থাকল, য়ু আঙুল চুষতে-চুষতে উঠে দাঁড়িয়ে জাফরি

কাটা পার্টিশনের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগল। দেখল, ধাই-মা নিচু হয়ে একজন যুবতীকে ফিসফিস করে কি-সব বলছে। য়ু যুবতীর নাকের ডগাটা দেখতে পেল কেবল, হঠাৎ মাথা তুলতে চোখাচোখি হতেই মিষ্টি করে হাসল মেয়েটি, এবং সচেতনভাবে লজ্জায় রক্তিম হল। কড়ির মতোন শাদা মুখ, ঘন কালো দুই চোখ। পনের ষোল বছরের আর একটি তরুণী খুব আগ্রহ সহকারে ওদের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করছিল। য়ু বিস্ময় ও আনন্দে রোমাঞ্চিত হল।

'অসম্ভব—' নিজের মনে বিড়বিড় করে উঠল য়ু। 'ব্যাপার কি?'

'ওই মেয়েটির সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হয়, হ্যাংচাউয়ে আমার চেয়ে সুখী আর কে হতে পারে?'

ডিনারটেবিলে বসেই য়ু পাশের ঘরে উচ্ছল হাসির সঙ্গে মেশানো মেয়েলি কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিল। ওখানে যেন আনন্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। একবার চোখ তুলে য়ু দেখতে পেল একজোড়া কালো গভীর চোখ পার্টিশনের ফাঁক দিয়ে কেবল তাকেই নিরীক্ষণ করছে, চোখে চোখ পড়তে মুহূর্তেই সেই একজোড়া চোখ অপসৃত হল, এবং সঙ্গে সঙ্গে মেয়েলি চলনের অনিয়মিত শব্দের সঙ্গে মুখচাপা হাসির ফোয়ারা খুলে গেল যেন, শুনে য়ুর মনে হল তরুণী পরিচারিকাটিই হেসে খুন হচ্ছে।

'সত্যি কথা বলতে কি,' ওড়পো স্মিতহাস্যে মন্তব্য করল, 'আপনারা দুজনেই পরস্পরকে দেখার জন্যে সমান আগ্রহী বলেই আমি এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেছি। ও বলেছে, না-দেখে খালি পয়সা দিয়ে স্বামী হিসেবে কাউকে কিনে নিতে ও চায় না। আপনি ওর কাছ থেকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পাচ্ছেন, কিন্তু বিনিময়ে আপনাকে কিছুই দিতে হচ্ছে না।'

স্থির হল এক পক্ষকালের মধ্যেই বিবাহ সম্পন্ন হবে। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আরো স্থির হল যে ভাবী জামাতা এ শহরে যেহেতু

আগন্তুকমাত্র. সেহেতু বিয়েতে খুব একটা জাঁকজমক হবে না। কুমারী লি বিনা আড়ম্বরে পরিচারিকাকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীর ঘর করতে আসবে।

ওডপোর সঙ্গে এতো কথা হল, কিন্তু কুমারী লি আগের মনিবের ঘর থেকে কেন চলে এসেছে সে-কথা ওডপোকে জিজ্ঞাসা করার কথা একবারও মনে হয় নি য়ুর।

বিয়ের দিনটির জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে য়ু। কিন্তু দুর্ভাগ্যের মতো সৌভাগ্যও যেন ঝাঁক বেঁধে আসে। ঠিক পরের হপ্তায় বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে য়ুর কাছে এলেন আর এক মহিলা। ঝামেলা এড়াবার জন্যে য়ু স্পষ্টভাবেই তাঁকে জানাল যে, তার বিয়ের সব ঠিকঠাক, কাজেই এ নিয়ে আর কারো সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে সে রাজী নয়। কিন্তু মহিলা ভয়ানক নাছোড়বান্দা।

শেষমেশ কুপিত মহিলা জিজ্ঞাসা করে বসলেন, 'যার সঙ্গে আপনার বিয়ে হচ্ছে সেই ভাগ্যবতী নারীটি কে—তা জানতে পারি কি?'

মহিলা নিজেকে শ্রীযুক্ত চুয়াঙের বিধবা বলে পরিচয় দিলেন।

য়ু সানন্দে তার বাগ্‌দত্তার নাম করল। শুনে মহিলা ভীষণ একটা অনিচ্ছার আবেগকে দমন করতে চেষ্টা করলেন বলে য়ুর মনে হল।

'কি হল আপনার?' য়ু জিজ্ঞাসা করল।

'ন্‌-না, কিছু না। বিয়ের কথা যখন পাকা, তখন করার কি আছে?'

য়ুর কৌতূহল হল, জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি আমার ভাবী স্ত্রীকে চেনেন?'

'চিনি মানে!—ভালো করেই তো চিনি!' একমুহূর্ত থেমে আবার বললেন, 'আমি আর একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আপনার কাছে এসেছিলাম। যে-মেয়ের কথা আপনাকে বলছি সে এককথায় অতুলনীয়া। একজন পুরুষ যা চাইতে পারে, কামনা করতে

পারে তার চেয়েও বেশি। ফুলের মতোন সুন্দর, যেমনি মিষ্টি স্বভাব, তেমনি আবার খাটিয়েও খুব। রান্নাবান্না সেলাই-ফোঁড়াই কিছুতেই কম যায় না। আপনার-মতো ভদ্রলোকের স্ত্রী হওয়ার মতো যোগ্য পাত্রী সে। আমার বলতে দ্বিধা নেই যে আমি আমার মেয়ের কথাই বলছি। আপনাকে বাধা দেব না, তবে একথা নিশ্চয়ই বলব যে আমার মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে পেলে আপনি হয়ত আরো সুখী হতে পারতেন। ঘটকীদের কথায় কি ভরসা করা যায়?'

য়ু ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠছিল। বলল, 'পাত্রী আমি স্বচক্ষে দেখেছি, এবং আমি বাগ্‌দত্ত।' অর্থাৎ এইভাবে চোয়াঙের বিধবাকে য় ভদ্রভাবে বিদায় করতে বাধ্য হল।

এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় একটি সুসজ্জিত পালকি-চেয়ারে চেপে কুমারী লি য়ুর ঘরে এল, সঙ্গে তরুণী পরিচারিকা, ধাত্রীমাতা, এবং ঘটকী ওঙ্‌পো। পালকি-বাহকেরা বকশিশের অপেক্ষা না করে ওদের নামিয়ে দিয়েই তড়িঘড়ি চলে গেল, এরকম ক্ষেত্রে সচরাচর এমনটা কখনও ঘটতে দেখা যায় না। য়ু একটু অবাক হল, কিন্তু ততক্ষণে বাহকেরা অন্ধকারে নিরুদ্দেশ। ঝি চিন্‌-এর্‌ নববধূর কাপড়-চোপড়ের মোড়ক খোলা থেকে জল আনা চা-তৈরি করা সব কিছুই নিজে করল। নববধূ একসেট বাদ্যযন্ত্র সঙ্গে এনেছিল। চিন্‌-এর্‌ দক্ষতার সঙ্গে সেগুলিও গোছগাছ করে টেবিলে সাজিয়ে রাখল। ঠিক বিড়ালশাবকের মতো ভারি আমুদে মেয়ে এই চিন্‌-এর্; আদেশ কিংবা অনুরোধের পরোয়া না-করেই সবকিছু যথাযথ ও নিখুঁতভাবে সেরে ফেলে। অল্প সময়ের মধ্যে সাজিয়ে গুছিয়ে বাড়িটাকে এমন ফিটফাট করে তুলল যে নতুন জামাই বা বৌকে প্রায় কিছুই করতে হল না।

ডিনারে খুবই সাদাসিধে খাবার এবং পদ পরিবেশন করা হল। শ্রীমতী চিনের চুল আজো ভেজা ছিল, সারাদিন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল বলে তাতে বিস্ময়ের কিছুই ছিল না। এপ্রিলের সন্ধ্যার

শ্বাসরোধকারী গরম ও আর্দ্রতা সত্ত্বেও আজো তিনি গলায় একটা কাপড় জড়িয়ে ছিলেন।

'আমার কাছে শপথ করো যে, আমাকে ছাড়া দ্বিতীয় কোনো নারীকে ভালোবাসবে না তুমি।' য়নিয়া বলল, এবং বিয়ের রাত্রে স্বামীকে এরকম একটা প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেওয়া তো খুবই সহজ ব্যাপার।

'তুমি খুব হিংসুটে, তাই না?'

'হ্যা, আমি নিরুপায়। আমার ভালোবাসা দিয়ে আমি একটা বাসা বাঁধতে চাই। কিন্তু তুমি যদি কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করো—'

'আমি স্বপ্নের ভেতর যদি কোনো মেয়েকে ভালোবাসি তাতেও তুমি ঈর্ষাবোধ করবে?'

'হ্যা, করবই তো।'

নববধূ এবং তরুণী পরিচারিকা য়ু-র সংসারে সুখের উল্লাস বইয়ে দিল। য়ু-র মনে হয়, সে বুঝি স্বপ্নের মধ্যে বাস করছে। ওয়াংপো যে দাবি করেছিল যে য়নিয়া খুব রুচিবতী, সেই দাবির চেয়েও তাকে যোগ্যতর বলে মনে হয় য়ু-র। লেখাপড়া পানভোজন খেলাধুলো সবকিছুতেই তার ছিমছাম রুচি আর শিক্ষিত স্বভাবের নিবিড় ছোঁয়া। সন্ধ্যাবেলায় য়নিয়া বাঁশি বাজায়, কি অপূর্ব বাজনা! এবং যখন গান গায়, তা-ও কি মধুর! যেমন চতুর তার স্বভাব, তেমনি অলঙ্কৃত তার বাক্যাবলি। কি অসামান্য ক্রততার সঙ্গে সে বলে দিতে পারে যে: এক ফুটের দাম তিয়াত্তর সেন্ট হলে সাড়ে-এগার ফুট কাপড়ের দাম পড়ে আট শিলিং সাড়ে-উনচল্লিশ সেন্ট। সত্যিই অদ্ভুত! য়নিয়া এবং চিন্-এর নয়া-ড্রাগন-ফাঁসের মতো জটিল তার-ধাঁধাও খেলতে ভালোবাসে, এবং খেলার সময় দুজনে ফিসফিস করে কি সব কথা যে বলাবলি করে, য়ু তার কিছুই বুঝতে পারে না,—অথচ কি চমৎকার লাগে তাদের এই ফিসফাস।

'আচ্ছা, ভূতের মতো ফিসফিস করে দুজনে এতো কি বলাবলি করো বলো তো?' য়ু জিজ্ঞাসা করেই ফেলে।

'উঁহু-হু! একজন ভদ্রলোকের পক্ষে এরকম অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ করা মোটেই শোভন নয়।' য়নিয়া মৃদু ভর্ৎসনা করে।

'কিসের এতো কথা তোমাদের?'

'বরং ভালো, অন্তত এইরকম করে বললে, কেমন?'

এইভাবে অন্তত দশ বার য়নিয়া স্বামীর ত্রুটি সংশোধন করে দেয়। 'কি-রকম ভূত রে বাবা', 'কেমন ভূত রে বাবা'—এরকম কথা বলতে য়ু-কে ভীষণ নিষেধ করে য়নিয়া, এবং এরকম কিছু বললে ভীষণ বিরক্ত বোধ করে।

প্রথম দিকে গৃহিণী আর পরিচারিকার ঘনিষ্ঠতায় য়ু খুব রাগ করত, এবং দুজনের অবিরাম ফিসফিসানি শুনে ভয়ানক সন্দিগ্ধ হয়ে উঠত। কিন্তু শেষমেশ দেখা যেত দুজনের চক্রান্তে য়ু-রই উপকার হয়। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার—যা প্রায় ভৌতিক বলেই ভ্রম হয়, তা হল এই যে, য়নিয়া য়ু-র মনের কথাও বুঝে ফেলতে পারে, না-বলতে সে যা চায় মুহূর্তে তা যোগান দিতে পারে—যেন য়ু-র চিন্তাগুলো য়নিয়ার মুখস্থ, পত্রপাঠ বুঝে নিতে পারে।'

একদিন য়ু যখন গল্পচ্ছলে তার শৈশবের স্মৃতিকথা বর্ণনা করছিল যে প্রত্যহ সকালে কিভাবে ঝুড়ি মাথায় নিয়ে সে বাজারে যেত,—তখন সে-কথা শুনে য়নিয়া তো হেসেই অস্থির।

আরো একদিন, বিয়ের একমাস পর, য়ু শহর থেকে ফিরে এসে দেখে য়নিয়া কাঁদছে। য়ু সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে প্রাণপাত করল, এবং তার কোনো কথায় দুঃখ পেয়েছে কিনা হাজার বার জিজ্ঞাসা করল।

উত্তরে য়নিয়া বলল, 'এ ব্যাপারে তোমার নাক না-গলালেও চলবে।'

'কেউ কি তোমাকে কটু কিছু বলেছে—কষ্ট দিয়েছে?'

কিন্তু য়নিয়ার পেট থেকে কথা বের করা অতো সহজ নয়, য়ু চিন্‌কে জিজ্ঞাসা করল, এবং বুঝতে পারল যে চিন্ হয়ত সবই জানে কিন্তু কিছু বলতেই নারাজ।

দুদিন পর, পথপরিক্রমা সেরে নৈশ আহারের কিছু আগে ফিরে এসে য়ু শুনতে পায় তার স্ত্রী উচ্চস্বরে আর্তনাদ করছে, 'যাও বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বলছি।' য়ু সবেগে ঘরে ঢুকে দেখে রাগে হাঁপাচ্ছে য়নিয়া, মাথার চুলগুলো কপালের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে, এবং মুখের ওপর আঁচড়ের দাগও দেখা যাচ্ছে যেন।

'কে এসেছিল য়নিয়া?' য়ু জিজ্ঞাসা করল।

'একজন—একজন আমাকে ভীষণভাবে জ্বালাচ্ছে,' য়নিয়া অনিচ্ছার সঙ্গেই বলল।

য়ু কাউকে—এমন কি একটা ছায়াও দেখতে পেল না। কোর্ট থেকে রাস্তা পর্যন্ত একটা গলি আছে, কিন্তু সেখানেও কাউকে দেখতে পেল না।

'হয়ত ভূত-টুত কিছু দেখে থাকবে?' স্বামী বলল।

'ভূত-টুত?—আমি?' স্ত্রী সশব্দে হেসে উঠল। কিন্তু স্বামী এতে হাসির কি কারণ থাকতে পারে বুঝে উঠতে পারল না।

সেই রাত্রে শোয়ার পরে য়ু স্ত্রীকে জেদ করে বলল, 'কে তোমাকে জ্বালাচ্ছে আমাকে বলতেই হবে।'

'একজন। একজন আমাকে ভীষণ ঈর্ষা করে এই আর কী।'

'কে?'

'একজন কুমারী চুয়াং। তুমি তাকে চিনবে না।'

'তুমি কি বিধবা চুয়াঙের মেয়ের কথা বলছ?।'

'তাকে তুমি চিনলে কি করে?' স্ত্রী সবিস্ময়ে উঠে বসল।

য়ু তখন বিয়ের কয়েক দিন আগে তার কাছে শ্রীমতী চুয়াঙের আগমন এবং তাঁর কন্যার সঙ্গে য়ু-র বিবাহের প্রস্তাবের কাহিনী য়নিয়ার কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করল।

লোকে বলে ঈর্ষাপরায়ণ নারী ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রীর চেয়েও ভয়ঙ্কর। শুনে য়নিয়া অশ্রদ্ধাপূর্ণ একরাশ এমন গালমন্দ করল যা তার মুখ থেকে শুনবে বলে য়ু কখনো ভাবতেও পারেনি।

'ভেবো না', য়ু আত্মবিশ্বাসের স্বরে বলল, 'আমরা বিবাহিত এবং তোমাকে জ্বালাতন করতে আসার কোনো অধিকারই তার নেই। এরপর যখন আসবে, আমাকে ডেকো,—দেখো, বাছাধনকে কীভাবে শায়েস্তা করি—'

'তুমি আমাকে ওর চেয়েও ভালোবাসো—বাসো না?' য়নিয়া বলল।

'বোকার মতো কথা বলো না য়নিয়া। আমি কুমারী চুয়াঙকে এখনো পর্যন্ত চোখেও দেখি নি। একবার মাত্র তার মাকে দেখেছিলাম।'

বস্তুত এই ঘটনায় য়ু একটু মুষড়েই পড়ল। তার এরকম ধারণা হল যে, তার স্ত্রী তার কাছে কিছু একটা গোপন করে যাচ্ছে এবং তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না।

এরপর থেকে কুমারী চুয়াঙ আর আসে না, ফলে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে ঘরসংসার করতে থাকে। য়ু-র মনে হয় হ্যাঙচাউ একটি চমৎকার শহর। সেও এক মনোরম জগতের অতিথি।

ড্রাগন-নৌকা-উৎসবের সময় তখন।

রীতি অনুসারে য়ু-র স্কুলের ছুটি। য়ু স্থির করল এই ছুটিতে ছয় শহরে নয় আশেপাশের পর্বতে মন্দির দর্শনে যাত্রা করবে। বিয়ের পর এ পর্যন্ত য়নিয়া বাড়ি ছেড়ে একদিনের জন্যেও বাইরে বেরোয় নি, এবং কোথাও যাওয়ার প্রস্তাব করলে তৎক্ষণাৎ তা প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে এই বলে, 'তুমি একাই যাও। আমার ইচ্ছে করছে না। কিছু মনে করো না। লক্ষ্মীটি।'

এবার য়নিয়া শুভ্র-সারস-হ্রদে তার ধাই-মার কাছে একদিনের জন্যে রেখে আসতে য়ু-কে অনুরোধ করল। য়ু য়নিয়াকে ধাই-মার কাছে পৌঁছে দিল, এবং ওয়াঙসাঙলিঙে যাবার পথে সিঙসে-মন্দির দর্শন করবে বলে একদিনের জন্যে যাত্রায় বিরতি দিল। মন্দিরদর্শন শেষ করে বাইরে এলে রাস্তার বিপরীত দিকে অবস্থিত একটা শুঁড়িখানা

থেকে একজন পরিচারক এসে য়ুকে বলল, 'আপনাকে ডেকে নিয়ে যাবার জন্যে এক ভদ্রলোক আমাকে পাঠালেন। আমার সঙ্গে আসুন। মনে হয় ভদ্রলোক আপনার পরিচিত।'

য়ু তার সঙ্গে দোকানে গিয়ে দেখল লো চিন্নান নামে একজন যুবক তার জন্যে অপেক্ষা করছে, আগের বছর পরীক্ষার সময় যুবকের সঙ্গে য়ু-র ঘনিষ্ঠতা হয়।

'তোমাকে মন্দিরে যেতে দেখে ভাবলাম তুমি ফিরে এলে এখানে ডাকিয়ে একটু গল্পগুজব করব। আজ কি করছ?'

উত্তরে য়ু জানাল যে তার ছুটি চলছে এবং সে কোথায় যাবে বা কি করবে তার কোনো স্থিরতা নেই। য়ু বন্ধুকে আরো জানাল যে অল্পদিন হল সে বিয়ে করেছে।

গোপনে বিয়ে করার জন্যে খেলাচ্ছলে বন্ধুকে একটু শাস্তি দেওয়ার মতলব করে মুক্তিপণ হিসেবে পুরো একটা দিনের জন্যে য়ুকে আটকে রাখার সিদ্ধান্ত নিল লো।

'বলছি যে, ওয়াংসাংলিংয়ে আমাদের পারিবারিক গোরস্থান দেখতে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে ওখানে যেতে তোমার কোন আপত্তি আছে? এসময়ে ওখানে প্রচুর ক্যামেলিয়া ফুল ফুটে থাকে, এবং আমি জানি কাছেই একটা মদের দোকান আছে, এবং সেখানে এমন চমৎকার সুস্বাদু মদ পাওয়া যায় যা আমি আগে কখনো চোখেও দেখিনি। তা, যাবে আমার সঙ্গে?'

তবু সারাদিনের জন্যে একজন সঙ্গী পাওয়া যাবে এই ভেবে য়ু সঙ্গে সঙ্গেই সম্মত হয়ে গেল। মদের দোকান থেকে বেরিয়ে তারা সু-তাংপো বাঁধের সন্নিহিত একটা হ্রদ পেরিয়ে এসে দেখল যে ছুটি কাটানোর জন্যে সেখানে তখন স্ত্রী পুরুষ এবং ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের রীতিমতো একটা ভিড় জমে গেছে। উইলো গাছের ছায়া-সরণি ধরে তারা ধীরমন্থর পদবিক্ষেপে উদ্দেশ্যহীনভাবে অবিরাম হেঁটে কিংবা ছুটে বেড়াচ্ছে। নানশিন সড়ক থেকে দুই বন্ধু একটা নৌকা

ভাড়া করল এবং নদীর তীর ধরে-ধরে মাওচিয়াপু পৌঁছল। খাড়া পাথুরে তুয়োসিয়েঙলিঙ পর্বতের ওপারে বন্ধুর পরিবারের গোরস্থান। সেখানে উঠতে তাদের ঘণ্টা খানেক সময় লাগল, চূড়া অতিক্রম করে উল্টো দিকে আধ-মাইলটাক হেঁটে তারা গন্তব্যস্থানে পৌঁছল। আবহাওয়া বেশ নরম ছিল, এবং পর্বতের ঢালু জায়গা জুড়ে পাটল ও রক্ত বর্ণের অসংখ্য ফুলের প্রাচুর্য তাদের চোখ ঝলসে দিল। জায়গাটা এতো মনোরম ছিল যে কখন যে দিন শেষ হয়ে গেল তা তারা বুঝতেই পারল না। একটা কাঠের সেতু পার হল তারা, বিপরীত দিকে ঠিক সেতুর মাথা বরাবর একটা প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল, এতো বড়ো বটগাছ এ-অঞ্চলে কদাচিং দেখা যায়, দশ-পনের ফুট পর্যন্ত লম্বা অসংখ্য ডাল সমান্তরালভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এবং দাড়ির মতো লম্বা লম্বা ঝুরিগুলো ডাল থেকে ঝুলে পড়েছে। গাছটির পঞ্চাশ ফুট দূরে একটা কুঁড়েঘরের সামনে লম্বা বাঁশের খুঁটির ওপারে একখণ্ড চৌকো পতাকা উড়ছে,—মদের দোকানের পরিচিত চিহ্ন।

'ওই যে—ওখানে', লো বলল, 'আমি ওখানকার বিধবা ভদ্রমহিলাকে চিনি। এর আগে একবার এখানে এসে ভদ্রমহিলার মেয়ের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে গেছলাম, খুব চমৎকার কেটেছিল দিনটা। আশ্চর্য মিষ্টি মেয়ে।' লো সোচ্ছ্বাসে বলল।

য়ু অনুভব করল তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন মস্তিষ্কে যেন প্রবলভাবে আঘাত করে চলেছে।

চুয়াঙের বিধবা ওদের অভ্যর্থনা করার জন্যে দোকানের সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন,—যেন ওদের আসতে দেখেই দাঁড়িয়ে আছেন।

'কে? অধ্যাপক য়ু না?' বিধবা বললেন, 'কি সৌভাগ্য!—আপনি এদিকে! আসুন—আসুন!'

ভিতরে ডেকে এনে চেয়ারগুলো সরিয়ে-নড়িয়ে গদিগুলো ঝেড়ে-

ঝুড়ে আতিথ্যের ছলে উৎসাহিত স্বরে মাছল। বললেন, [illegible]
বসুন। আমি জানতাম না যে আপনারা পরস্পরের পরিচিত।'

'লি-হোয়া!' চুয়াঙ চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'দুজন অতিথি এসেছেন—এখানে এসো।'

চোয়াঙের মেয়ের নাম লি-হোয়া—অর্থাৎ 'নাশপাতি ফুল'।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কালো ডোরাকাটা লাল রঙের পোশাকে লম্বা ছিপছিপে গড়নের বছর আঠার-উনিশের একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। চোখের ভুরুগুলো টানাটানা, দু-ঠোঁটে মিঠে হাসির মিহি রেখা। শহুরে মেয়েদের লজ্জাশীলতা নেই তার ভাবভঙ্গি বা ব্যবহারে। এসেই নতজানু হয়ে অতিথিদের নমস্কার করল।

'আমাদের দোকানের সবচেয়ে ভালো মদ গরম করে অতিথিদের পরিবেশন করো,' মা আদেশ করলেন।

লি একটা মাটির পাত্রে মদ নেওয়ার জন্যে দোকানের একটি কোণের দিকে এগিয়ে যেতেই চুয়াঙ য়ু-কে বললেন, 'আমার মেয়ের সম্পর্কে আপনাকে কি বলেছিলাম—মনে আছে? আমার মেয়েকে খুব সুশ্রী এবং খুব ভালো মেয়ে বলে আপনার মনে হচ্ছে না? ওকে ছাড়া যে আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকতাম আমি জানি না। সত্যিই, আমাকে ও সুখী করেছে। ও আপনারও হতে পারত। কপাল!'

মেয়েকে ফিরে আসতে দেখে চুয়াঙ চুপ করে গেলেন।

লি-র হাতে একটা পাত্র, এবং গাঢ় রক্তিমা দুটি গালে। উনুনের ওপর পাত্রটা রেখে য়ু-র দিকে কয়েকবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবাণ হেনে লি মিষ্টি করে হাসল। তার হাসিতে নির্লজ্জতা ছিল না। ওই বয়েসের মেয়েরা একজন সুদর্শন যুবককে দেখে যে রকম স্ফূর্তি এবং সচেতনতার সঙ্গে হেসে থাকে, ওর হাসিও তেমনি। লি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শরীরটা ঈষৎ হেলিয়ে দুলিয়ে উনুনে হাওয়া দিচ্ছিল এবং বারবার সামনে ঝুঁকে-পড়া কুঞ্চিত কেশদাম হাত দিয়ে ঝেড়ে নিচ্ছিল। ওর পিঠের দিকে তাকিয়ে য়ু বসে ছিল নিঃশব্দে। লির গতিবিধির প্রত্যেকটি মুদ্রা

অত্যন্ত অসংলগ্ন বলে মনে হচ্ছিল য়ু-র। উনুনের কাঠকয়লা লাল হয়ে জ্বলে উঠলে উনুনের কাছ থেকে সরে এসে লি কয়েকটা সীসের পেয়ালা ধুতে লাগল, এবং ধোয়া শেষ হয়ে গেলে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখতে-রাখতে য়ু-র দিকে আবার বারকয়েক নয়নবাণ হেনে বসল।

'চারটে নামিয়ে রাখো,' চুয়াঙ বললেন।

আরো দুটো কাপ নামিয়ে মোছামুছি করে লি টেবিলের পাশে অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর মদটা তৈরি হয়ে গেছে কিনা দেখার জন্যে উনুনের কাছে এগিয়ে গেল এবং মদটা সীসের পাত্রগুলিতে ঢেলে ফেলল।

'মা-মণি', লি বলল, 'তৈরি হয়ে গেছে।' বলে অতিথিদের পেয়ালায় ঢেলে দিল।

'আপনারা বসুন। আমি এক মিনিটের মধ্যেই আসছি।'

ফিরে এসে লি তার সাদা ধবধবে হাত দুখানি দিয়ে চুলগুলো কপালের দুপাশে সরিয়ে বিন্যস্ত করে, বহির্বাসের ছাইগুলো ঝেড়েঝুড়ে একটা খালি চেয়ারে বসে পড়ল।

চুয়াঙ অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন, এবং পান করতে করতে চারজনই গালগল্পে জমে গেল। চুয়াঙ য়ু-র বিবাহিত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে য়ু অকপটে জানাল যে সে খুব সুখেই আছে। অবিশ্যি সে-কথা বলতে গিয়ে সেদিনকার ঘটনা স্মরণ করে য়ু একটুক্ষণ আত্মবিস্মৃত হল, কিন্তু মুহূর্তেই নিজেকে সংযত করে নিল। তার বিশ্বাসই হল না যে এই সুন্দরী যুবতীটি তার স্ত্রীকে কখনো আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু নিশ্চিতভাবে বুঝে নিল যে দুই যুবতীর মধ্যে কিছু-একটা ঘটেছে।

'সে যা হোক', চুয়াঙ মন্তব্য করলেন, 'লি-কে তো দেখলেন,—এখন আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে কী রত্ন আপনি হারিয়েছেন।'

'হয়ত তাই। মেয়েকে নিয়ে গর্ব করার অধিকার আপনার

লজ্জায় ঈষৎ লাল হল।

এরপর দুই বন্ধু বিদায় চাইলে চুয়াঙ তাতে কর্ণপাত করলেন না। 'আহা, এতো তাড়া কিসের? রাত্রির আহারটা না-হয় সেরেই গেলেন। কাতলা মাছের যে কী স্বাদ লি-র রান্না না খেলে তা আপনারা জানতেই পারবেন না।'

য়ু স্ত্রীর কথা ভেবে জানাল যে এমনিতেই যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে।

'কিন্তু আজ রাত্রে আপনারা তো কোনো উপায়েই শহরে পৌঁছতে পারবেন না। আপনারা পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই চিয়েনটাঙ গেট বন্ধ হয়ে যাবে। এখান থেকে চারপাঁচ মাইলের পথ—'

চুয়াঙের কথা ঠিক, য়ু-র সম্মত না হয়েও কোনো উপায় নেই, অথচ স্ত্রীর কথা ভেবে বিবেকের দংশনও অনুভব করল একটুখানি। অবিশ্যি য়ু জানে যে তার স্ত্রী তার ধাই-মার বাড়িতেই তার জন্যে অপেক্ষা করবে, এবং নিরাপদেই থাকবে।

নদী থেকে সদ্য-তোলা জ্যান্ত মাছের লোভ এড়ানোও কঠিন, এবং গরম মদের আস্বাদে ইতিপূর্বেই সে বেশ পরিতৃপ্তি বোধ করেছিল। য়ু এখন খুবই খুশী।

খাওয়ার পাট চুকে গেলে য়ু লি-কে জিজ্ঞাসা করল, 'মাছটাকে তুমি কি করেছিলে বলো তো?'

'কিছুই না', লি খুব সাদাসিধে উত্তর দিল।

'মাছটাকে যাদু করেছিলে নাকি? শপথ করে বলতে পারি যে কাতলা মাছের ঝোল যে এতো সুস্বাদু হয় এর আগে কখনো তা মনে হয় নি।'

'তোমাকে আমি বলেছিলামটা কি?' মা বললেন, 'আমার মেয়ে সম্পর্কে যা বলেছিলাম তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি কি না? কিন্তু পেশাদার, ঘটকের কথা ছাড়া অন্যের কথা তো তোমরা বিশ্বাস করবে না।'

চুয়াঙের কথার নির্গলিতার্থ য়ু-র মনে ধরল না, সে স্পষ্ট বিরক্তিই প্রকাশ করল বরং, বলল, 'কিন্তু আমার স্ত্রীর অপরাধটা কোথায়?'

য়ু-র কথা শুনে, মনে হল, লি হোয়া বিক্ষোভে বুঝি ফেটেই পড়বে, কিন্তু মা তাকে ইঙ্গিতে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমার স্ত্রীকে আমরা ভালো করেই জানি। ওর মতো ঈর্ষাপরায়ণ মেয়ে আর দুটি নেই। তা নইলে ওর মতো একজন প্রতিভাময়ী যন্ত্রশিল্পীকে মনিবেরা তাড়িয়েই বা দেবে কেন?'

'তা-ও করেছিল কি?—আপনি বলছেন ও খুব ঈর্ষাপরায়ণ মেয়ে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছি। ওর চেয়ে সুন্দর কাউকে বা ওর চেয়ে ভালো বাঁশী বাজাতে পারে এমন কাউকে ও সহ্য করতে পারত না। একটা মেয়েকে তো বারান্দা থেকে ঠেলেই ফেলে দিয়েছিল, এবং তাতেই মারা গেল মেয়েটা। একমাত্র সর্বশক্তিমান চিন-পরিবারের কৃপাতেই সে-বার নরহত্যার দায় থেকে বেঁচে যায়। তবে তুমি যেহেতু ওকে বিয়ে করেছ,—আমি বেশি কিছু বলতে চাই না। কিন্তু আমার মুখ থেকে যে এসব কথা শুনেছ তোমার স্ত্রীকে তা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করো না। ভান করো যেন তুমি কিছুই জানো না।'

মস্তিষ্কে মদের ক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল, এবং য়ু-র বন্ধু বোকার মতো লি-র সঙ্গে ছেনালি শুরু করে দিয়েছিল। ভদ্রতার খাতিরে লি তা সয়ে যাচ্ছিল,—এসব ক্ষেত্রে মাতালদের যেভাবে সয়ে যেতে হয়, এবং সচেতনভাবে য়ু-র দিকে চেয়ে মুচকি হাসছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই লো এমন মাতাল হয়ে পড়ল যে য়ু এবং লি-কে ধরে তাকে কোচের ওপর শুইয়ে দিতে হল, এবং লো তৎক্ষণাৎ নাসিকাগর্জন শুরু করে দিল।

যে রহস্যময়ী নারীকে বিয়ে করেছে য়ু এখন তার সম্পর্কে ভয়ানক সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। য়ু উপলব্ধি করল যে, লি-র হয়ত য়নিয়ার মতো গ্ল্যামার নেই, কিন্তু এমন অকপট মিষ্টি হাসিখুশি মেয়ে লি যে একজন

পুরুষকে পুরোপুরি সুখী করতে পারে। পরিপূর্ণ সরলতা সত্ত্বেও সে সত্যিকার সুন্দরী। মায়ের কথাগুলো —'তুমি জানো না কি রত্ন যে তুমি হারিয়েছ'—য়ু-র কানে বারবার বেজে উঠছিল। এখানে এই রাত্রিকালে পথিপার্শ্বের শুঁড়িখানায় লি-র সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার, তার সন্তবিবাহ, এবং গত একমাসের সমস্ত ঘটনা তার কাছে একেবারে অবাস্তব বলে মনে হল।

অন্ধকার নেমেছে, এবং জানালার ভেতর দিয়ে জোনাকিরা ওড়াওড়ি করছিল। চুয়াঙ এবং তাঁর মেয়ে দোকান বন্ধ করলেন, য়ু বাইরে পায়চারি করল খানিকটা। নীড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে পাখিরা, এবং বিশ্বচরাচর নিস্তব্ধ। মাঝে-মধ্যে পেঁচার কর্কশ স্বর এবং নিশাচর প্রাণীদের অদ্ভুত চিৎকারে রাত্রির নিস্তব্ধতা খান-খান হয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছিল। পশ্চিম আকাশে বিবর্ণ অর্ধচন্দ্র শৃঙ্গ ছুটি ঝুলিয়ে দিয়ে পর্বতশীর্ষের ওপর দণ্ডায়মান। বাতাসে আন্দোলিত গাছগুলিকে লম্বা লম্বা কালো কালো প্রেতের মতো দেখাচ্ছিল, এবং সমস্ত উপত্যকাটি এক অতিপ্রাকৃত সৌন্দর্যের মায়ায় নিবিড়ভাবে ভরে যাচ্ছিল।

দরোজার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল লি। ইতিমধ্যে কখন শাদা পোশাক পরে নিয়েছিল সে। তার কুঞ্চিত সুন্দর চুলগুলি পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছিল।

য়ু-র কাছে এগিয়ে এল লি, হাতে বাঁশী।

য়ু-কে একটি সরল ও মিষ্টি হাসি উপহার দিয়ে সহজ কিন্তু ব্যঞ্জনাময় ভঙ্গিতে বলল, 'দেখো, দেখো,—চাঁদটা দেখো।'

'হ্যাঁ', সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে প্রশমিত করতে চেষ্টা করে য়ু বলল।

'চলো, আমরা নদীর ধারে যাই। ওখানে ভারি চমৎকার একটা জায়গা আছে। সন্ধ্যেবেলায় ওখানে বসে-বসে বাঁশী বাজাতে আমার খুব ভালো লাগে।'

হাঁটতে-হাঁটতে দুজনে নদীর ধারে এল। লি তাদের বসার জন্যে একটা বড়ো পাথর বেছে নিল, এবং একটি নরম বিলাপময় মর্মভেদী সুরে বাঁশী বাজাতে লাগল।

চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় তার ডিমের মতো মুখখানা, তার চুলগুলো এবং পেলব দেহলতা ভারি অলৌকিক বলে মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল য়নিয়ার চেয়েও ভালো বাজায় লি, ভারি মিষ্টি হাত ওর। বিপুল চন্দ্রালোকে নির্জন উপত্যকায় একটি রূপসী নারীর বাঁশীর সুর—যে সুরে নদীর কলধ্বনি মিশে বৃক্ষশীর্ষে আন্দোলিত হয়ে দূরবর্তী পর্বতে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে—কোনো পুরুষের পক্ষে সেই সুর শোনার অভিজ্ঞতা স্মৃতি মণিঘরে অবিস্মরণীয় আর অম্লান হয়ে বিরাজ করে চিরকাল। সেই রাত্রে য়ু-রও হয়েছিল সেই দুর্লভ অভিজ্ঞতা। এতো রমণীয় সেই অভিজ্ঞতা যে কী এক অননুভূত বেদনায় বিক্ষত হয়ে উঠেছিল তার হৃদয়, তার চেতনা। কি নিদারুণ এক মনস্তাপ অধিকার করে নিয়েছিল য়ু-র হৃদয়।

'তোমাকে এতো বিষণ্ণ লাগছে কেন?' লি জিজ্ঞাসা করল।

'তোমার বাঁশী আমাকে এমন বিষণ্ণ করে তুলেছে প্রিয়তমা।' সেই তারাময়ী রজনীতে লি-র অলৌকিক সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে বলেছিল য়ু।

'তাহলে আর বাজাব না।' লি হেসে বলেছিল।

'না, তুমি বাজাও।'

'যদি আমার বাজনা তোমাকে বিষণ্ণ করে দেয় তাহলে আর বাজাব না।'

'এই জায়গাটা তোমার খুবই ভালো লাগে, তাই না?'

'হ্যাঁ, খুবই ভালো লাগে। এর চেয়ে সুন্দর জায়গা—এই গাছপালা, নদী তারা চাঁদ—এমন জায়গা পৃথিবীতে আর কোথাও আছে?'

'এখানে নিঃসঙ্গ লাগে না তোমার?'

'নিঃসঙ্গ!' লি উত্তর দিল,—যেন এই শব্দটার অর্থ ই শেখেনি সে, বলল, 'আমার যা আছে,—আর আমরা পরস্পরকে খুবই ভালোবাসি।'

'কোনো পুরুষকে তুমি চাও না—আমি বলতে চাই যে—'

লি হাসল। 'পুরুষকে দিয়ে আমার কি হবে? তাছাড়া ভালো মানুষ পাওয়াও তো খুব শক্ত। মা আমাকে তোমার কথা বলেছিলেন। উনি তোমাকে ভীষণ ভালোবাসেন। আমার সঙ্গে যদি তোমার মতো কারো বিয়ে হত,—আমি খুবই সুখী হতাম,—আমি ছেলেপুলের মা হতে পারতাম,—তাদের সঙ্গে খেলাধুলো করতে পারতাম,—কি চমৎকার হত আমার জীবন—'

লি একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করল।

'লি-হোয়া, প্রিয়তমা লি, আমি তোমাকে ভালোবাসি,' য়ু বলল, আবেগে কাঁপছিল তার কণ্ঠস্বর, 'যে মুহূর্তে তোমাকে দেখেছি সেই মুহূর্ত থেকে তুমি যেন আমাকে যাদু করেছ।'

'অবিবেচকের মতো কথা বলো না য়ু। তুমি একটা শয়তানীকে বিয়ে করেছ,—তুমি বিবাহিত, কিন্তু তাকেই তোমার ভাগ্য বলে মেনে নেওয়া উচিত। ওঠো, আমরা ঘরে যাই। আমি বাজি ধরে বলতে পারি সে যদি এখানে আমার সঙ্গে তোমাকে নিশিযাপন করতে দেখে তাহলে আমাকে—হ্যাঁ, আমাকে খুন করবে।'

লি কান্নার আবেগে থর্‌থর্‌ করে কেঁপে উঠল।

বস্তুত ঐ স্থান, ঐ বংশীধ্বনি এবং লাবণ্যময়ী ঐ নারীর কণ্ঠস্বরে যেন যাদু ছিল,—যাতে য়ু পুরোপুরি সম্মোহিত হয়ে গিয়েছিল। য়ু বুঝতে পারল যে, যে-দুই নারীকে সে ভালোবাসে তারা পরস্পর পরস্পরের শত্রু।

নদীর তীররেখা ধরে তারা হাঁটছিল। মেঘের ভেতর থেকে উঁকি দিয়েছে আধখানা চাঁদ। রাত্রির কালো আবরণের ওপর লি-র ডিমের মতো সাদা মুখখানি যেন মুদ্রিত শশাঙ্ক। একটা সাদা ফুল দুলছিল ঠিক তার মাথার ওপরে। য়ু হঠাৎ দুটি বাহু বাড়িয়ে দিয়ে কাছে টেনে নিয়ে গভীর আবেগে চুম্বন করল লি-কে। বালিকা আত্ম-সমর্পণ করল, কিন্তু পরক্ষণেই তীব্র কান্নায় ভেঙে পড়ল।

'সে আমাকে খুন করে ফেলবে!' আকস্মিক ভীতির বিহ্বল আবেগে লি কেঁদে উঠল।

'কী বকছ যা-তা। কে? কে তোমাকে খুন করবে?'

'য়ুনিয়া। য়ুনিয়া আমাকে খুন করবে।' লি-র কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল।

'কিন্তু য়ুনিয়া জানবে কি করে? আমি নিশ্চয়ই এতো বোকা নই যে এসব কথা তাকে বলব।'

'তবু, তবু সে জানবেই।'

'কিভাবে? কিভাবে জানবে?'

'বলতে পারি, যদি গোপনে রাখতে পারো।'

য়ু-র গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে লি বলল, য়ু মুখের ওপর উষ্ণ নিশ্বাস অনুভব করল।

'তোমার বউ আসলে একটা পেত্নী। মনিবের বাড়ি থাকার সময় অন্তঃসত্ত্বা হওয়ায় মনিব তাড়িয়ে দিলে ও গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। চরাচরে সর্বত্র তার অবাধ গতি। নীতিবিরুদ্ধ বলেই আমার মা তোমাকে সত্যি কথা বলতে ভরসা পায়নি। তবু মা তোমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তোমাকে ও-যে যাদু করেছে।'

শুনতে শুনতে য়ু-র শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে একটা তীব্র শীতল রক্তস্রোত বয়ে গেল।

'তুমি বলতে চাও আমি একটা পেত্নী—মানে একটা প্রেতযোনিকে বিয়ে করেছি?'

'হ্যাঁ, তাই। আমি যখন শহরে বাস করতাম ওর প্রেতাত্মা তখন আমার ওপর কি উপদ্রবই না করেছে!'

'সে প্রত্যহ তোমার কাছে যেত?'

'হ্যাঁ, আমাকে ঈর্ষা করত বলে ওর সঙ্গে একবার আমার ঝগড়া হয়। মা আর আমি এতো দূরে কেন বাস করছি তা অনুমান করতে পারছ নিশ্চয়?—শুধু ওর কাছ থেকে দূরে থাকার জন্যে।' একটুক্ষণ থেমে লি আবার বলল, 'এখন আমরা আবার সুখশান্তি সবকিছু

ফিরে পেয়েছি। ও জানে না। এই রাস্তা দিয়ে রোজ অনেকে যাওয়া-আসা করে, এবং আমার মা বেশ কিছু টাকাও জমিয়েছে, আমরা শহরে আর ফিরে যাচ্ছি না। আমার আশা, মা একদিন তোমার মতো সুন্দর একটি যুবকের সঙ্গে বিয়ে দেবেন।'

লি গল্পটা এমনভাবে বলল যেন ব্যাপারটা এমন কিছু নয়,—একটা সাধারণ প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা মাত্র।

'তোমার মতো সুন্দরী মেয়ের বিয়ে নিশ্চয় হবে। কিন্তু আমি কি করব?'

'তা আমি কি করে জানব য়ু? কিন্তু তুমি ঘুণাক্ষরেও য়নিয়াকে জানতে দেবে না যে তুমি এখানে বা অন্য কোথাও আমার সঙ্গে মেলামেশা করেছ। তোমাকে যা বললাম আমার মাকেও বলো না। য়নিয়াকে জানতে দিয়ো না আমরা কোথায় বাস করি।'

এইসব কথা বলার সময় লি-র গলাটা অবিরাম কেঁপে কেঁপে উঠছিল। কাজেই, সহজাত মানবিক আবেগের বশবর্তী হয়ে য়ু এই মিষ্টি মেয়েটাকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর হল। সে শপথ করল, এবং লি কে আবার চুম্বন করতে চেষ্টা করল। কিন্তু মেয়েটি ঘাড় ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'চলো, আমরা ভেতরে যাই। মা নিশ্চয় আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

য়ু বন্ধুর খোঁজে যখন ভেতরে গেল বন্ধু তখনও নাক ডাকাচ্ছে। এবং লি একটা বাতি হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

য়ু তখন বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই লি আবার এসে সিঁড়ির ওপরের ধাপ থেকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো য়ু?'

'না, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

বালিকা আবার ওপরে উঠে গেল। ওপর থেকে তার মৃদু পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছিল য়ু। তারপর নিস্তব্ধতা। সারারাত্রি য়ু বিছানার ওপর কেবল এপাশ-ওপাশ করে কাটাল।

পরদিন দুই বন্ধু শহরে ফিরে আসবে।

বিদায় নেওয়ার আগে য়ু-কে চিয়াঙ বললেন, 'আবার আসবে, কেমন?'

লি য়ু-র দিকে দীর্ঘক্ষণ নির্নিমেষ চেয়ে থাকল।

চিয়েনটাঙ গেট থেকে য়ু এবং তার বন্ধু বিদায় নিল। লি-র সঙ্গে সম্পর্কের কথা বন্ধুর কাছে একেবারে চেপে গেল য়ু। এতোই বিহ্বল হয়ে পড়েছিল সে যে নিশ্চতভাবেই সে বুঝতে পারল লি-র কাছে আবার আসতে হবে তাকে।

চিয়েনটাঙ গেট থেকে বন্ধুও বিদায় নিল, এবং সোজা রাস্তা ধরে নিজের শহরের দিকে হাঁটা শুরু করল।

লি য়ু-কে যে বলেছিল যে তার স্ত্রী পেত্নী—য়ু-র কাছে তা আজগুবি ব্যাপার বলে মনে হলেও তার মেজাজটা খুবই বিগড়ে গিয়েছিল, এবং স্বভাবতই বাড়ি ফিরে যেতে সে ভীষণ দ্বিধাবোধ করছিল।

এখন কিছু কিছু ঘটনা তার মনে পড়ল,—যেমন আগের থেকে মনের কথা বুঝে নেওয়ার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে য়নিয়ার। একদিন সে চিঠি লিখছিল, ড্রয়ারে কোনো খাম খুঁজে না পেয়ে সে চিন্-এর্-কে ডাকতে যাবে, দেখল: য়নিয়া একটা খাম হাতে করে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মনে পড়ল: একদিন স্কুলের ছুটির পরে সে বাইরে বেরবার কথা ভাবছে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সে আকাশের পানে চেয়ে আছে, ঠিক তক্ষুনি য়নিয়া এসে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি বাইরে যাচ্ছ, তাই কি? দাঁড়াও।' বলে য়নিয়া ভেতরে গেল। একটা ছাতাও নিয়ে এল যেন কোত্থেকে। ঘটনাগুলো হয়ত কাকতালীয়। কিন্তু য়ু সে-সব যতোই ভাবে, ততোই তার ভয় বেড়ে যায়। তার মনে পড়ল: 'শয়তান' বা 'ভূত' ধরনের কোনো শব্দ উচ্চারণ করলে য়নিয়া ভীষণ রেগে যায়, এবং শুধু য়নিয়ারই নয়,—চিন্-এরেরও গাঢ় অন্ধকার থেকে জিনিসপত্র খুঁজে নিয়ে আসার কি অদ্ভুত ক্ষমতা আছে।

য়ু স্থির করল যে উঙপোর সঙ্গে দেখা করে সে য়নিয়ার অতীত ইতিহাস সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করবে। উঙপোর বাড়ি এসে য়ু দেখল সরকারি আদেশে উঙপোর বাড়ির প্রধান দরোজা সিল করা রয়েছে, এবং সেখানে এই কথাগুলো লেখা রয়েছে—'মানুষের হৃদয় লৌহকঠিন, সম্রাটের আইন অগ্নিসদৃশ।' প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে য়ু জানতে পারল অল্পবয়স্কা তরুণীদের প্রলোভন দেখিয়ে অসৎ উদ্দেশ্যে কুপথে নিয়ে যাওয়ার অপরাধে ছ-মাস আগে উঙপোর ফাঁসি হয়েছে।

এখন য়ু যৎপরোনাস্তি ভীত হয়ে পড়ল। তাহলে লি-হোয়া তাকে যা বলেছে সব সত্যি? আশ্চর্য মিষ্টি মেয়ে লি। লি-র কথা মনে পড়ায় য়ু-র হৃদয় উষ্ণ সমবেদনায় ভরে উঠল। তার মনে পড়ে গেল লি-র শুভ্র মুখমণ্ডল, সরলতা, হর্ষোৎফুল্ল ব্যবহার, আর অপূর্ব রঙ্গপ্রিয়তা। লি-কে যদি সে বিয়ে করত, য়ু ভাবল, তাহলে সত্যিই অনেক ভালো হত।

লি-র সঙ্গে আবার সে দেখা করবে, এবং চিরকালের মতো সব রহস্যের সমাধান করবে সে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্মরণ করতে বাধ্য হল সে, যে: স্ত্রী হিসেবে য়নিয়া কতো চমৎকার, হয়ত সে একটা ভুল করতেই চলেছে, ভেবে একটু ভয়ও পেল।

কিন্তু বাড়ি ফিরতে যতো দেরি হতে থাকে, স্ত্রীর কাছে অনুপস্থিতির লাগসই কারণ ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে দুশ্চিন্তা ততোই বেড়ে যেতে থাকে। মনটা এতোই দ্বিধান্বিত হয়ে ওঠে যে চিয়েনটাঙ গেটে গোটা একটা রাত্রি কাটিয়ে পরদিন বিকেল তিনটে পর্যন্ত টুয়োহসিয়েনলিঙের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। নৌকোয় ওঠার পর লি-হোয়ার কাছে ফিরে-যাওয়া তার কাছে অনেক নিরাপদ এবং প্রীতিকর বলে মনে হতে থাকে, এবং লি-কে দেখা এবং লি-র কণ্ঠস্বর শোনার কামনা তাকে অস্থির করে তোলে। প্রতিকূল ভারি বাতাসের বিরুদ্ধে নৌকো খুবই ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল, উত্তর-পশ্চিম কোণে

কালো মেঘ ঘনিয়ে উঠছিল, এবং মনে হচ্ছিল অচিরে প্রচণ্ড ঝড়ের আবির্ভাব ঘটতে পারে। পশ্চিম পর্বতের দিকে তাকাতেই সে দেখতে পেল চূড়াগুলি মেঘে ঢেকে যাচ্ছে। সঙ্গে ছাতা নেই বলে য়ু খানিকটা ভড়কেও গেল। তথাপি প্রত্যাসন্ন ঝড়কে আহ্বান জানাতে ইচ্ছে করল তার। মনে হল, হয়ত ঝড়ের প্রভাবে তার মানসিক উদ্বেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হতে পারে।

রাস্তাটা তার মনে ছিল ঠিকই, এবং টুয়োহসিয়েনলিঙ থেকে পথ চিনে নিতে তার খুব একটা অসুবিধাও হচ্ছিল না। ওপরে উঠে নদীর তীরবর্তী লো-হোয়াদের ছোট্টো কুঁড়েটি দেখতে পাওয়ার আগ্রহে য়ু-র ধমনীর রক্তস্রোত উত্তাল হয়ে উঠেছিল।

ইতিমধ্যে সারা আকাশ কালোয় ভরে গিয়েছিল, এবং সেজন্যে এখন ক-টা হবে য়ু সঠিকভাবে তা বুঝে উঠতে পারল না, অনুমান করল পাঁচটা-ছটা হবে। অবনত অরণ্যের ভেতর দিয়ে সবেগে ঝড়ো বাতাস বইতে শুরু করেছিল ঢালু জায়গাটার মাঝখানে—ঠিক বড়ো পাথরটার নিচে নতুন-পুরনো অসংখ্য সরকারি ও সাধারণের ব্যক্তিগত কবরভূমি। কিছুটা অধৈর্য হয়ে এবং ঝড়ের পূর্বাহ্ণে শুঁড়িখানায় পৌঁছবার আশায় য়ু খাড়া পাথরের ওপর দিয়ে প্রবল গতিতে নিচে নেমে আসতে থাকল।

সমভূমিতে নেমে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল তারপর। শুঁড়িখানা থেকে একশ গজ দূরে ঝড়ের মধ্যে পড়ে গেল য়ু। গোরস্থানে প্রবেশ-পথের সামনে একটা ছোটো নির্জন বর্গাকার পাকাবাড়ি নজরে পড়ল, এবং ত্বরিতবেগে সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিল। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের প্রবর্তনায় কি-ভেবে দরোজায় খিল এঁটে দিল, লাগিয়ে দিল হুড়কোটাও। এইসব জিনিস আমরা কিভাবে উপলব্ধি করতাম জানি না। কিন্তু স্পষ্টত য়ু-র বোধগম্য হল যে এই উপত্যকায় সে ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো মানুষই নেই। ঝড় বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না, এবং ভেজেনি বলে য়ু-র আনন্দ হল। নিঃশব্দে নিঃসাড় পড়ে থাকার পর য়ু-র মনে

হল কেউ যেন বাইরে থেকে দরোজায় ঠেলা দিচ্ছে। নিশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করে য়ু দাঁড়িয়ে থাকল।

'তালা দেওয়া।'

মেয়েলি কণ্ঠস্বর, মনে হল চিন্-এরের।

'আমরা কি ছিদ্র দিয়েই ঢুকে যাব?'

'সে কিছুতেই পালিয়ে থাকতে পারবে না।' স্ত্রীর কণ্ঠস্বর। 'এ-হেন দুর্যোগেও ক্ষুদে শয়তানীটাকে দেখতে বেরিয়েছে। ঠিক আছে, আমি আগে ঐ শয়তানীটাকেই দেখে নেব। আর ও যদি পালিয়ে যায়,—যখন ফিরে আসবে তখন তার ব্যবস্থা হবে।'

য়ু তাদের চলে-যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল।

য়ু-র সর্বশরীর কাঁপছিল। ঝড়ের প্রথম বেগটা ঈষৎ স্তিমিত হয়েছে, কিন্তু অবিরাম বিদ্যুচ্চমকে মাঝে-মাঝেই ঘরটা আলোকিত হয়ে ওঠায় য়ু-র দুর্দশা আরো বেড়ে যাচ্ছিল। ঘরের পেছন দিকটায় গিয়ে সে দেখতে পেল জায়গাটা একটা সমাধিক্ষেত্র, এখানে-ওখানে অনেকগুলো পুরনো সমাধিস্তম্ভ। কোনো-কোনো ঢিবির মাথাটা ধসে গেছে, মাটির ভেতরে বড়ো বড়ো গর্ত।

অকস্মাৎ শুঁড়িখানার দিক থেকে ভেসে-আসা নারীকণ্ঠের তীব্র আর্তনাদ কানে এল য়ু-র:

'বাঁচাও! বাঁচাও! খুন!'

য়ু-র গায়ের লোম আর মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠল। তিন-চারজন স্ত্রীলোকের মধ্যে মারামারি, হাতাহাতি, চিৎকার, অভিশাপ, শপথের বিচিত্র শব্দ কানে এল তার: সবগুলোই স্ত্রীকণ্ঠ, কিন্তু অমানবিক, ভৌতিক—মনুষ্যকণ্ঠের চেয়ে অনেক বেশি জোরালো ও তীক্ষ্ণ।

য়ু দেখল, সমাধিভূমির তত্ত্বাবধায়কের ঘর থেকে একটা লম্বা পেশল চেহারার ছায়ামূর্তি সন্নিহিত ঝোপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, এবং চিৎকার করে বলল, 'ক্ষুদে চার নম্বর চু!—কান্না শুনতে পাচ্ছ?'

এক আলুলায়িতকেশ অবয়ব ছায়ামূর্তি একটা কবর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল। কুঁজো ঐ মূর্তি ভয়ানক শব্দ করে কাশছিল।

'প্রেতমূর্তিটাকে দেখে মনে হচ্ছে সম্ভবত ও হাঁপানিতে মারা গেছল', য়ু মনে মনে বলল।

'খুন, খুন হয়েছে, চলো আমরা যাই,' লম্বা ছায়ামূর্তিটা অন্ধকারের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে বলল।

এক ঝলক বাতাসের মতো দুই ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল। গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টিপতনের শব্দের মধ্যেও একজনের কর্কশ চিৎকার য়ু-র কানে এল, 'শান্ত হও, সবাই চুপ করো। চারজন স্ত্রীলোক একসঙ্গে চেঁচালে কি করে তোমাদের কথা শুনতে পাব?'

বারংবার খুব স্পষ্টভাবে লি-হোয়ার কান্না আর গোঙানির শব্দ য়ু-র কানে আসছিল। মুহূর্তে সকলে চুপ করে গেল, তারপর য়ু আবার মারধোর এবং শিকলে বেঁধে কাঠের সেতুর ওপর দিয়ে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে-যাওয়ার শব্দও শুনতে পেল।

য়ু ভয়ানক দুর্বল বোধ করতে লাগল। তার হাত দুটো ভিজে চটচটে হয়ে উঠেছিল।

সকলে দরোজার দিকেই আসছিল।

গোরস্থানের চারপাশে পাঁচ ফুটের মতো উঁচু একটা দেওয়াল। ভেতরে কি ঘটছে না-ঘটছে য়ু-র নজর হচ্ছিল না, কিন্তু শিকলের ঝনঝনানি এবং ভারি জিনিস-পড়ার শব্দ তার কানে আসছিল:

'আহা—উহু—'

একজন স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর, তার স্ত্রী য়নিয়ার।

'তোমাকে তো চেনা মনে হচ্ছে না,' পুরুষ কণ্ঠ বলল, 'শান্তিভঙ্গ করতে কেন এখানে এসেছ? আমার সীমানার ভেতর আসার আগে তোমার বোঝা উচিত ছিল।'

'ওয়াক! ওয়াক!' য়নিয়ার প্রেতাত্মা আর্তনাদ করে উঠল।

'আমি আমার স্বামীকে খুঁজতে এসেছিলাম,' য়নিয়া বলল, 'এখানে এসে আমি তার খোঁজ পাই। আশেপাশে কোথাও সে আছে।...... আধিকারিক, আমরা বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী। আমার স্বামী এই ডাইনীর কুহকে পড়েছে। ড্রাগন-নৌকা-উৎসবের দিন আমার স্বামী এখানে আসে এবং বাড়ি ফেরে না। আমি পরিচারিকাকে সঙ্গে নিয়ে তাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম।'

'আমি কিছুই করিনি! আমি কিছুই জানি না!' লি-হোয়া কাঁদতে-কাঁদতে প্রতিবাদ করল।

য়ু-র হৃদয় ভেঙে যাচ্ছিল। যদিও লি প্রেতাত্মা তবু তার প্রতি আগের চেয়ে আরো বেশি ভালোবাসা উপলব্ধি করল য়ু।

'হ্যাঁ, তুমি করেছ' ক্রুদ্ধ য়নিয়া উত্তর দিল, 'হাজারখানা ছুরি দিয়ে তোমাকে কেটে কুচি কুচি করে ফেলা উচিত।'

মনে হল, য়নিয়া যেন লি-হোয়ার চুলের গোছা ধরে টান দিল, আর লি যন্ত্রণায় আবার আর্ত চিৎকার করে উঠল।

'আমরা মা ও মেয়ে এখানে বেশ সুখে-শান্তিতেই বাস করছিলাম,' চুয়াঙের কণ্ঠস্বর, 'আমরা কারো কোনো ক্ষতি করি নি। এই মেয়েটা আমার মেয়েকে হত্যা করেছিল, এবং আপনি না-এলে আরও একবার হত্যা করত।'

'আমি জানি, আমি জানি', আধিকারিক বলল, 'লি-হোয়া খুব ভালো—কর্তব্যশীলা মেয়ে। সে যদি তোমার স্বামীকে বশ করেই থাকে, তাহলে তোমার আমার কাছেই আসা উচিত ছিল, এবং নিজের হাতে আইন নিয়ে ওকে গলা টিপে মারার চেষ্টা করা আদৌ উচিত হয় নি। তোমার নির্দিষ্ট বাসস্থান কোথায়?'

'পাওসু প্যাগোডায়।'

'তুমি বললে তুমি বিবাহিতা। কে তোমার বিয়ের ঘটকালি করেছিল?'

'চিয়েনটাঙ গেটের উংপো।'

'আমার কাছে মিথ্যে কথা বলো না।'

'আমি আপনার কাছে সত্যি কথাই বলছি।' মুনিয়া বলল।

হঠাৎ য়ু-র মনে হল যে, যে-কোনো মুহূর্তে সে ধরা পড়ে যেতে পারে।

নিঃশব্দে খিলটা সরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে য়ু উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। ভাগ্যক্রমে মারধোর কান্নাকাটি ইত্যাদি ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় কেউ তার দিকে মনোযোগ দিতে পারে নি।

সেতুটা পেছনে ফেলে বটগাছটার কাছে পৌঁছে চারদিকে তাকিয়ে য়ু দেখল: না, শুঁড়িখানার চিহ্নও নেই কোথাও। যেখানে শুড়িখানাটা ছিল সেখানে দেখা গেল একজোড়া কবর।

কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে য়ু-র আর সাহস হল না। এবং ভয়ে ভয়ে সে সমাধিফলকে উৎকীর্ণ লিপিটা পড়ে ফেলল।

এবং তার সারাটা শরীর ভেদ করে একটা ঠাণ্ডা নিশ্বাস বেরিয়ে এল। পড়তে পড়তে তার ভয় আরো বেড়ে গেল।

চারদিকে ছায়ামূর্তি, প্রেতভূমির ঠিক মাঝখানে এখন সে দাঁড়িয়ে আছে।

অস্পষ্টভাবে সে স্মরণ করতে পারল যে আগের বার সে এবং তার বন্ধু একটা নদীর গতি অনুসরণ করে উপত্যকা থেকে বেড়িয়ে ফিরে এসেছিল। রাস্তাটা পিছল ও অন্ধকার। বনের মধ্যে কৃষিকাজের উপযোগী এক টুকরো জমির কাছে,—রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে—য়ু সেখানে দুজন স্ত্রীলোককে দেখতে পেল। গলায় জড়ানো লাল কাপড়ের ফেট্টি দেখেই সে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটিকে চিনে ফেলল, এবং উল্লেখযোগ্য এই যে, এই রাত্রে অন্য স্ত্রীলোকটির চুলগুলো ভিজে বলে মনে হল না।

'এভাবে ছুটতে ছুটতে কোথায় পালাচ্ছ?' উড়পো এবং ধাই-মা চেন তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা সবাই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।'

অপরিসীম ভয়ে য়ু আবার ছুটতে লাগল, পেছন থেকে দুই স্ত্রীলোকের প্রবল হাস্যরব তার কানে এল।

মাইলখানেক ছোটার পর অল্প দূরে উপত্যকার সম্মুখ দিকে একটা আলোর রেখা তার চোখে পড়ল। সেই মুহূর্তে একবিন্দু আলো তাকে এতো আশ্বাস জুগিয়েছিল যা ইতিপূর্বে কখনো তেমন হয়নি।

কৃশ, কঙ্কালসদৃশ একটি দম্পতি টেবিলের পাশে তৈলপ্রদীপের নিচে বসে ছিল।

স্বামী, পঞ্চাশোর্ধ্ব এক প্রৌঢ়, কশাইয়ের মতো দাগ-ধরা একটা ঊর্ধ্ববাস পরেছিল।

য়ু বলল, 'চার আউন্স মদ দিন,—একটু গরম করে দিন।'

লোকটা চেয়ার ছেড়ে উঠে য়ু-র দিকে তাকাল। 'আমরা এখানে কেবল ঠাণ্ডা পানীয় সরবরাহ করে থাকি,' লোকটা বাজখাঁই গলায় বলল।

য়ু মুহূর্তেই বুঝতে পারল যে সে আবার একজোড়া ভূতের পাল্লায় পড়েছে। দ্বিতীয়বার আর বাক্যব্যয় না-করে য়ু দাঁড়িয়ে আবার ছুট লাগাল। ছুট—ছুট। ছুটতে-ছুটতে প্রায় এগারোটা নাগাদ সে চিয়েনটাং গেটে পৌঁছল।

একটা সরাইখানায় ঢুকে নিচের দিকে একটা চায়ের টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল য়ু। সেখানে ছ-সাত জন লোক বসে ছিল।

'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি ভূতের পাল্লায় পড়েছিলেন।' পাশে-বসে-থাকা এক ব্যক্তি মন্তব্য করল।

'হাঁ, ঠিকই বলেছেন—একদল ভূত।'

বাড়ি গিয়ে য়ু দেখল দরোজা বন্ধ। ভেতরে ঢুকতে ভয় পাওয়ায় সে শুভ্র-সারস-হ্রদের দিকে হাঁটা দিল। স্ত্রীর ধাই-মার বাড়ি পৌঁছিয়ে দেখল দরোজা আধখোলা। ভেতরে ঢুকল। বাড়ির চেহারা আগা-গোড়া পাল্টে গেছে বলে মনে হল। আগে জানলায় পর্দা ছিল,

এখন জানলাগুলো ফাঁকা, দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করছে। ঘরের গাঢ় সবুজ রঙ একেবারে ধোয়া। য়ু বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

আর কোথাও যাওয়ার নেই বলে য়ু কাছাকাছি একটা শুঁড়িখানায় ঢুঁ মারল। এক চুমুকে এক পেয়ালা মদ গলাধঃকরণ করার পর সে খানিকটা সুস্থ বোধ করল। মৃদু স্বরে পরিচারককে জিজ্ঞাসা করল, সে ঐ পরিত্যক্ত নির্জন বাড়িটা সম্পর্কে কিছু জানে কিনা।

পরিচারক বলল, 'বছর খানেক হল বাড়িটা খালি পড়ে আছে। আসলে বাড়িটা একটা প্রেতপুরী। আজ পর্যন্ত কেউই ওখানে ঢুকে এক টুকরো আসবাব চুরি করতেও সাহস করে নি। অথচ আসবাব-গুলোর কাঠ খুবই মূল্যবান।'

'প্রেতপুরী!' য়ু অবিশ্বাস্যতার স্বরে উচ্চারণ করল।

'হাঁ। রাত্রিবেলা বাড়িটার মধ্যে রোজই ভয়ানক গোলমাল হত। ওপরে-নিচে পায়ের দাপাদাপি শুনে মনে হত কোনো স্ত্রীলোক আর একজন স্ত্রীলোকের পিছু-ধাওয়া করেছে। চেয়ার ছোড়াছুঁড়ি, কাচের শার্সিভাঙ্গার শব্দ—সে এক বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড! কেউ কেউ পেত্নীর আর্তনাদও শুনেছে। গোলমালটা আরম্ভ হত সাধারণত মাঝরাতে, প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলত, তারপর থেমে যেত।'

'কে বা কারা ওখানে বাস করত জানো?'

'বাড়ির মালিক ছিলেন চেন্ নামে এক মহিলা,' পরিচারক বলতে লাগল, 'তাঁর একটি সুন্দরী পালিত কন্যা ছিল, সবাই তাকে মুনিয়া বলে ডাকত। ওদের অবস্থা বেশ ভালোই ছিল। মেয়েটি খুব চমৎকার বাঁশী বাজাত। রাজ-শিক্ষক চিনের সেজো ছেলে মোটা অঙ্কের মাইনে দিয়ে ওকে আর ওর মাকে তাঁর মেহফিলে নিযুক্ত করেছিলেন। শুনেছি, একটা মেয়ের সঙ্গে মারামারি করে তাকে মেরে-ফেলার অপরাধে ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। মেয়েটি সন্তান-সম্ভবা ছিল, বাড়ি এসে গলায় দড়ি দিয়ে সে আত্মহত্যা করে।

রোজ মনে হত প্রতি রাত্রে দুটি প্রেতাত্মা ধ্বস্তাধ্বস্তি করে, হাতাহাতি চুলোচুলি করে মরে। য়নিয়ার আত্মা হয়ত তৃপ্ত হয়েছিল, কেন না, বাদ্যযন্ত্রের একটা পুরো সেট-সুদ্ধ পাগুণ্ড প্যাগোডায় তাকে কবর দেওয়া হয়। য়নিয়ার মৃত্যুর পর একদিন চেন্ পুকুরঘাটে কাপড়-ধোয়ার সময় জলের মধ্যে পড়ে ডুবে মারা যায়, দুদিন পর্যন্ত খোঁজাখুজি করেও তার লাশ পাওয়া যায় না। শেষে যেদিন পাওয়া গেল সেদিন তার মৃতদেহ ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে। চেনের নিজের ছোট্টো একটা মেয়ে ছিল, আমরা তাকে চিন্-এর্ বলে ডাকতাম,—মা মারা যাওয়ার পর দিনরাত সে কান্নাকাটি করত,—একদিন চেন এসে তাকেও সঙ্গে করে নিয়ে গেল।'

'তার মানে?'

'বলছি। প্রথম রাত্রে বাড়িটার মধ্যে প্রতিবেশীরা পেত্নীদের মারামারি করতে শুনেছিল. পরদিন তারা দেখল—চিন্-এর্ বিছানায় মরে পড়ে আছে। আপনি হয়ত গল্পটা বিশ্বাস করবেন না,—করবেন?'

'কে বলেছে করব না'? য়ু দুর্বোধ্যভাবে বলল।

সব শুনে য়ু স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে, অবিবাহিত নিঃসঙ্গ যুবকের পক্ষে স্থানটা মোটেই নিরাপদ নয়, এবং পরদিনই সে নিজের শহরের উদ্দেশে যাত্রা করল।

আগন্তুকের চিরকুট

[চ'ইড়প'ইড়শান সংগ্রহ ২ থেকে গৃহীত। চ'ইড়প'ইড়শান তাঙ প্রকাশনা ভবনের নাম। গল্পকথকদের এই সব কপি পৃথকভাবে বিক্রি হত, সাহিত্যিক ও কথ্য দু-ধরনের গল্পই এতে পাওয়া যায়। কোনো লেখকের নামোল্লেখ নেই। এই গল্পের মূল বা উৎসে তিনটে পৃথক নামকরণ দেখা যায়,—'যে সন্ন্যাসী চিরকুট পাঠিয়েছিল', 'জেঠিমা ও', 'একটি প্রমাদঘটিত চিরকুট প্রদান'। এই একই ধরনের গল্প কুচিন শিয়াওশুয়ো সংগ্রহেও পাওয়া যায়। মূল গল্পে দেখা যায়, 'আগন্তুক' সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে একজন প্রতারক ও খল ব্যক্তি। স্ত্রী অসহায়, বাধ্য মহিলা, নিজের ইচ্ছায় কিছুই করতে সাহস করে না।]

দুপুরবেলা। দিনটা গরম। পথে পথচারীর সংখ্যা অল্প।

পূবনগরীর বাজার-এলাকার মধ্যস্থল এবং প্রধান সড়কের দু-রাস্তা পেছনে ওয়াঙ এরের চায়ের দোকান। দোকানের আশেপাশে আরো কয়েকটা ভালো রেস্টুরেণ্ট আছে। চা-পান গল্পগুজব এবং আড্ডার জন্যে সকালবেলায় যে-সব খদ্দের এসেছিল তারা সকলেই চলে গেছে। ওয়াঙ চের এখন প্রায় ডজন দুয়েক পেয়ালা ধুয়ে-ধুয়ে শেলফের ওপর সাজিয়ে রাখছে। পাট চুকিয়ে ওয়াঙ পাইপটা ধরিয়ে কেবল একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে, তক্ষুনি একজন সুবেশ লম্বাটে বেশ-সম্ভ্রান্ত চেহারার একটি ভদ্রলোক প্রবেশ করল। আগন্তুকের ঘন ভুরু, গম্ভীর কালো চোখ, চেহারাটা বেশ আকর্ষণীয়।

লোকটিকে চেন-এর আগে কখনো দেখে নি, তাতে সে অবাকও হয়নি। চায়ের-দোকানে কতো রকমের লোকই তো রোজ আসে, এবং সেইজন্যেই তো চায়ের দোকান সব সময় জমজমাট, ভিড়ে ঠাসা থাকে। ব্যবসাদার, শিক্ষক, জুয়াড়ি, ছাত্র, প্রতারক এবং উটকো লোক, কে-না এখানে বিশ্রাম নিতে আসে, দু-দণ্ড বসে চা-পান করে নিজেকে

সতেজ আর চাঙ্গা করে নেয়। লম্বা লোকটি ভেতরকার একটা টেবিল বেছে নিয়ে একখানা চেয়ারে বসল। লোকটিকে কাছ থেকে নিরীক্ষণ করে ওয়াঙের মনে হল খানিকটা চাপা এবং ভীতু স্বভাবের লোক, এখন অসম্ভব অন্যমনস্ক, চিন্তিত। ওকে একটু একা থাকতে দেওয়া উচিত বলে ওয়াঙ স্থির করল।

অনতিকাল পরেই রাস্তা দিয়ে একটা বালক-ফেরিওয়ালাকে হাঁকতে হাঁকতে যেতে দেখা গেল: "ভাজা তিতির-পাখির 'ভুট্টা' চা-আ-আ-ই, —সুস্বাদু ভাজা তিতির!"

লোকটা ছেলেটাকে ডাকল। সন্ন্যাসীদের মতো নেড়ামাথা ছেলেটা টেবিলের ওপর বারকোশটা রেখে একটা কাঠিতে কয়েক টুকরো 'ভুট্টা' বিঁধিয়ে লবণগুঁড়ো ছিটিয়ে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'এই নিন সার্ আপনার তিতির-ভাজা।'

'ওখানটায় রেখে দে। কি নাম তোর?' লোকটি জিজ্ঞাসা করল।

'আমার নাম নেঙ-এর। আমি নাকি খুদে সন্ন্যাসীদের মতো দেখতে, তাই আমার বাবা ঐ নামটা দিয়েছিলেন।' ছেলেটা সরল হাসিমুখে বলল।

'তুই কি উপরি শিক্ষা অর্জন করতে চাস খুদে সন্ন্যাসী?'

'নিশ্চয়ই চাই।' ছেলেটার চোখ দুটো চকচক করে উঠল।

সামনেকার রাস্তার এক প্রান্তে একটা বাড়ি, বাড়িটার নম্বর চার, নিচের দিকে চায়ের দোকানের মুখোমুখি একটা উদ্যানপথ। বাড়িটা দেখিয়ে লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'ঐ বাড়িটায় কে থাকে জানিস?'

'হ্যাঁ, ঐ বাড়িটা তো?—জানি। রাজবাড়ির বস্ত্রবিভাগের সচিব শ্রীযুক্ত ওয়াঙ-সু ঐ বাড়িতে থাকেন।'

'তাই নাকি? বলতে পারিস ঐ বাড়িতে কজন লোক থাকে?'

'পারি। মোট তিনজন। সচিব নিজে, তাঁর স্ত্রী এবং একটা অল্পবয়েসি ঝি।'

'বেশ। মহিলাকে তুই চিনিস?'

'উনি কালেভদ্রে বাইরে বের হন। কিন্তু প্রায়ই আমার কাছ থেকে তিতির কিনে থাকেন, তাই ওনাকে চিনি। কেন জিগ্যেস করছেন?'

আগন্তুক দেখল যে ওয়াঙ এর্ তাকে লক্ষ্য করছে না, তখন একটা বাক্স বের করে কমবেশি পঞ্চাশটা খুচরো মুদ্রা বের করে ছেলেটার বার-কোশের উপর রাখল, ছেলেটার চোখ দুটো আরো চকচক করে উঠল।

'ওগুলো তোর।' লোকটি বলল।

তারপর ছেলেটাকে একটা মোড়ক দেখাল, মোড়কের মধ্যে আছে সোনার দড়ির মতো একজোড়া মোটা বালা, ছোটো আকারের কাজ-করা দুজোড়া পোশাক-আঁটার পিন, একটা ছোট্টো চিঠি।

'এই জিনিসগুলো আমি ঐ ভদ্রমহিলাকে দিয়ে আসব, সচিব জানবে না, এই তো?'

'তাই, ভদ্রমহিলাকে দিয়ে একটা জবাব লিখে নিয়ে আসার জন্যে অপেক্ষা করবি। যদি উনি তোর সঙ্গে আসতে না-পারেন, তা হলে উনি যা বলবেন আমাকে এসে বলবি।'

ছেলেটা চার নম্বর বাড়িটায় ঢুকে পর্দা তুলে উঁকি মেরেই দেখতে পেল দরোজার দিকে খাড়াখাড়ি তাকিয়ে স্বয়ং সচিবমশাই-ই বসে আছেন। হুয়াঙ ফু বেঁটেখাটো মানুষ, চওড়া এবং চ্যাপ্টা কাঁধ, কিছুটা আয়তাকার মুখ, বয়েস চল্লিশের ঘরে। কার্যব্যপদেশে তিন মাস যাবৎ রাজপ্রাসাদেই ছিলেন, দুদিন হল বাড়ি এসেছেন।

'কি চাস এখানে?' সচিব বাজখাঁই স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, এবং মুহূর্তে পলায়নপর ছেলেটার পিছু-ধাওয়া করলেন। পরক্ষণেই ছেলেটার ঘাড় ধরে বারকয়েক প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকুনি দিলেন। 'এখানে দরোজা থেকে উঁকি-মারা এবং পালানোর চেষ্টা করার মানে কি বল?'

'এক ভদ্রলোক আপনার স্ত্রীর কাছে একটা মোড়ক পৌঁছে দেবার জন্যে আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি বলে দিয়েছেন মোড়কটা যেন আপনাকে না-দিই।'

'এর ভেতরে কি আছে?'

'আপনাকে বলা নিষেধ।' ভদ্রলোক মোড়কটাও আপনাকে দিতে বারণ করেছেন।'

সচিবমশাই ছোকরার মাথায় এমনি জোরে একটা ঘুঁষি চালালেন যে সে এক বাঁও পিছিয়ে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেল।

'আমার হাতে দে!' অফিসার-সুলভ বাজখাঁই গলায় তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন।

ছোকরা তখনো আপত্তি করে চলেছে: 'ওগুলো আপনার জন্যে নয়, আপনার স্ত্রীর জন্যে।'

হুয়াঙ-ফু মোড়কটা খুলে ফেললেন, জিনিসগুলো দেখলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে চিরকুটটা হাতে তুলে নিয়ে পড়তে লাগলেন।

প্রিয়তমা শ্রীমতী হুয়াঙ-ফু: আমার এই কাজটা আপনি খুবই দুঃসাহসিক কাজ বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু সেদিন রেস্টুরেন্টে দেখার পর থেকে কিছুতেই আমি আপনাকে আমার মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছি না। আমি নিজেই আপনার কাছে দেখা করতে যেতে পারতাম। কিন্তু আপনার গর্দভ স্বামীটা ফিরে এসেছে। এখন আপনাকে আমি কিভাবে একা পেতে পারি জানাবেন। হয় এই পত্রবাহকের সঙ্গে চলে আসুন, নয় জানিয়ে দিন কিভাবে আমি আপনার সাক্ষাৎ পেতে পারি। আমার গভীর ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে এই যৎসামান্য উপহার পাঠালাম।

আপনার গুণমুগ্ধ, (অস্বাক্ষরিত)

সচিব দাঁতে দাঁত ঘষলেন। ভুরু উঁচিয়ে ভয়ানক ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোকে দিয়ে এই চিরকুটটা পাঠিয়েছে কে?'

সেঙ-এরের উদ্যানপথের বাইরে ওয়াঙ-এরের দোকানের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে ছেলেটা বলল, 'ঘন ভুরু, বড়ো বড়ো চোখ, চওড়া মুখ—এক ভদ্রলোক আমাকে ওটা দিয়েছিলেন।'

হুয়াঙ-ফু ছেলেটার কাঁধটা সজোরে পাকড়ে নিয়ে দোকানের দিকে

টানতে টানতে এগোতে থাকলেন। আগন্তুক ইতিমধ্যে সটকে পড়েছিল। হুয়াঙ-এরের প্রতিবাদ সত্ত্বেও সচিব-মশাই ছেলেটাকে আবার নিজের বাড়ি ধরে নিয়ে এলেন এবং বেঁধে রাখলেন। ছেলেটা ভয়ে আপাদমস্তক শিটিয়ে গেল।

হুয়াঙ-ফু রাগে কাঁপছিলেন গম্ভীর স্বরে স্ত্রীকে ডাক পাড়লেন। হুয়াঙ-ফুর স্ত্রীর বয়স চব্বিশ, পাতলা গড়ন, মুখটা ছোটো এবং বুদ্ধিদীপ্ত। স্ত্রী এসে দেখল রাগে স্বামী সাদা হয়ে উঠেছে এবং ভয়ানক হাঁফাচ্ছে, কিন্তু কী-যে হয়েছে তার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝে উঠতে পারল না।

'এগুলোর দিকে চাও,' স্বামী ভয়ানকভাবে ভুকিয়ে বললেন।

শ্রীমতী হুয়াঙ-ফু অলসভাবে একটা চেয়ারের উপর বসে পড়ল এবং জিনিসগুলো বের করে অবাক হয়ে দেখতে থাকল।

'চিরকুটখানা পড়ো।'

পড়ল, এবং পড়া শেষ করে ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে জিজ্ঞাসা করল, 'চিঠিটা কি আমার? নিশ্চয় কোথাও ভুল করছ। কে পাঠাল এটা?'

'কে পাঠিয়েছে তা আমি কি করে জানব। তুমিই জানো। আমি যখন চাকরিস্থলে ছিলাম তখন তুমি তিনমাস যাবৎ কার সঙ্গে ডিনার করেছ তুমিই জানো।'

'কিন্তু তুমি তো আমাকে ভালো করেই জানো, চেনো,' যুবতী নম্রস্বরে বলল, 'এরকম কুকর্ম আমি কখনোই করতে পারি না। সাত বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে। কোনোদিনও কি আমি এমন কাজ করেছি যা কোনো স্ত্রীর পক্ষে করা অনুচিত?'

'তাহলে এই চিরকুটটা এল কোত্থেকে?'

'তা আমি কেমন করে জানব?'

চিঠিটা সম্পর্কে পরিষ্কার কোনো ব্যাখ্যা দিতে না পেরে যুবতী কাঁদতে আরম্ভ করল। 'এমনি আমার কপাল যে বিনা মেঘেই বজ্রপাত হল!' বিলাপ করতে করতে বলল।

কিন্তু কোনোরকম ধমক-ধামক না-করে স্বামী হঠাৎ স্ত্রীর গালে জোরে একটা চড় কষিয়ে দিল। শ্রীমতী হুয়াঙ-ফু চিৎকার করে কেঁদে উঠল এবং ঘরের মধ্যে ছুটে পালিয়ে গেল।

প্রাসাদ-সচিব তার পরিচারিকা, তেরো-বছরের কুমারী ইঙ-চের্‌কে ডেকে পাঠালেন। জামার আস্তিনের ভেতর দিয়ে বালিকার রক্তিম বাহু দুটি বের হয়ে পড়েছিল। আদেশের অপেক্ষায় সে অনড়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকল। অল্প অল্প কাঁপছিল সে, মনিবের সামনে দাঁড়ালে যা হতে পারে। ভীত চোখে মনিবের পায়চারি লক্ষ্য করছিল। সচিব হঠাৎ এক খণ্ড বাঁশ পেড়ে নিয়ে মেঝের ওপর ছুঁড়ে দিলেন। একটা দড়ি দিয়ে বালিকার হাতদুটো বাঁধলেন, তারপর ভেতর দিককার ছাদে বরগার সঙ্গে দড়ির অপর প্রান্তটি ফাঁস লাগিয়ে শূন্যে মেয়েটাকে দোলাতে লাগলেন, বংশদণ্ডটি এক হাতে ধরে বালিকার কাছে গিয়ে গর্জন করে বললেন, 'বল্, আমি যখন এখানে ছিলাম না তখন তোর কর্ত্রী কার সঙ্গে ডিনার করত?'

'কারো সঙ্গে না,' ভীতস্বরে বালিকা উত্তর দিল।

হুয়াঙ-ফু এবার বাঁশ দিয়েই মেয়েটাকে পেটাতে লাগলেন, ভেতরে তাঁর স্ত্রী বালিকার আর্তনাদ শুনে সভয়ে কাঁপতে থাকল। বেশিক্ষণ এই নির্যাতন সহ্য করতে না-পেরে বালিকা শেষ পর্যন্ত বলে উঠল, 'আপনি যখন ছিলেন না তখন গিন্নী-মা প্রত্যেক রাতে একজনের সঙ্গে শুতেন।'

'তাহলে ওবুধ ধরেছে,' প্রভু মনে মনে বললেন, এবং মেয়েটাকে নামিয়ে বাঁধন খুলে দিলেন।

'এখন বল্, আমার অবর্তমানে তোর গিন্নী-মা প্রতি রাতে কার সঙ্গে শুতেন?'

চোখ দুটো মুছে ঘৃণার স্বরে বালিকা বলল, 'বলছি। প্রতি রাতে তিনি আমার সঙ্গে শুতেন।'

'আমি এর শেষ না দেখে ছাড়ছি না,' দাঁতে দাঁত ঘষে শাসিয়ে দরোজার তালা লাগিয়ে সচিব বেরিয়ে গেলেন।

স্ত্রী এবং পরিচারিকা পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল। শ্রীমতী হুয়াঙ-ফু বালিকার থ্যাঁতলানো বাহু এবং পিঠের ক্ষতস্থান ধুয়ে দেওয়ার জন্যে উঠল এবং চেঁচিয়ে বলল, 'জানোয়ার!'

ধুতে গিয়ে জলের পাত্র রক্তে লাল হয়ে উঠলে স্ত্রী শিউরে উঠল। নালার ওপর জল ঢেলে ধুতে-ধুতে বিড়বিড় করে আবার বলল, 'বন্য জন্তু।'

বালিকা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দয়াময়ী কর্ত্রীর সেবা নিচ্ছিল, সজল চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'যদি তোমার ব্যাপার না-হত তাহলে আমি আমাদের গাঁয়ে ফিরে যেতাম, এবং তোমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম মামণি।'

'চুপ্ কর্, একদম কথা বলবি না।'

কিভাবে ঘটনাটা ঘটেছে এবং কিভাবে এরকম পরিণতি ঘটল বুঝতে না-পেরে শ্রীমতী হুয়াঙ-ফু একেবারে হতভম্ব মেরে গেছল। এখন ঘরের কোণে ভয়ে ও লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকা ছেলেটার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, 'ভদ্রলোককে দেখতে কেমন।'

ছেলেটা বর্ণনা পুনরাবৃত্ত করল, এবং ঘটনাটা আবার বিবৃত করল। স্ত্রী এবং পরিচারিকা নিঃশব্দে, রীতিমতো হতবুদ্ধি হয়ে বসে থাকল।

আধঘণ্টাটাক পরে স্বামী চারজন বিচার বিভাগের সচিবকে সঙ্গে নিয়ে ফিরলেন। তিতিরপাখি-বিক্রেতা ছেলেটাকে হিঁচড়ে টেনে এনে বললেন, 'এর নামটা লিখে নিন।'

রাজপ্রাসাদের সচিব হুয়াঙ-ফুর প্রতি সম্মানবশত তিনি যা বললেন তারা তা-ই করল।

'এখুনি যাবেন না। ঘরে আরো লোক আছে।' হুয়াঙ-ফু স্ত্রী এবং পরিচারিকাকে ডাকিয়ে সাকুল্যে তিনজনকেই গ্রেফতারের দাবি করলেন।

'কিন্তু একজন মহিলাকে গ্রেফতার করার অধিকার আমাদের কোথায়?' তারা জানাল, 'সাহসই বা করি কি করে?'

'সাহস করতে হবে। একটা খুনের ষড়যন্ত্র।'

বাধ্য হয়ে তারা সন্ত্রস্তভাবে তিনজনের নাম লিখে নিয়ে বন্দীদের পাহারা দিয়ে বাড়ি থেকে নিয়ে গেল।

বাইরে প্রতিবেশীরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল। শ্রীমতী হুয়াঙ-ফু দরোজার পর্দা অতিক্রম করেই সহজাত প্রবৃত্তিবশে সঙ্কুচিত হয়ে আবার ফিরে এল, এবং স্বামীকে বলল, 'কোকো, আমি কখনো ভাবি নি যে আমার ভাগ্যে এরকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সময় নিয়ে স্থিরমস্তিষ্কে চিন্তা করে তোমার আবিষ্কার করা উচিত ছিল যে, কে চিঠিটা লিখেছে। ঘটনাটা যৎপরোনাস্তি অপমানজনক।'

সচিবেরা ইতিমধ্যেই শ্রীমতী হুয়াঙ-ফুকে বাড়ির বাইরে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল। প্রতিবেশীরা তার যাওয়ার পথ থেকে সরে দাঁড়াল।

'তোমার যদি অপমানের ভয় থাকত, তাহলে তুমি এরকম নোংরা কাজ কখনো করতে না,' স্বামী জবাব দিলেন।

স্ত্রী বলল, 'তোমার অবর্তমানে কোনো লোক আমাদের ঘরে আসত কিনা তা তুমি নিকটতম প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারতে। আসলে তুমি আমাকে অপরাধী বলে অভিযুক্ত করতে চাও।'

'আমার তাই-ই করা উচিত।' ক্রুদ্ধস্বরে স্বামী জবাব দিলেন।

কি ব্যাপারে স্ত্রী অভিযুক্ত হল তা জানতে না পেরে প্রতিবেশীরা অবাক হল। তারা একবাক্যে সকলেই যথেষ্ট সমবেদনা প্রকাশ করল, এবং স্বামীর জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে খালি মাথা নেড়েই সায় দিল।

আসামীদের নিয়ে হুয়াঙ-ফু কাইকেঙের চিয়েনের সামনে হাজির হলেন। চিয়েনের মুখটা গোল, মাংসল, এবং তাকে অপরিসীম ধৈর্যশীল বলেই মনে হয়, যেন কোনো কিছুতেই উত্তেজিত হওয়ার পাত্র নয় সে।

স্বামী বিচারার্থ চিরকুট, উপহার সামগ্রী এবং দস্তুরমাফিক অভিযোগও পেশ করলেন। আধিকরণিক তদন্ত শেষ না-হওয়া পর্যন্ত আসামীদের আটক রাখার আদেশ দিলেন।

শান ইঙ এবং শান চিয়েনসিঙ নামে দুজন কারাগার-সচিবকে জিজ্ঞাসাবাদের দায়িত্ব দেওয়া হল।

শ্রীমতী হুয়াঙ-ফু বিবৃত দিল যে : শহরের কাছে একটি গ্রামে তার জন্ম, অল্পবয়েসে মাকে এবং বছর সাতেক বয়েসে বাবাকেও হারায় সে, এবং কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন তার ছিল না। সতের বছর বয়েসে তার বিয়ে হয়, এবং সাত বছর সুখে ঘরকন্না করে তারা। স্বামীর অবর্তমানে কোনো আত্মীয় বা অতিথি তার কাছে আসেনি, এবং বাড়িতে অথবা কোনো রেস্তোরাঁয় স্বামী ছাড়া কখনো কারো সঙ্গে ডিনার করেনি সে।

'আপনি কখনো কোনো আত্মীয়-স্বজনের কাছে যান নি কেন? তাঁরা কেউ কি আপনার কাছে আসতেন না বা দেখা করতেন না?'

'আমার স্বামী এসব পছন্দ করেন না। একবার আমার এক সম্পর্কিত-ভাই চাঙ-এর, আমার স্বামীর কাছে এসেছিল চাকরির আশায়। কিন্তু চাকরি-পাওয়া সোজা নয় বলেই চাকরি সে পায় নি। তখন থেকে আমার স্বামী আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে আমাকে বারণ করেন, এবং আমি তা মান্য করি।'

'আপনার স্বামী যা বলেন আপনি কি তা-ই করেন?'

'হ্যাঁ করি।'

'আপনি কি মেশো-মিশেলে থিয়েটারে যান,—যেখানে লোকজনের সঙ্গে আপনার দেখা-সাক্ষাৎ হয়।'

'না।'

'কেন।'

'তিনি আমাকে নিয়ে যান না।'

'এবং আপনি একা যান না।'

'না।'

'আপনি কি ডিনার করতে রেস্তোরাঁয় গিয়ে থাকেন।'

'কদাচিৎ। আমি ঘরেই সুখী। হ্যাঁ, কিছুদিন আগে—রাজপ্রাসাদ

থেকে যেদিন উনি ফিরে আসেন, সেদিন রাত্রে আমার রান্না পছন্দ না হওয়ায় উনি আমাকে কাছাকাছি একটা রেস্তোরাঁয় নিয়ে যান।'

'সেখানে কি কেবল আপনারা দুজনই খাওয়া-দাওয়া করেন।'

'হ্যাঁ।'

শ্রীমতী হুয়াঙ-ফুর প্রতিবেশীদের ডাকা হল। সকলেই স্ত্রীর কথা সমর্থন করল। তারা কখনও হুয়াঙ-ফুর বাড়িতে কোনো অতিথিকে আসতে দেখেনি এবং স্বামীর সঙ্গে ছাড়া শ্রীমতী হুয়াঙ-ফুকেও একা কখনো কোথাও বেরুতে দেখে নি। তারা জানাল যে, শ্রীমতী হুয়াঙ-ফু খুবই ঘরকুনো, এবং প্রতিবেশীরা সবাই তাকে 'যুবতী গৃহিণী' বলে ডেকে থাকে, কেননা, বাড়িতে প্রাচীনা কেউ থাকেন না, অথচ শ্রীমতী হুয়াঙ-ফু খুবই ঘরোয়া এবং ভালোমানুষ।

একজন নিকটতম প্রতিবেশী জানাল যে স্বামী-লোকটা রাগী প্রকৃতির, এবং স্ত্রীর সঙ্গে সবদাই খুব খারাপ ব্যবহার করে, অথচ স্ত্রী খুবই বশংবদ, বাধ্য এবং প্রতিবাদবিমুখ। প্রতিবেশী আরো জানাল যে শ্রীমতী হুয়াঙ-ফুকে দেখে মনে হয় একটা পাখি যেন একজন নির্দয় লোকের হাত থেকে দানা খাচ্ছে।

তৃতীয় দিনে হুয়াঙ-ফু যখন বিচারালয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন শান চিয়েনসিঙ তখন সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘটনাটির রহস্য সম্পর্কেই ভাবছিলেন। হুয়াঙ-ফু সম্মুখে এসে তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন।

'মকদ্দমার কাজ কেমন চলছে?' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তিন দিন তো চলে গেল। সম্ভবত চিরকুট-লেখকের কাছ থেকে আপনি কিছু উৎকোচ পেয়েছেন এবং তা-ই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে কোনো ব্যবস্থা নিতে অযথা বিলম্ব করছেন।'

'বড্ড বাজে বকছেন। মকদ্দমার নিষ্পত্তি খুব সহজে হবে বলে মনে হয় না। আপনার স্ত্রী তাঁর সততা সম্পর্কে বেশ জোর দিয়েই বলছেন, এবং অন্যরকম মনে করার মতো কোনো জোরালো প্রমাণও

আমরা পাইনি। কোনো সুযোগে চিরকুটটা আপনি নিজেই পাঠান নি তো?'

'আমার সামনে এভাবে কথা বলা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না। বিবাহিত জীবনে আমরা সুখীই ছিলাম।' হুয়াঙ-ফু রেগে গেলেন।

'আপনার প্রস্তাবটা কি?' শান জিজ্ঞাসা করলেন।

'আদালত যদি মকদ্দমাটা সম্পর্কে পরিষ্কার ভাবে রায় দিতে না পারে তবে আমি বিবাহ-বিচ্ছেদ দাবি করব।'

শান নিজের অফিসে গেলেন এবং নথিপত্র প্রস্তুত করলেন। বিকেলে তিনি আধিকরণিকের কাছে প্রতিবেদন পেশ করলেন। আধিকরণিক চিয়েন স্বামী-স্ত্রী এবং সাক্ষীদের আদালতে হাজিরা দেওয়ার জন্যে আদেশ জারি করলেন।

তিতিরপাখি-বিক্রেতা ছোকরাটিকেই প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন আধিকরণিক। তারপর প্রধান সাক্ষী তেরো-বছরের পরিচারিকার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন এবং তাকে ভয় দেখাবার জন্যে দুম্ করে একটা কাঠের মুগুর ও একটা লোহার পেপার ওয়েট ছুঁড়ে প্রচণ্ড রুক্ষ ও তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ঘটেছিল তা তুমি সবই জানো, জানো না?'

'হ্যাঁ জানি।'

'তোমার মনিব যখন ছিলেন না তখন তুমি কোনো অতিথি বা অতিথিদের ওঁর বাড়িতে আপ্যায়ন করতে দেখেছ?'

পরিচারিকা অধৈর্যের সঙ্গে জবাব দিল, 'কোনো অতিথি এলে আমি কি দেখতে পেতাম না?'

আধিকরণিক আবার কাঠের মুগুরে প্রচণ্ড শব্দ করে চিৎকার করে বললেন, 'ক্ষুদে মিথ্যুক কোথাকার। তুমি আমার সামনে মিথ্যে কথা বলতে সাহস করো! আমি তোমাকে জেলে পাঠাব।'

পরিচারিকা ভয় পেলেও দৃঢ় স্বরে বলল, 'ইয়োর অনার, আপনার সামনে আমি মিথ্যে কিছুই বলি নি। আমার মনিব-পত্নী সারাদিন

বাড়ি থাকতেন। একজন সৎ মহিলাকে দোষী সাব্যস্ত করতে আপনি পারেন না।' বলে সে ফোঁপানি এবং নাকি কান্না শুরু করে দিল।

পরিচারিকার সাক্ষ্য আধিকরণিককে যথেষ্ট প্রভাবিত করল।

'এখন', আধিকরণিক হুয়াঙ-ফুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'চোরের অধিকারে আছে এরকম চুরি করা জিনিস দিয়ে একটা চুরির মামলা প্রমাণ করা যায়, এবং যথাযোগ্য প্রমাণ দেখিয়ে একটা ব্যভিচারের অভিযোগও দাঁড় করানো কঠিন নয়। কিন্তু একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির চিরকুট ছাড়া অন্য প্রমাণাভাবে আপনার স্ত্রীকে আমি দোষী বলে সাব্যস্ত করতে পারি না। আপনার নিশ্চয় এমন কোনো শত্রু আছে যে এই চিরকুটটা পাঠিয়ে আপনাকে বিব্রত করতে চেয়েছে।' শ্রীমতী হুয়াঙ-ফুর দিকে তাকিয়ে তিনি আবার আরম্ভ করলেন, 'নিশ্চয় কেউ আপনাকে অসুবিধায় ফেলতে চায়। আপনি কি আপনার স্ত্রীকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে কে চিঠিটা পাঠিয়েছে তার তল্লাশ করতে চান না?'

স্বামীটা ভয়ানক একগুঁয়ে, বলল, 'এই পরিস্থিতিতে, ইয়োর অনার, আমি ওকে বাড়ি নিয়ে যেতে ইচ্ছুক নই।'

'আপনি হয়ত ভুল করতে চলেছেন', আধিকরণিক সতর্ক করে দিলেন।

'আপনি যদি বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর না করেন তাহলে আমি যার-পর নাই অখুশি হব', হুয়াঙ-ফুর সাফ কথা। কথাগুলো বলে হুয়াঙ-ফু স্ত্রীকে একবার দেখে নেওয়ার লোভটাও যদিও দমন করতে পারল না।

আরো কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর আধিকরণিক শ্রীমতী হুয়াঙ-ফুকে বললেন, 'আপনার স্বামী বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্যে জেদ করছেন। বিবাহ-বিচ্ছেদ আমি ঘৃণা করি। আপনি কি মনে করেন?'

'আমার মনে কোনো পাপ নেই। তথাপি তিনি যখন বিবাহ-বিচ্ছেদ চান, আমি প্রতিবাদ করব না।'

আদালতের কাজের মুলতুবি ঘোষণা করা হলে শ্রীমতী হুয়াঙ-ফু

কান্নায় ভেঙে পড়ল। বিবাহ-বিচ্ছেদ একজন নারীর পক্ষে ভয়ানক অসম্মানজনক, এবং শ্রীমতী হুয়াঙ-ফু তা কখনো আশাও করতে পারেনি, কেননা, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

'বিবাহিত জীবনের সাত বছর পরে তুমি যে এরকম নিষ্ঠুর হতে পারো আমি তা কখনো ভাবতেও পারিনি। তুমি জানো যে আমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। এরকম কলঙ্কিত জীবনের চেয়ে মরণও অনেক বরণীয়।'

'এ বিষয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই,' হুয়াঙ-ফু জবাব দিল, এবং হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতে থাকল।

কেবল পরিচারিকা বালিকাটি—ইঙ-এর শ্রীমতী হুয়াঙ-ফুর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।

'ইঙ-এর' শ্রীমতী হুয়াঙ-ফু বলল, 'তুমি যা করেছ তার জন্যে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু এখন আমি নিরুপায়। কাজেই তুমি এখন তোমার গুরুজনদের কাছে যেতে পারো। আমার নিজেরই যাওয়ার কোনো জায়গা নেই,—তোমাকে কোথায় রাখব? ভালো মেয়ের মতো এখন তুমি নিজেদের বাড়ি চলে যাও।'

চোখের জলে এইভাবে পরস্পর তারা বিদায় নিল।

স্ত্রীলোকটি একা পথে বেরিয়ে পড়ল। কি করে যে এহেন সর্বনাশটা হল তার কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। লক্ষ্যহীন ভাবে কোনো কিছুর প্রতি দৃক্‌পাত না করে পথ এবং পথের ভীড় অতিক্রম করে সে চলতে লাগল। সন্ধ্যে হয়ে এল, সে সিয়েন নদীর ওপারে পদচারণা করল। আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বন্দী জলস্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকল। কাছাকাছি কতকগুলো নৌকো বাঁধা ছিল। নৌকোর মাস্তুলগুলো সান্ধ্য বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছিল, এবং ধাক্কা খাচ্ছিল, আর তার মনে হচ্ছিল যেন সে নিজেই তাদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করছে। দূরবর্তী পাহাড়চূড়ায় সূর্যের সোনালি চাকতিটা ক্রমে অদৃশ্য হয়ে

যাচ্ছিল, এবং সে উপলব্ধি করছিল যেন সে এখন পথের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে অবশেষে।

নদীতে ঝাঁপ দিতে যাবে ঠিক তক্ষুনি কে যেন এসে তাকে ধরে ফেলল। পেছনের দিকে ফিরে সে দেখল কালো পোশাক-পরা চল্লিশোর্ধ্ব এক বৃদ্ধা। তাঁর মাথার চুলগুলো পাতলা, ঈষৎ ধূসরশুভ্র।

'মেয়ে, তুমি নিজেই কেন নিজের জীবন শেষ করতে যাচ্ছ?'

শ্রীমতী হুয়াঙ-ফু নির্নিমেষে তাঁর দিকে চেয়ে রইল।

'তুমি আমাকে চেনো? মনে হয় চেনো না,' বৃদ্ধা সহানুভূতির স্বরে বললেন।

'না,' যুবতী উত্তর দিল।

'আমি তোমার অভাগিনী জেঠিমা। প্রাসাদ-সচিবের সঙ্গে তোমার বিয়ে হওয়ার পর থেকে আমি তোমার কাছে যেতে বা তোমাকে বিরক্ত করতে ভরসা পাই না। অনেকদিন আগে—যখন তুমি খুব ছোটো ছিলে, তখন তোমাকে দেখেছিলাম। সেদিন তোমার প্রতিবেশীদের কাছে শুনলাম যে তুমি তোমার স্বামীর সঙ্গে কী-এক মকদ্দমায় জড়িয়ে গেছ, তাই প্রত্যেকদিন আমি তোমার সংবাদ নিতে যেতাম। আমি শুনেছি যে আধিকরণিক বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রি দিয়েছেন। কিন্তু তা বলে নদীতে ঝাঁপ দেওয়া কেন?'

'আমার স্বামী আমাকে চান না, এবং কোথাও যাওয়ার মতো কোনো জায়গা আমার নেই। আমার বেঁচে থেকে লাভ কি?'

'এসো, আমার সঙ্গে এসো, তুমি তোমার বুড়ি জেঠিমার কাছে থাকবে বাছা,' বৃদ্ধা আন্তরিক ভাবে বললেন, বয়েসের তুলনায় তাঁর কণ্ঠস্বর বেশ সতেজ, 'এইরকম ভরা যৌবনে আত্মত্যাগ করে অনর্থক জীবনটা নষ্ট করে কেউ।'

শ্রীমতী হুয়াঙ-ফু নিশ্চিতভাবে জানত না যে এই বৃদ্ধা সত্যিই তার জেঠিমা, কিন্তু ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে কিছু না থাকায় সে তাঁর সঙ্গেই চলতে লাগল।

প্রথম তারা গেল একটা শুঁড়িখানায় ; বৃদ্ধা তার জন্যে পানীয়ের হুকুম দিলেন। সেখান থেকে জেঠিমার বাড়ি পৌঁছে যুবতী দেখল বাড়িটা একটা বাগানবাড়ি এবং ভয়ানক নির্জন। সুদৃশ্য বাড়ি, সবুজ পর্দা, আর্মচেয়ার এবং টেবিলে সুসজ্জিত।

'জেঠিমা, আপনি কি এখানে একাই থাকেন? কি ভাবে চলে আপনার?'

হু নাম্নী এই বৃদ্ধা হেসে জবাব দিলেন, 'তা, যেমন তেমন করে চলে যায় বাছা। তোমাকে ছেলেবেলায় আমি 'মিসি' বলে ডাকতাম, তোমার নামটা একেবারে ভুলে গেছি।'

'আমার নাম চুনমি,' শ্রীমতী হুয়াঙ-ফু জবাব দিল, এবং আর কোনো প্রশ্ন করল না।

বৃদ্ধা হু তার প্রতি খুবই সদয়. কদিন তিনি অতিথিকে পুরোপুরি বিশ্রাম নিতে দিলেন। চুনমি বিছানায় শুয়ে-শুয়ে তার আকস্মিক ও অদ্ভুত ভাগ্য পরিবর্তনের কথা ভাবতে থাকে।

কিছুদিন পরে একদিন বৃদ্ধা তাকে বললেন, 'শক্ত হও মেয়ে। আমি তোমার সত্যিকার জেঠিমা নই। কিন্তু তোমাকে নদীতে ঝাঁপ দিতে দেখে আমি একজন যুবতীর জীবন বাঁচাতে চেয়েছিলাম। তুমি যুবতী, আর সুন্দরীও, সারাটা জীবন সামনে পড়ে আছে।' বলতে-বলতে তাঁর প্রাচীন চোখ দুটি সংকীর্ণ গর্তের মতো কুঁচিয়ে গেল। 'যে স্বামী পশুর মতো মরবার জন্য তোমাকে পরিত্যাগ করেছে, সেই স্বামীকে কি তুমি এখানো ভালোবাসো?'

চুনমি বালিশের ওপর থেকে মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়, 'আমি তা বলতে পারব না জেঠিমা।'

'তোমাকে আমি দোষ দিচ্ছি না,' বৃদ্ধা বললেন, 'কিন্তু মেয়ে, তোমাকে দাঁড়াতে হবে, বাঁচতে হবে। তুমি এখানো যুবতী, এবং বোকা লোকে তোমাকে ঠেলে ফেলে দেবে আর তুমি তা সয়ে যাবে তা হবে না। স্বামীর কথা ভুলে যাও, এবং দুর্ভাগ্যকে জয় করো।

অল্পবয়েসি তরুণ-তরুণীদের কিছু সস্তা ভাবপ্রবণতা থাকতেই পারে। তুমি যতো পথ অতিক্রম না-করেছ তার অনেক গুণ বেশি সেতু আমি পার হয়ে এসেছি। জীবন তা-ই। কখনো উঁচু, নিচু কখনো-বা; এইভাবে বৃত্তের চারপাশেই তার পরিক্রমা। আঠাশ বছর বয়েসে আমি স্বামীকে হারিয়েছিলাম। তোমার বয়েস কতো?'

চুনমি বয়েস বলল।

'তোমার এখন যা বয়েস তার চেয়ে তখন আমি বড়োই ছিলাম। কিন্তু এই দ্যাখো আমি, আমার দিকে তাকাও।' যদিও মুখমণ্ডলে বলিরেখা পড়েছে, নাকের চামড়া কুঁচকে গেছে, তথাপি তাঁকে দেখে যথেষ্ট স্বাস্থ্যবতী বলেই মনে হয়।

'ভালোমতো বিশ্রাম নাও, এবং অল্প সময়ের মধ্যে আবার সতেজ হয়ে ওঠো। জীবনটাই তো পথিকবৃত্তি। পড়ে তুমি যাবেই। তারপর কি করবে? বসে-বসে চিৎকার করে কাঁদবে, উঠে দাঁড়াতে চাইবে না? না, তোমাকে উঠে দাঁড়াতে হবে, এবং আবার শুরু করতে হবে পথ-পরিক্রমা। তোমার মুখ থেকে যতটুকু শুনেছি তাতেই বুঝতে পেরেছি যে তোমার স্বামী একটা আস্ত বজ্জাত। কেন সে তোমাকে ত্যাগ করল? আসলে সে তোমাকে বাইরে ছুঁড়ে দিল। তাহলে কেন তুমি এভাবে শুয়ে-শুয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ছ ক্রমশ?'

বৃদ্ধার কথাগুলো চুনমির ভালো লাগল। 'কিন্তু আমি কি করতে পারি? চিরকাল তো আপনার গলগ্রহ হয়ে থাকতে পারি না?'

'দুশ্চিন্তা করো না। ঠিক মতো বিশ্রাম নাও, এবং আবার সুস্থ হয়ে ওঠো। তারপর যখন তুমি ভালো মনে করবে একটি মনের মতো পাত্র খুঁজে নিয়ে আবার বিয়ে করো, ঘর-সংসার করো।'

'ধন্যবাদ জেঠিমা। আমি ইতিমধ্যেই বেশ সুস্থ বোধ করতে আরম্ভ করেছি।'

শ্রীমতী হুয়াঙ-ফু তার জীবনরক্ষাকারিণী জীবনের তিক্ত অধ্যায়ে যে ভাবে তার আত্মাকে উদ্‌বোধিত করে তুলেছেন তার

জন্যে তাঁকে অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা আর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে স্বস্তি বোধ করল।

এখন প্রত্যহ দুজনে নৈশভোজে মিলিত হয় নিয়মিত।

বৃদ্ধা ও ভোজনের পরে একপাত্র ধেনো মদ পান করে খুবই তৃপ্তিবোধ করে থাকেন। 'জীবনে তৃষ্ণার শান্তি এই মদ,' বৃদ্ধা বলেন, 'জীবনের প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে মদের কোনো জুড়ি নেই। এই বয়েসে কেবল নিয়মিত মদ্যপানের জন্যেই আমি সর্বদা সুস্থ বোধ করি, এবং নিজেকে আমার অনেক যুবতী বলে মনে হয়।'

হৃদয়বতী বৃদ্ধার মেজাজি পানাহারক্রিয়াটি চুনমি মনে মনে খুবই প্রশংসা করল।

সেদিন ভোজনপর্ব শেষ হলে বাইরে থেকে একজন পুরুষের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল : 'শ্রীমতী ও আছেন নাকি? শ্রীমতী ও?'

বৃদ্ধা ক্ষিপ্রপদে উঠে দাঁড়িয়ে দরোজাটা খুলে দিলেন।

'এতো সাত সকালে দরোজা বন্ধ করে দিয়েছেন যে', লোকটি জিজ্ঞাসা করল।

সেদিন সারাক্ষণ অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছিল, শ্রীমতী ও সকাল-সকাল দরোজায় খিল লাগিয়ে দিয়েছিলেন ঠিকই।

বৃদ্ধা তাকে বসতে বললেন, কিন্তু সে বলল তাকে তক্ষুনি চলে যেতে হবে, বলে সে দাঁড়িয়ে থাকল

চুনমি পেছনের ঘর থেকে দেখল সে বেশ লম্বা, তার চোখ দুটো বড়ো বড়ো, চোখের পাতায় ঘন ভুরু। একাগ্র দৃষ্টিতে চুনমি দেখছিল, সতর্কভাবে পর্দার আড়াল থেকে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। তার মুখটা বেশ চওড়াই, এবং নাকটা আদৌ টিকলো নয়, তিতিরপাখি-বিক্রেতা ছোকরার বর্ণনার সঙ্গে চেহারার খুব মিল আছে। কিন্তু চুনমি মনের সংশয় চেপেই রাখল।

'ব্যাপার কি?' অসহিষ্ণু কণ্ঠে লম্বা লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'তিন মাসের ওপর হয়ে গেল আপনি তিনশ ডলার দামের জিনিস বিক্রি করেছেন। আমার টাকা চাই।'

'সেগুলো বিক্রি হয়েছে ঠিকই', জেঠিমা জবাব দিলেন, 'সেগুলো আমার মক্কেলের কাছে আছে, কিন্তু সে যদি টাকা না দেয় আমি কি করব? সে দেওয়ামাত্র আমি তোমাকে সমস্ত টাকাই দেবো।'

'কিন্তু অস্বাভাবিক রকম দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি টাকাটা উদ্ধার করে আনুন।'

ভদ্রলোক চলে গেল, এবং বৃদ্ধা ও কিছুটা বিমর্ষ মুখে ফিরে এলেন।

'কে এসেছিল?' চুনমি জিজ্ঞাসা করল।

'আমি তোমাকে বলব চুনমি: ভদ্রলোকের নাম হাঙ। সে বলে সে সাইচাউয়ের ম্যাজিস্ট্রেট ছিল, এখন অবসর নিয়েছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না। আমি জানি লোকটা মিথ্যে কথা বলে, কিন্তু লোকটা ধনী এবং মহৎ। আমাকে ওর কিছু মণি বেচে দিতে বলে। ও নাকি জহুরিদের দালাল। হতে পারে, না-ও হতে পারে। কিন্তু লোকটার কাছে দামী দামী পাথর আছে, এবং একদিন তার কিছু মণি আমাকে বেচতে দেয়। মণিগুলো বিক্রি হয়েছে, কিন্তু আমার মক্কেল এখনো টাকাপয়সা শোধ করে নি। কাজেই ওর অধৈর্যের জন্যে ওকে দোষ দিতে পারি না।'

'লোকটাকে ভালো করে জানো?'

'হ্যাঁ, তবে ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যাপারে হয়তো একটু বেশিই। ওরকম লোক আর দুটো আমি দেখি নি। লোকটাকে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। আমার যখন টাকাপয়সার অভাব হয়, আমি না চাইতেও বেশ কিছু দিয়ে দেয়। পরের বার এলে আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।'

চুনমির আগ্রহ ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সে তা কিছুতেই প্রকাশ করল না।

হাঙ এলে শ্রীমতী হু-য়ের আত্মীয় বলে চুনমির সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন শ্রীমতী হু নিজেই। চুনমি বুঝে নিতে চায় হাঙই সেই আগন্তুক কিনা—যে তার জীবনে একটা প্রচণ্ড পরিবর্তন এনে দিয়েছে, অথচ মনে মনে লোকটার প্রতি একটা গভীর অনুরাগও জন্মে গেছে। কাজেই দুরকম পরস্পর-বিরোধী মানসিকতায় চুনমি ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে ভেতরে ভেতরে। মন থেকে সে কিছুতেই এই সংশয় দূর করে ফেলতে পারে না যে এই লোকটাই সেই আগন্তুক কিনা যাকে সে মনে মনে খুঁজছে, এবং সে তিতির বিক্রেতা ছেলেটার বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে চায় রহস্যময় সেই আগন্তুকের সঙ্গে কতোটা সাদৃশ্য পাওয়া যেতে পারে এই জহুরিদের দালালটার।

এবং একটি সূত্র তাকে রীতিমতো বিরক্ত করে মারে যে সে-ই আগন্তুকের নাকটাকেও এর মতো খাঁদা বলা যায় কিনা।

একটি ঘরোয়া সভায় চিন্তায় ডুবে গিয়ে চুনমি লোকটার দিকে একাগ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

'আপনি আমার দিকে ওভাবে তাকিয়ে দেখছেন কি?' হাঙ রহস্য করে বলল, 'আকৃতি-বিশেষজ্ঞরা (Physionomist) আমাকে দেখে বলে থাকে আমার মুখটায় এবং কানের লতিতে নাকি খুব সৌভাগ্য লক্ষণ রয়েছে।' বড়ো বড়ো কানের লতি টানতে টানতে বলে, 'দেখছেন? আমি সর্বদাই লোকের কাছে সৌভাগ্য বয়ে নিয়ে আসি।'

পর্যায়ক্রমে হাঙ কখনো আমুদে, কখনো দয়ালু, কখনো মনোযোগী শ্রোতা। খুব জাঁকালো পোশাক ছিল তার গায়ে, এবং অপরিমিত দম্ভ প্রকাশ পাচ্ছিল পোশাকগুলোয়। যেহেতু সে অনেক দেশভ্রমণ করেছে, সেহেতু সে অনেক কৌতুকপ্রদ মজাদার গল্প বলে যেতে পারে অনর্গল, এবং একটা হামবড়াভাব তার চরিত্রমাধুর্যের অঙ্গ ছিল। আবার অন্যরা কি বলছে তা শোনার আগ্রহও তার কম নয়। চুনমিকে তার নিজের কথা বলার জন্যে সে অনুরোধ করল, এবং শেষ

পর্যন্ত শুনল যথেষ্ট গুরুত্ব এবং সহানুভূতি দিয়ে। প্রাক্তন স্বামীর জঘন্য নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদে সে একবারমাত্র তার কথায় বাধা সৃষ্টি করল, এবং সর্বক্ষণ চুনমির পক্ষ নিল নির্দ্বিধায়। যদি সে চুনমির প্রেমেই পড়ে থাকে, তবু চুনমির প্রতি তার সহানুভূতি একান্ত স্বতঃস্ফূর্ত এবং নিষ্ঠাময় বলে মনে হল।

দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকারের পর সে চুনমিকে তার জামার বোতামের ওপর একটা ফুল এঁকে দিতে অনুরোধ করল। চুনমি তাতে ভীষণ খুশি হল। চুনমি দেখল সত্যিই সে ব্যবসাসংক্রান্ত কাজেই বৃদ্ধার কাছে এসে থাকে, কিন্তু এখন বারংবার অকারণে আসার জন্যে নানান ছলছুতো দেখাতে থাকে। সবসময় সে সঙ্গে একটা বোতল নিয়ে আসেই, কিংবা কিছু মিষ্টি, কিংবা সুস্বাদু খাবার। বৃদ্ধার গৃহে নৈশভোজের বায়না ধরে প্রত্যহ, খিদে পেয়েছে বলে অনুযোগ করে, এবং সুযোগমতো কিভাবে শূকর মাংস রান্না করতে হয়, কিংবা কিভাবে আদা-মিছরি তৈরি করতে হয় সে-সব সম্পর্কে চুনমিকে নানা রকম জ্ঞান দান করতে থাকে। পুরুষ যখন স্ত্রীলোককে আদেশ করবার সাহস অর্জন করে, তখন স্ত্রীলোকেরা সেই আদেশ সুখের সঙ্গে পালন করতে রাজী হয়।

'ওই দুষ্টু লোকটা সম্পর্কে তোমার ধারণা কি?' হাও চলে গেলে হু চুনমিকে জিজ্ঞাসা করেন।

চুনমি উত্তর দেয়: 'আমার মনে হয় ভারি আমুদে আপনার ওই দুষ্টু লোকটা।'

'সেদিন ওর জন্যে কিছু করতে অনুরোধ করেছিল আমাকে, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি তা করতে পারি নি।'

'কাজটা কি?'

'লোকটা একা থাকে, অবিবাহিত। সেদিন বলল একটা পছন্দ মতো পাত্রী খুঁজে দিন। ভাবছি, অবিশ্যি তোমার যদি আপত্তি না থাকে,—তোমার সঙ্গে বিয়ের একটা প্রস্তাব দিয়ে ফেলি। যতদূর

বুঝি—তুমিও ওকে পছন্দ করো, এবং প্রস্তাবটা দুজনের পক্ষেই আনন্দের হবে।'

'দেখি,' চিন্তিতভাবে চুনমি বলল।

'কি দেখবে? ও সত্যিই একটা গুণী মানুষ। তোমার আপত্তিটা কিসের? যদি তুমি তোমার প্রাক্তন স্বামী-ষণ্ডটির কথা ভুলতে না পেরে থাকো, তাহলে তোমার মতো মহামূর্খ দুনিয়াতে আর দ্বিতীয়টি নেই। ওর টাকা আছে, এবং তোমাকে আদর-যত্নে রাখার শক্তিও আছে, আর আমিও তোমাদের দুজনের হাত মেলাতে পারলে সমস্ত দুর্ভাবনা থেকে মুক্তি পাব।'

'আমি নিশ্চয়ই আপনাকে বলব জেঠিমা,' চুনমি বলল, 'আমি ওঁকে পছন্দ করি, কিন্তু আরো কিছু আছে যেগুলো সম্পর্কে আমার নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার।'

'কিছু-টা কি?'

'আমার ধারণা, উনিই সেই অপরিচিত ব্যক্তি যিনি সেই চিরকুটটা পাঠিয়ে ছিলেন, এবং ফলত আমাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিলেন।'

শ্রীমতী হু এমন উচ্চ হাস্যে ফেটে পড়লেন যে চুনমি যথেষ্ট লজ্জা-বোধ করল।

'তিত্তির-বিক্রেতা ছেলেটার বর্ণনার সঙ্গে কমবেশি মিল আছে, বিশ্বাস করুন।'

'যা-তা বকছ! পৃথিবীতে লম্বা লোক কতোই তো আছে, এবং মোটা ভুরু বড়ো বড়ো চোখও তো কতো লোকের থাকতে পারে! এ-তে ওর দোষ কোথায়? ধরে নেওয়া গেল যে সেই আগন্তুক না হয় ও-ই, তাতে কি? যে পিঠে তুমি খাওনি তার জন্যে তোমাকে শাস্তি পেতে হল। দাম তুমি মিটিয়ে দিয়েছ। কেকটা এখানে। এবং ও-টি তোমার। আমি যদি তুমি হতাম আমি আগন্তুককেই বিয়ে করতাম—কেবল সেই পশুটা—যে তোমার স্বামী ছিল—তাকে দেখানোর জন্যেই।'

কি ভাববে চুনমি জানে না। যদি হাও সেই আগন্তুক না হয়, সে খুব ভালো কাজই করবে, কিন্তু যদি সে-ই হয় তাহলে সে প্রাক্তন স্বামীর কোনো ক্ষতিই করবে না। সে প্রতিশোধের স্বাদুতা আস্বাদ করতে চেষ্টা করল।

পরের বার হাও এল, চুনমি আগের চেয়ে আরো হাসিখুশি। হাওকে পরীক্ষা করতে ইচ্ছে হল তার।

হাও নিজের বোতল এনেছিল, বলল, 'এসো, তোমার মতো সুন্দরী মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভাগ্যে একটু পান করা যাক।'

'না, আমি তোমার ভাগ্যসূচক কানের লতিই পান করব,' যুবতী উত্তর দিল। পানীয় চুনমিকে যথেষ্ট সাহায্য করল। মনের কৌতূহল দমন করতে পারছিল না সে, পরমুহূর্তে দম নিয়ে সে বলল, 'জানা গেছে, আগন্তুকের চেহারা ছিল ঠিক তোমারই মতো।'

'সত্যি? আমি সম্মানিত বোধ করছি। যে এরকম একটা কাজ করতে পারে সেই লোকটার দুঃসাহসের কথা ভাবো! আমি যদি আগে তোমাকে দেখতাম,—তুমি যদি কোনো ডিউকের পত্নীও হতে,—তাহলেও আমি অনুরূপ কিছু করতে চাইতাম। একদা এক ডিউকের পত্নীর সঙ্গে আমার প্রণয় হয়েছিল। বিশ্বাস করছ না? আমি ধরে নেব না তুমি করছ। যাকগে, আমার কানের লতির সৌভাগ্যে—এসো, পান করা যাক।' আর একপাত্র পূর্ণ করে এক চুমুকে নিঃশেষ করল।

'দেখছ,—কেমন মিথ্যে কথা বলে!' সানন্দে শ্রীমতী হু মন্তব্য করলেন।

'বোকামো করো না,' হাও বলল, কাপটা নিচে রেখে দিল। 'লোকটাকে তুমি কখনো দেখো নি। কি করে তুমি জানলে যে সে লম্বা না বেঁটে? তোমার স্বামী যে একটা বর্বর ছিল তা তোমাকে—তোমার মতো সুন্দরী যুবতীকে পরিত্যাগ-করা দেখেই বোঝা যায়।'

'হ্যাঁ, সে আমাকে কোনো সুযোগই দিল না,' চুনমি বলল, 'এখন

সবই চুকেবুকে গেছে। আমি কিছুই গ্রাহ্য করি না। আমার কৌতূহল —মানে জানার আগ্রহ, সত্যিসত্যি কে ওই চিরকুটটা পাঠিয়েছিল।' চুনমি রক্তিম চোখে তাকিয়ে বলল।

'বর্বরটাকে ভুলে যাও,' হাঙ বলল, 'এসো, পান করা যাক। তোমার মতো যুবতীর সুন্দর মুখে অশ্রু শোভা পায় না। সে তোমাকে চায় নি, অথচ তুমি এখনো তার কথাই ভেবে চলেছ। ওঃ, আজব দুনিয়া, কী আজব এই দুনিয়া!'

চুনমির সবকিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। বৃদ্ধা তাকে পান করতে এবং অতীত কথা বিস্মৃত হতে উৎসাহিত করছিলেন। প্রায় প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনায়, চুনমি পান করতে আরম্ভ করল। বিকেলের দিকে তাকে খুব প্রফুল্ল মনে হল। সর্বপ্রথম সে উপলব্ধি করল যে সে সম্পূর্ণ মুক্ত, আগে একবারও এরকমটা উপলব্ধি করেনি সে। বিস্ময়কর আনন্দের অনুভূতিতে সে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। বোকার মতো সে পুনরাবৃত্তি করে চলেছিল, 'হ্যাঁ, আমার স্বামী নেই·····, হ্যাঁ, আমার স্বামী নেই-ই তো।'

'হ্যাঁ, ভুলে যাও,' হাঙ বলল।

'হ্যাঁ, ভুলে যাও।' চুনমি আপন মনে বলল, 'বলো তুমি সেই আগন্তুক নও,—তুমিই কি?'

'যা-তা বকো না। যদি আমিই হতাম তুমি কি করতে?'

'আমার বর্বর স্বামীর কবল থেকে আমাকে মুক্ত করে আনার জন্যে আমি তোমাকে ভালবাসতাম—ভালোবাসব। আমার স্বামী সেই আগন্তুকের সঙ্গে আজ রাত্রে আমাকে পান করতে দেখলে কি মজাটাই না হত!—হত না!'

'বলো তোমার ভূতপূর্ব স্বামী,—মাপ করো', হাঙ চুনমির ভুল সংশোধন করে দিয়ে বলল, 'এর দ্বারা কি প্রমাণ হয়, জানো? এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে সেই আগন্তুককে তুমি চিনতে এবং আগে তার সঙ্গে একজায়গায় খানাপিনা করেছ। হাজার হাজার স্ত্রীলোক স্বামীর

অগোচরে অনেক কিছুই করে থাকে, কিন্তু তাতে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয় না। তুমি অবিশ্বাসিনী না হয়েও স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছে। কি আজব দুনিয়া।'

'তুমি একটা শয়তান,' চুনমি বলল, এবং হাসতে লাগল। শ্রীমতী হুয়াঙ-ফু থাকাকালে তার হাসি এতো সতেজ আর স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না।

'আমি শয়তান?' হাঙ জিজ্ঞাসা করল, এবং চুনমিকে বাহুপাশে বন্দী করল।

বিয়ের পর হাঙ স্ত্রীকে নিয়ে পশ্চিম দিকে দূর মফস্বলে ঘর বাঁধল। চুনমি ভাবতেও পারেনি যে সে এতো সুখী হবে। তারা হাসে, কথা বলে, এবং পূর্বে যা হারিয়েছে সচেতন ভাবে তা যেন পূরণ করে নিতে চায়—চুনমিকে দেখে তা-ই মনে হয়। হাঙ প্রায়ই স্ত্রীকে নিয়ে চলে যায় ছোটো রেস্তোরাঁর, এবং সানন্দে চুনমি যায় তার সঙ্গে। চাঙ বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন, এবং খরচে কোনো কার্পণ্য করে না। হাঙ চুনমির হাতে যে টাকা-পয়সা দেয় তার কোনো হিসেবই চায় না,—যা হুয়াঙ-ফু হরবকত করত। তারপর, প্রায়ই হাঙ তার বন্ধুবান্ধবদের ডিনারে নিমন্ত্রণ করে আনে। প্রাক্তন স্বামীর কাছে এসব ছিল অভূতপূর্ব—অসম্ভব ঘটনা।

খোলাখুলিভাবে হাঙ স্বীকার করেনি যে সে-ই সেদিনকার আগন্তুক। প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার অদ্ভুত দক্ষতা ছিল তার, অথবা সে এমনভাবে সদম্ভে স্বীকার করে যে তার স্বীকারোক্তিটিকে সত্য বা গুরুত্বপূর্ণ বলে মেনে নেওয়া কঠিন।

কিন্তু একদিন বিকেলবেলা তিতিরপাখির মাংসসহ একটু হালকা ধরনের পান করার পরে, হাঙ খুব সুখী বোধ করছিল, (তিতিরের মাংসও নিয়ে আসা হয়েছিল পথের হকারের কাছ থেকে), এবং তখন মাত্র একবারের জন্যে মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল, 'তুমি জানো আমি কখনো-কখনো সেই হতভাগ্য তিতিরবিক্রেতা বালকটির কথা ভেবে

থাকি—।' বাক্যটি হঠাৎ চেপে দিয়ে প্রসঙ্গান্তর জুড়ে দিয়ে বলল, '—তার সম্পর্কে তুমি যা বলেছ সেই সূত্র ধরেই অবশ্য ?'

এবং চুনমি বুঝে নিয়েছিল।

সেই রাত্রে বিছানায় শুয়ে আলো নেভানোর পর চুনমি তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'বলো কেন ওই চিরকুট পাঠিয়েছিলে তুমি।'

একটা কথা—নিশ্চুপতা।

'লোকটা তোমাকে নির্যাতন করত,—করত না।' শেষে সে বলল।

'তুমি জানতে ? তুমি আমাকে দেখেছিলে।'

'নিশ্চয়ই জানতাম। তুমি জানো না কি উপহাসযোগ্য দম্পতি ছিলে তোমরা,—যেন একটা কটকটে ব্যাঙের সঙ্গে একটা রাজহংসীর বিয়ে হয়েছিল।'

'কোথায় দেখেছিলে আমাকে ?'

'প্রথমদিন তোমাকে ওই লোকটার পেছন পেছন চলতে দেখেছিলাম কুওচিয়েন সড়কে। পথনির্দেশ নেওয়ার ছুতোয় তোমাকে—তোমাদের দাঁড় করিয়েছিলাম। লোকটা তোমাকে জঘন্যভাবে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। আমার দিকে এমন রুক্ষ আর সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়েছিল যা আমি কখনো ভুলব না। গত বছর বসন্তকালের ব্যাপার। তোমার মনে থাকার কথা নয়। তোমাকে দেখে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির উপমাই মনে এসেছিল সেদিন। প্রথম দর্শনেই আমি মোহিত হয়ে গিয়েছিলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম পাখিটাকে মুক্তি দিতে হবে। তোমাকে খুঁজে বের করতে আমার খুব কষ্ট হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তোমারও শত্রু আছে, তুমি কি জানো ?'

'আমি—আমার ?' চুনমি থাবি খেল।

'তোমার আত্মীয় চাঙ এর্‌কে চেনো ?—যে তোমার স্বামীর কাছে চাকরির আশায় এসে দিনকতক তোমাদের বাড়িতে থেকে গিয়েছিল।'

'তুমি চ্যাঙকে চেনো ?'

'হাঁ। তুমি কি জানো কেন তোমার আত্মীয়-স্বজনরা কখনো

তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসে নি? তার কারণ চ্যাঙ এরের প্রতি তোমার প্রাক্তন স্বামীর ব্যবহার। সে বাড়ি ফিরে এসে গ্রামের প্রত্যেককে ব্যাপারটা প্রচার করে। আমি তোমার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম, এবং পাগলের মতো ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিলাম। আমি ভাবতাম তুমি একটা পরী—একটা দৈত্য তোমায় শৃঙ্খলিত করে রেখেছে।'

'কিন্তু তুমি এরকম কাজটা করলে কি করে? তোমার সঙ্গে কখনো তো আমি ডিনার করি নি। এবং আমি খুব সুখীই ছিলাম।'

'হ্যাঁ,—পিঞ্জরাবদ্ধ পাখিরা যেমন সুখী। মনে করে দেখো, দুদিন আগে তোমাকে সেই মারাত্মক চিঠিটা পাঠিয়েছিলাম, তখন তোমার স্বামী সবে ফিরেছে, তুমি তাইতো রেস্টুরেণ্টে ওর সঙ্গে ডিনার করছিলে। আমি ওখানে ছিলাম, ঠিক পরের টেবিলটায়। হ্যাঁ, তোমরা খুবই সুখী ছিলে। আমার বুঝে নিতে দুটি মিনিটও লাগেনি যে তুমি তোমার স্বামীকে ভয় পাও। লোকটাকে আমি অপছন্দ করতাম। আমি লক্ষ্য করেছি তোমার খাবার নিয়ে কখনো সে তোমার সঙ্গে আলোচনা করত না। সে যা পছন্দ করত তাই অর্ডার করত, তুমি বাধ্য ও বিনীতভাবে তা-ই খেতে। রাগে আমি মাথা কুটতে থাকতাম। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে চাইলাম, তিতিরবিক্রেতা ছোকরা ডুবিয়ে দিল। আমি পাগলের মতো ভালোবাসতাম তোমাকে, এবং হু-র মাধ্যমে প্রত্যেক দিন মকদ্দমার খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করতাম। আমার বিশ্বাস হয়েছিল সে তোমাকে পরিত্যাগ করবে, কিন্তু আমি যা আশা করেছিলাম অবিকল তা-ই যে ঘটবে কখনো তা ভাবতেও পারি নি।'

পরদিন সকালে চুনমি দেখল হাঙ একটা চিঠি লিখতে ব্যস্ত। লেখা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করল, এবং তারপর হঠাৎ চিঠিটা ছিনিয়ে নিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'যদি আমার হাতের এই চিঠিটা আদালতে পেশ করি তাহলে কি হতে পারে জানো?'

হাঙ একটু ঘাবড়ে গেল, এবং মুহূর্তে সামলে নিয়ে বলল, 'তুমি তা পারবে না।'

'কেন পারব না?'

'আমি জানি তুমি হাতের লেখা সম্পর্কে ইঙ্গিত করছ, কিন্তু ভুলে যেও না যে তুমি সেই ব্যভিচারীর সঙ্গে এখন বাস করছ। সবচেয়ে বেশি শাস্তি হলে তুমি ব্যভিচারের দায়ে অভিযুক্ত হবে, এবং বিচারক একজন আসামীকে দুবার শাস্তি দিতে পারে না।'

'শয়তান!'

চুনমি আনত হল, এবং তাকে চুম্বন করল, একটি দীর্ঘ উষ্ণ চুম্বন।

'তুমি আমাকে কামড়ে দিলে', কৌতুক করে হাঙ প্রতিবাদ জানায়।

'তোমাকে কতো ভালোবাসি তার প্রমাণ!'

নতুন বছর ফিরে এল। চুনমি প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে বছরের প্রথম দিনে সিয়ানকুয়োশিহ্ যেত শুভ বছরের প্রার্থনা জানাতে। সে হাঙকে রাজী করাল এবছরে, এবং তারা একসঙ্গে মঠে যাত্রা করল।

প্রতি বছরের প্রথম দিনে সস্ত্রীক সিয়ানকুয়োশিহ্ যাওয়ার কথা হুয়াঙ-ফুরও মনে পড়ল। আদালতের রায় বেরনোর পর থেকে তিনি খুবই নিঃসঙ্গ এবং অসুখী জীবন যাপন করছিলেন। আগন্তুকের রহস্য কখনো উদ্ঘাটিত হবে না, হুয়াঙ-ফু রাজপ্রাসাদেই ফিরে গিয়েছিলেন আবার। স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটার পর থেকে কেবলই তার গুণগুলির কথা মনে পড়ে যায় হুয়াঙ-ফুর এবং তার কথা যতো ভাবেন তার সততার প্রতি তাঁর বিশ্বাস ততোই বেড়ে যেতে থাকে। সবকিছুই যেন স্ত্রীর সততার অনুকূলে: গ্রেপ্তার এবং মকদ্দমা চলাকালীন তার ব্যবহার, পরিচারিকা এবং প্রতিবেশীদের সাক্ষ্য। তাঁর বিষাদ ক্রমশ অসহ্য হয়ে ওঠে। একরকম জোর করেই তিনি একটা ভালো গাউন পরে নেন, এক বাক্স ধূপ নেন সঙ্গে, এবং মঠের দিকে হাঁটতে থাকেন।

নব বর্ষের প্রথম দিনে মঠে যথারীতি একটা বিশাল ভিড় জমে

গিয়েছিল। বেরিয়ে আসবার সময় হুয়াঙ-ফু তাঁর প্রাক্তনা স্ত্রীকে দেখতে পেলেন একজন লম্বা লোকের সঙ্গে। তারা হুয়াঙ-ফুকে দেখে নি, সুতরাং হুয়াঙ-ফু বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলেন, অনিচ্ছুকভাবে একজন মাটির পুতুল-বিক্রেতার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। সোপান বেয়ে দুজনকে নামতে দেখেই তিনি ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করলেন, এবং রাগ ও ঈর্ষায় কাঁপতে থাকলেন।

তারপর প্রধান দরোজা পর্যন্ত দুজনকে অনুসরণ করলেন, এবং চুনমিকে পেছন থেকে নাম ধরে ডাক দিলেন। চুনমি ঘুরে দাঁড়াল, এবং চেনামাত্র পা বাড়াবার উদ্যোগ করল। ভীষণ কদর্য আর রোগা, এবং মুখের ওপর বিষণ্ণ ব্যথিত চাহনি—যা একেবারেই নতুন।

'ও, তুমি।' চুনমি বিরক্ত ও ঘৃণাসূচক স্বরে চিৎকার করে উঠল। চুনমির কণ্ঠস্বর এবং ভাবভঙ্গি তাঁর বাধ্য বিনীত স্ত্রীর থেকে এতোই আলাদা যে এক মুহূর্তের জন্যে তিনি ভাবলেন হয়তো অন্য কাউকে ভুল করে চুনমি বলে মনে করেছেন।

'চুনমি, এখানে তুমি কি করছ? বাড়ি এসো, আমি তোমাকে চাই।' হাঙয়ের দিকে এক পলক চেয়ে হুয়াঙ-ফু বললেন।

'আপনি কে?' হাঙ জানতে চাইল, 'এই মহিলাকে বিরক্ত করা থেকে বিরত হতে আপনাকে অনুরোধ করছি।' চুনমির দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, 'এই লোকটা তোমার কে?'

'ও আবার প্রাক্তন স্বামী.' সে বলল।

'ঘরে ফিরে এসো চুনমি। আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি। আমি নিঃসঙ্গ। আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম।' হুয়াঙ-ফুর কণ্ঠস্বরে বিলাপ ফুটে উঠল।

'ও নিশ্চয় এখন আর তোমার স্বামী নয়,—তাই না?' চোখের ওপর চোখ নিবদ্ধ করে হাঙ সঙ্গিনীকে প্রশ্ন করল।

চুনমি হাঙয়ের দিকে চাইল। এবং উত্তরে বলল, 'না'।

'তোমার সঙ্গে এক মুহূর্ত কথা বলতে পারি কি?' হুয়াঙ-ফু তাকে

আবার জিজ্ঞাসা করল। চুনমি হাঙয়ের দিকে চাইল আবার, সে ঘাড় নাড়ল, এবং একপাশে দাঁড়িয়ে থাকল।

'তুমি কি চাও হাঙ?' চুনমি জিজ্ঞাসা করল। তার কণ্ঠস্বর হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল।

'তোমার সঙ্গের লোকটা কে?'

'আমার ব্যাপারে নাক গলাবার তোমার কোন অধিকার আছে কি? তার কণ্ঠস্বর তিক্ত হয়ে উঠল।

'অতীতের কথা মনে করে,' হুয়াঙ প্রার্থনা জানালেন, 'ঘরে ফিরে এসো। আমি তোমাকে চাই।'

চুনমি একটু এগিয়ে গেল কাছে। তার চোখ জ্বলে উঠল এবং সে গলা উচ্চগ্রামে তুলে বলল, 'ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাক। তুমি আমাকে চাও নি। আমি তোমাকে বলেছিলাম যে আমি নির্দোষ। তুমি বিশ্বাস করোনি, এবং আমি বাঁচব কি মরব গ্রাহ্য করোনি।' তুমি বলেছিলে তোমার কিছু করবার নেই। সৌভাগ্যক্রমে আমি মরিনি। এবং এখন আমি যা করছি তাতে তোমার মাথাব্যথার দরকার নেই।'

হুয়াঙ-কুর মুখের ভাব বদলে গেল। হঠাৎ তিনি তার হাত দুটো শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন, এবং সে নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করতে লাগল প্রাণপণ, চেঁচাতে থাকল, 'আমাকে ছেড়ে দাও! আমাকে ছেড়ে দাও!'

প্রাক্তন স্বামী এমন হতবাক হয়ে গেলেন যে তার মুঠো আলগা হয়ে এল। সে হাঙয়ের কাছে ছুটে গেল।

'ওকে একা থাকতে দাও,—ব্যাটা পাষণ্ড!' হাঙ চেঁচিয়ে উঠল।

সে চুনমির হাত ধরল, এবং আর কোনো বাক্যব্যয় না-করে হাঁটতে লাগল।

হুয়াঙ-কু নির্বাক হয়ে একা দাঁড়িয়ে থাকলেন।

যখন তারা পথ বেয়ে নেমে গেল, তাদের পেছন থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল: 'কিন্তু আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি চুনমি। আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি!'

পাথর-প্রতিমা

চিঙপেন টুঙস্ত শিয়ায়োঙয়ো

[চিঙপেন টুঙস্ত শিয়ায়োঙয়ো-তে সঙ্কলিত **The Jade Goddess** নামক গল্প অবলম্বনে রচিত। মূল গল্পটির সমাপ্তি ভিন্ন রকম। ভাস্করের স্ত্রীকে আবিষ্কার করেন একজন সচিব—জীবন্ত অবস্থায় যাকে বাগানের ভেতর কবর দেওয়া হয়। কিন্তু প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে সে প্রেতমূর্তিতে হাজির হয়। গল্পটি সম্ভবত দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল।]

ইয়াঙজে-গিরিসংকট পর্যন্ত যাত্রাপথ ছিল বিপদসঙ্কুল এবং রোমাঞ্চকর, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি চেঙটু-র নিকটবর্তী মফস্বল শহরে অবসরপ্রাপ্ত গভর্নরের বাড়ি এসে পৌঁছলাম। গভর্নর একজন প্রখ্যাত শিল্প-সংগ্রাহক, এবং জনশ্রুতি এই যে, যখন ক্ষমতায় আসীন ছিলেন, তখন তিনি মূল্যবান শিল্প-সংগ্রহের জন্যে তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগেও কোনোরকম কার্পণ্য করেন নি। কোনো একটা ব্রোঞ্জমূর্তি বা চিত্র—যা তিনি সংগ্রহ করতে চেয়েছেন, টাকা-পয়সা দিয়ে হোক বা অন্য যে-কোনো উপায়েই সেই বস্তুটি সংগ্রহ করেছেন। বাস্তবিকপক্ষে সাঙ যুগের একটা ব্রোঞ্জমূর্তি বিক্রি করতে অস্বীকার করায় তিনি যে একটি পরিবারেরই সর্বনাশ করেছিলেন এই গল্প সত্যি না-ও হতে পারে, কেন-না এটা গুজব : তবে দুর্লভ শিল্পবস্তু সংগ্রহ যে তাঁর একটা প্রবল বাতিকে পরিণত হয়েছিল সে-কথা সকলেরই জানা। ফলে, তাঁর সংগ্রহশালায় এখন কতকগুলি অমূল্য সম্পদ স্থান পেয়েছিল যা সত্যিই দুর্লভ।

তিনখানি চতুষ্ক-ক্ষেত্রের পর পশ্চিম-দুর্গের একতলায় বৈঠকখানায় গভর্নর আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। একজন প্রখ্যাত শিল্প-সংগ্রাহকের এরকম একটা শিল্পসামগ্রীবিহীন বৈঠকখানা দেখলে স্বভাবতই

অবাক লাগে, কিন্তু বৈঠকখানাটি লোহিত-কাষ্ঠের আসবাবে সুসজ্জিত, লাল গদি এবং চিতাবাঘের চামড়ায় সুশোভিত। গৃহসজ্জায় সরল আভিজাত্য এবং পরিশীলিত ও উৎকৃষ্ট রুচিবোধের ছাপ ছিল। তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় আমি বাগানমুখো একটা জানলার ওপরে রাখা একটি প্রাচীন ফুলদানি এবং একগুচ্ছ কিশমিশ ফুলের শাখার দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে ছিলাম।

আমি বিস্মিত হয়েছিলাম তাঁর বিশাল চেহারার মধ্যেও এক আশ্চর্য নম্রতা লক্ষ্য করে। হয়ত বার্ধক্য তাঁকে এতোটা নমনীয় করেছে, কিন্তু তাঁকে দেখে তাঁর নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে যে গুজব আছে তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। তিনি এমনভাবে আমার সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন যে মনে হয় আমি যেন তাঁর কোনো পুরনো বন্ধু, প্রাতঃকালীন মজলিসে যোগ দেওয়ার জন্যেই হঠাৎ এসে পড়েছি। আমি জানতে চাইলাম আমার যে-বন্ধু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেছে সে তাঁকে আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্বাহ্নে কিছু জানিয়েছে কিনা, অথবা বার্ধক্যহেতু গভর্ণর তা আদপেই বিস্মৃত হয়েছেন।

আমি এই ভদ্রলোকের প্রতি ঈর্ষা বোধ করলাম এই জন্যে যে সব মিলিয়ে নিজের সম্পর্কে যে বিশ্বাস তিনি প্রকাশ করলেন তা হল এই যে এই সুন্দর বিশ্রামাগারে বেঁচে থাকতে পারলেই তিনি অপরিসীম সুখী—এই সুখের বিশ্রমাগারে,—যা তিনি নিজের জন্যেই নির্মাণ করেছেন।

খুব মার্জিতভাবে আমি তাঁর বিখ্যাত সংগ্রহের কথা উল্লেখ করলাম।

'ও', মৃদু হেসে তিনি বললেন, 'আজ ওগুলি আমার, কিন্তু পরের এক শতকে ওগুলির মালিক হবেন অন্য কেউ। আপনি দেখবেন একই পরিবারের হাতে একশ বছরের বেশি কোনো একটি শিল্প-সংগ্রহশালার মালিকানা ন্যস্ত থাকে না কখনো। ওই বস্তুগুলির নিজেদেরও একটা ভাগ্য থাকে। তারা আমাদের দেখে এবং বিদ্রূপ

করে।' তাঁর কথাবার্তায় এক আশ্চর্য সজীবতা লক্ষ্য করলাম। এবার তিনি ঠোঁটের ফাঁকে একটা পাইপ রাখলেন।

'আপনি কথাটা বিশ্বাস করেন?'

'নিশ্চয়ই, মুখ থেকে পাইপটা না সরিয়ে তিনি বিড়বিড় করে বললেন।

'আপনি কি অর্থে কথাটা বললেন জানতে পারি কি?' আমি নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করলাম।

'যে কোনো বস্তু—যা সত্যিকার প্রাচীন, তা একটি ব্যক্তিত্ব এবং একটি জীবনও অর্জন করে।'

'অর্থাৎ আপনি বললে চান যে সেই বস্তু চেতনা লাভ করে?'

'চেতনা কি?' প্রতি-প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধ লোকটি। 'এ তাই—যা জীবনের বার্তা দেয়, জীবনের জন্ম দান করে। একটা শিল্পবস্তুর কথাই ধরুন। একজন শিল্পী এর ভেতরে তার কল্পনাকে রূপ দেয়, তার নিজের জীবনের রক্ত দিয়ে নির্মাণ করে, যেমন মা তাঁর গর্ভস্থ ভ্রূণকে রক্ত দিয়ে প্রতিমুহূর্তে গড়ে তোলেন। যখন শিল্পীর আত্মা তার ভেতর প্রবিষ্ট হয়—এবং তাকে জন্ম দিতে গিয়ে যখন শিল্পীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে, তখন তার মধ্যে যে জীবন আছে তাতে বিস্মিত হওয়ার কি আছে? উদাহরণস্বরূপ আমার ক্ষমাপ্রতিমা[১] জেড-দেবীর কথাই ধরুন।'

আমার ইচ্ছা ছিল কিছু পাণ্ডুলিপি দেখা। আমি জেড-দেবীর কথা শুনি নি কখনো, হয়তো কম লোকই শুনেছেন। কিন্তু আমার লক্ষ্যহীন প্রশ্নে আমি একটি অদ্ভুততম গল্প শোনার সুযোগ পেয়ে গেলাম, এরকম গল্প আমি কমই শুনেছি। জেড-দেবীর কথা উল্লেখ করে এবং যে-অদ্ভুত পরিস্থিতিতে জেড-দেবীর মূর্তি নির্মিত হয়েছিল তা বিবৃত করে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছিলেন তা আমি

১. সবুজ খণ্ড প্রস্তর; বিশ্বাস এই যে জেড-পাথরের দ্বারা মূত্রাশয়-সম্বন্ধীয় শূলবেদনার উপশম হয়।

নিশ্চিত করে বলতে পারব না। তবে পাণ্ডুলিপি-পরীক্ষার সময়ে আমি অনবরত ওই একটি বিষয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করেছিলাম।

পুরনো পাণ্ডুলিপির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমি বললাম, 'একথা সত্যি যে, শিল্পী তাঁর সৃষ্টির ভেতরে ব্যক্তিত্বের ছাপ রেখে যান, এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও তা অমর হয়ে থাকে।'

'হ্যাঁ, যা ভালো এবং সুন্দর তা চিরকাল বেঁচে থাকে। শিল্পীর সৃষ্টি তাঁর সম্ভতিবিশেষ।' দৃঢ়তার সঙ্গে গভর্নর উত্তর দিলেন।

'বিশেষত শিল্পীকে যখন তাঁর সৃষ্টিকর্মের জন্যে মৃত্যু বরণ করতে হয়', আমি জুড়ে দিয়ে বললাম, 'আপনার জেড-দেবীর মতো।'

'ওটা একটা ব্যতিক্রম। সেই শিল্পী এই কারণেই মরেছেন এমন নয়। কিন্তু তিনি তার পরেই মারা গেছেন।' একটু থেমে তিনি বললেন, 'এই শিল্পীর জীবনের ঘটনাগুলো যদি আপনি বিচার করে দেখেন তাহলে আপনার একথাই মনে হবে যে তিনি এই শিল্পকর্মের জন্যেই জন্মেছিলেন এবং এর জন্যে মৃত্যুবরণও ছিল তাঁর বিধিলিপি। অন্যভাবে তিনি এই জিনিসটি সৃষ্টি করতে পারতেন না।'

'নিশ্চয় অসাধারণ শিল্পকর্ম এটি। আমি দেখতে পারি কি?'

কুশলী ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গভর্নর ওই মূর্তিটি দেখাতে সম্মত হলেন।

দুর্গগৃহের একতলায় বহু মূল্যবান ও শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শনগুলি রাখা হয়েছিল, কিন্তু জেড-দেবীর মূর্তিটি রাখা হয়েছিল সর্বোচ্চ তলে।

'শিল্পীর নাম কি?'

'এক ব্যক্তি, নাম চ্যাং পো, পৃথিবীতে কেউ তাকে বিশেষ চেনে না। আমি প্রভাত-কনভেণ্টের মঠাধ্যক্ষার কাছে প্রথম ওর নাম শুনি। বেশ কিছুটা জমি আমি মঠকে দান করেছিলাম। সেই সূত্রে ওই চতুর বৃদ্ধা মঠাধ্যক্ষার সঙ্গে আমার পরিচয়,—তখনো তিনি মঠের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন নি। ঘটনাটা ঘটেছিল যে-সন্ন্যাসিনী এটার (এই মূর্তিটির) মালিক তাঁর মৃত্যুর পর। কনভেণ্টে যে-রকম যত্নে এটাকে রক্ষণা-

বেক্ষণ করা হত, এখানে নিশ্চয় তার চেয়ে অনেক বেশি যত্ন নেওয়া হচ্ছে।'

মাঝে মাঝে সবুজ টান-দেওয়া আশ্চর্য সাদা ও উজ্জ্বল একটি ছোট্টো প্রতিমূর্তি। সর্বোচ্চ তলে মধ্যস্থানে একটি কাঁচের আধারের মধ্যে মূর্তিটি রাখা আছে। চারপাশে শক্ত ও নমনীয় লোহার জাফরি —এতো ভারি যে কেউ নড়াতে পারবে না।

'মূর্তিটির চারপাশে একটু ঘুরে বেড়ান,' গভর্নর বললেন, 'দেখবেন —সব সময় সে আপনার দিকে তাকিয়ে আছে।'

যেভাবে তিনি প্রতিমূর্তিটিকে উল্লেখ করলেন তাতে বোঝা গেল না মূর্তিটি কোনো জীবিত নারীর কিন্তু এ-তে আমি কিছুটা বিরক্তি বোধ করলাম, এবং সত্যিসত্যিই, আমি যখন জেড-মূর্তিটির চারপাশ পরিক্রমা করছিলাম তখন যেন ওই মূর্তিটির চোখগুলি আমাকে অনুসরণ করছিল, এবং আমি অদ্ভুত ধরনের—একটু অলৌকিক অনুভূতি বোধ করছিলাম।

মূর্তিটি করুণরসব্যঞ্জক। কোনো এক নাটকীয় মুহূর্তই যেন এই উড্ডীয়মান প্রতিমূর্তিটির ভাবভঙ্গির ভেতর দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল। ডান হাতটা ওপরের দিকে তোলা, মাথাটা পেছনের দিকে ঘোরানো, এবং বাঁ হাতটা সামনের দিকে ঈষৎ প্রসারিত। মূর্তিটির ভেতর দিয়ে এই ভাবটিই প্রকাশ পাচ্ছে; যেন—যে ব্যক্তিকে এই নারী ভালোবাসত তার দ্বারাই সেই দৈহিক ভাবে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে সুদূরে সরে গেছে। যেভাবে এই মূর্তিটির হাত দুখানি প্রসারিত তা দেখে তাকে হয়ত স্বর্গগামিনী দয়াদেবী বলে বর্ণনা করা যেতে পারত, কিন্তু যে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখবে তার পক্ষে এরকম ব্যাখ্যা মেনে নেওয়া সম্ভব হবে না। অবিশ্বাস্য ঠেকে যে, কীভাবে মাত্র আঠারো ইঞ্চির এই মূর্তিটি এমন জীবন্ত করে এবং এমন অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা দিয়ে শিল্পী রচনা করেছিল। মূর্তিটির পোশাকের ভাঁজগুলোতে পর্যন্ত অভিনবত্বের ছাপ। সত্যই এটি একটি স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব সৃষ্টি।

'সন্ন্যাসিনী কীভাবে এই মূর্তিটির মালিক হয়েছিলেন?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'মূর্তিটির সামগ্রিক ভঙ্গিমা লক্ষ্য করুন—ঠিক যেন উড্ডয়নের ভঙ্গিমা। এবং চোখে প্রেম, ভয় এবং বেদনার বিমিশ্র প্রকাশ।' তিনি থামলেন। 'চলুন, নিচে যাই', হঠাৎ তিনি বললেন, 'আমি আপনাকে পুরো গল্পটা শোনাতে চাই।'

সন্ন্যাসিনী—মীলান যাঁর নাম, মৃত্যুর আগে তিনি পুরো বৃত্তান্তটি বিশ্বস্তভাবে বিবৃত করে গেছেন। সন্ন্যাসিনী হয়ত পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে নিখুঁত কাহিনীটি বলতে পারেন নি এবং গল্পটিকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যে হয়ত তিনি কিছুটা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলেছেন। কিন্তু গভর্নর কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পরীক্ষা করে দেখেছেন, এবং স্বয়ং সে-সবের সত্যতা যাচাই করেছেন। মঠাধ্যক্ষার জবানি অনুসারে সন্ন্যাসিনী সর্বদা নিজেকে গুছিয়ে গুটিয়ে রাখলেও তিনি যে একজন শিক্ষিতা ও বিদুষী মহিলা ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মৃত্যুশয্যায় শয়ানের পূর্বে কখনো কারো কাছে নিজের সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেন নি।

একশো বছর আগেকার কথা। মীলান তখন তরুণী, কায়ফঙে বড়ো বাগানবাড়িতে এই সুখী তরুণীটি বাবা-মার সঙ্গে বাস করত। উচ্চপদস্থ কর্মচারী চাঙয়ের একমাত্র কন্যা বলে খুব আদুরে। বাবা একজন দুঁদে বিচারক, কিন্তু মেয়েকে তাঁর সব স্নেহ উজাড় করে দিয়েছিলেন। এসব ক্ষেত্রে যেমনটা ঘটে—কিছু সংখ্যক জ্ঞাতি-আত্মীয় ধনী আত্মীয়েরা প্রাসাদে এসে বসবাস করতে থাকে, তাদের মধ্যে যারা অল্পবিস্তর শিক্ষিত তারা সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত হয়, এবং অশিক্ষিতেরা বাড়িতে চাকরবাকরের কাজে লেগে পড়ে, চ্যাঙের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি।

একদিন তাঁর বাড়িতে দূরসম্পর্কীয় এক ভাইপো এসে উপস্থিত।

ছেলেটার নাম চ্যাঙ পো, ষোলো বছরের বুদ্ধিমান প্রাণবন্ত উৎসাহী ছেলে। বয়সের তুলনায় আকারে লম্বা এবং গ্রামের ছেলে হিসেবে তার দুই হাতের চমৎকার সরু সরু আঙুলগুলো খুবই লক্ষণীয় ছিল। তার সম্পর্কে চ্যাঙ পরিবারের ধারণা এতো ভালো হয়ে উঠল যে মীলানের মা অতিথিদের আপ্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি তাকেই দিয়ে দিলেন, যদিও চ্যাঙ পো পড়তে বা লিখতে কিছুই জানে না।

সে মীলানের চেয়ে এক বছরের বড়ো, এবং যেহেতু দুজনে এখনো ছেলেমানুষ, সেহেতু তারা প্রায়শঃ একসঙ্গে মেলামেশা করত, হাসিঠাট্টা গালগল্প করত। চ্যাঙ পো মীলানকে গাঁয়ের গল্প বলত, মীলান সে-সব গল্প শুনতে খুব ভালোবাসত। কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই চ্যাঙ পো সম্পর্কে চ্যাঙ-পরিবারের আবেগ অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পড়ল। একটু অদ্ভুত এবং অনমনীয় স্বভাবের ছেলে সে। চাকর হিসেবে খুব সুবিধের তা বলা যায় না, বেশির ভাগ সময় কাজ ভুল করত, অনেক সময় কাজের কথা মনেই থাকত না। কিন্তু ভুল করলে কেউ বকা-ঝকা করলে যে চুপচাপ সয়ে যাবে তেমন ধাতের ছেলে সে ছিল না। এবং সেইজন্যে মীলানের মা তাকে বাগান তদারকির কাজ দিলেন। এই কাজটা সত্যিই তার মনে ধরল, বেশ মনোযোগের সঙ্গেই সে বাগানের তদারকি করে যেতে লাগল।

চ্যাঙ পো প্রতিভাবান, জন্মসূত্রে সৃজনীশক্তির অধিকারী। লোকের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে নয়, নতুন কিছু সৃষ্টি করতেই সে পৃথিবীতে এসেছে। বাগানের গাছপালা ফুল ইত্যাদি নিয়ে সে পরিপূর্ণ সুখী এখন। গাছপালার ভেতর দিয়ে নিজের মনে শিস্ দিতে দিতে সে বেড়ায়, যেন এই বিশ্বজগতের সে-ই খোদ মালিক। অবসর সময়ে অদ্ভুত সব জিনিস তৈরি করে। শিক্ষক ছাড়াই নিজেকে ইচ্ছেমতো শিক্ষিত করে তোলে। তৈরি করে আশ্চর্য সব লণ্ঠন এবং জীবন্ত সব মাটির প্রাণীমূর্তি।

আঠার বছর বয়েসেও চ্যাঙ পো আগেকার মতোই অপদার্থ রয়ে

গেল। মীলানের কিসে যে সে এতো আকর্ষণবোধ করে, ঠিক করে নিজেও সে বুঝে উঠতে পারে না। সত্যিই সে ভিন্ন প্রকৃতির, আর দিনে দিনে বেশ লম্বা আর সুন্দরও হয়ে উঠল সে। চ্যাঙ-পরিবারের থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলেও একমাত্র বাবা ছাড়া বাড়ির আর সকলে চ্যাঙ পোকে ভালোবাসত। স্বাভাবিকভাবেই এই দুই মাসতুতো-পিসতুতো ভাইবোনের মধ্যে বেশ গভীর সদ্ভাব ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যদিও দুজনেরই উপাধি এক বলে তাদের মধ্যে বিয়ের সম্ভাবনা একেবারেই ছিল না।

একদিন, হঠাৎ, কর্ত্রীকে চ্যাঙ পো জানাল যে সে ব্যবসাবাণিজ্য শিক্ষা করতে অন্যত্র কোথাও চলে যাবে। সে এক ব্যক্তির দোকানে তার অধীনে জেড-পাথরের মূর্তি তৈরির কাজ শিখতে যাবে। মা ভাবল, ভালোই হবে ; কেন না, মীলানের সঙ্গে চ্যাঙ পো ক্রমশই খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছিল। কিন্তু চ্যাঙ বাড়ি ছেড়ে চলে গেল না, রাত্রিবেলা কাজ থেকে ফিরে আসে। এখন থেকে বোনের সঙ্গে তার কথা যেন ফুরতে চায় না।

'মীলান', একদিন মা বলল, 'তোমাদের দুজনেরই এখন বয়েস হয়েছে ; পো যদিও তোমার জ্ঞাতি-ভাই, তবু এতো ঘন ঘন এবং ঘনিষ্ঠভাবে তার সঙ্গে মেলামেশা করা তোমার উচিত নয়।'

মায়ের কথা মীলানকে খুবই ভাবিয়ে তুলল। সে কখনো ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারে নি যে, চ্যাঙকে সে ভালোবাসে।

সেই রাত্রে সে বাগানে চ্যাঙের সঙ্গে দেখা করল, লজ্জায় গাল লাল করে বলল, 'ভাই, পো, মা বলেছে তোমার সঙ্গে বেশি না মিশতে, কিংবা বেশি কথা না বলতে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। আমরা এখন উপযুক্ত হয়েছি।'

মেয়েটি মাথাটা নিচু করে বলল, 'তার মানে?' অনেকটা স্বগতোক্তির মতো শোনাল তার কণ্ঠস্বর।

চ্যাঙ পো তার কোমরটা এক হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, 'এর মানে—

তোমার মধ্যে এমন কিছু আছে যা দিন দিন তোমাকে আমার কাছে আকর্ষণীয় করে তুলছে,—এমন কিছু যা তোমাকে দেখার জন্যে আমাকে ব্যাকুল করে তুলছে,—এমন কিছু যা তুমি কাছে এসে আমাকে সুখী করে তোলে এবং চলে গেলে আমাকে নিঃসঙ্গ ও দুঃখিত করে তোলে।

মেয়েটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এখন তুমি সুখী?'

'হ্যাঁ, এবং সবকিছুই এখন আমার ভালো লাগছে। মীলান, তুমি আমার, আর আমি তোমার।' সে খুব নরম নিবিড় স্বরে বলল।

'তুমি বেশ ভালো করেই জানো যে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে না, এবং বাবা-মা অনেক আগে থেকেই আমার জন্যে পাত্র ঠিক করে রেখেছেন।'

'ওকথা বলো না, কখ্খনো মুখেও এনো না অমন কথা।'

'কিন্তু তোমাকে যে বুঝতেই হবে গো।'

'আমি কেবল এই বুঝি', মীলানকে দুটি বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে চ্যাঙ বলল, 'যেদিন স্বর্গ এবং মর্ত্তের সৃষ্টি হয়েছে, সেদিন থেকেই তুমি আমার—আমি তোমার। আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি না। তোমাকে ভালোবাসা কোনো অপরাধই নয়।'

মীলান তার বাহুপাশ থেকে মুক্ত হয়ে নিজের ঘরের দিকে ছুটে পালিয়ে গেল।

বয়ঃসন্ধিকালে তরুণ-তরুণীর ভালোবাসা এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। যখন দুজনেই ভালোবাসার স্বাদ উপলব্ধি করতে শেখে, তখন অপ্রাপ্তির বেদনা তীক্ষ্ণ মাধুর্যে উদ্বেল হয়ে ওঠে। সে-রাত্রে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে মীলান মায়ের কথাগুলোই ভাবছিল, তারপর চ্যাঙের কথাগুলো। সেই রাত্রি থেকেই মীলান পুরোপুরি পাল্টে গেল। কিন্তু চ্যাঙ ও মীলান চেষ্টা করেও ভালোবাসার প্রচণ্ড আবেগকে কিছু মাত্র দমন করতে পারে না। ভালোবাসার প্রবল শক্তির কাছে পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয়। অথচ পরস্পর দেখা-সাক্ষাতের চেষ্টা থেকেও বিরত হয়। কিন্তু তিন দিন পরে আবার মীলান নিরুপায়ভাবে চ্যাঙের

কাছে ফিরে আসে, এবং গোপনতা রক্ষা করতে গিয়ে দুজনের মানসিক উত্তেজনাও যথেষ্ট বেড়ে যায়।

তরুণ-তরুণীর বাসনা-কামনা, নম্র বেদনা, ক্ষণস্থায়ী বিচ্ছেদ এবং নবায়মান ক্ষমাপ্রার্থনার দিন সবই কেমন তিক্ত অথচ মিষ্ট, কিন্তু দুজনেই বুঝতে পারে যে তারা তাদের চেয়ে আরো শক্তিমান কোনো কিছুর দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়েছে।

তাদের কোনো পরিকল্পনা ছিল না। তারা কেবল ভালোবাসতে জেনেছিল। সেকালের রীতি অনুসারে, মীলানের বাবা-মা মীলানের জন্যে একের পর এক পাত্র ঠিক করে চলেছিল, কিন্তু মীলান কোনো বারই মনঃস্থির করতে পারল না। কখনো বলল সে আদপে বিয়েই করবে না, শুনে বাবা-মা ভীষণ আঘাত পেল। এখনো যথেষ্ট অল্পবয়স বলে বাবা-মাও খুব জেদাজেদি করতে রাজী ছিল না এবং বাবা-মায়ের একমাত্র মেয়ে বলে এতো তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে মেয়েকে দূরে পাঠাবার ইচ্ছাও তাঁদের ছিল না।

ইতিমধ্যে চ্যাঙ কাজকর্ম এবং শিক্ষানবিশি শুরুও করেছিল। জেড পাথরের কাজকর্মে চ্যাঙ তার স্বাভাবিক বিকাশের পথ খুঁজে পেয়েছিল। জন্মগত শিল্পপ্রতিভার অধিকারী চ্যাঙ। অল্প সময়ের মধ্যেই সে কাজকর্মে ও ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতি করল।

সে এই শিল্পকাজকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। নিরলসভাবে পরিশ্রম করত এবং প্রত্যেকটা কাজ নিখুঁত ভাবে সম্পূর্ণ করত। তার কাজে দোকানের মালিকও মুগ্ধ হয়ে গেল। সৌখীন অভিজাত ভদ্রলোকদের ভিড়ে দোকান সবসময় যেন গমগম করত।

একদিন মীলানের বাবা জন্মদিন উপলক্ষে সম্রাজ্ঞীকে একটি উপহার দেবেন বলে স্থির করলেন। তিনি বিশেষত্বমণ্ডিত এবং অভিনব এমন কিছু খুঁজছিলেন। তাঁর সংগ্রহে খুব উন্নত মানের দীর্ঘ একখণ্ড জেড-পাথর ছিল। চ্যাঙ পো যে-দোকানে কাজ করত, স্ত্রীর কথামতো তিনি সেখানে গেলেন, এবং তিনি কি চান তা ব্যাখ্যা করে বললেন।

স্থাপত্য শিল্পে চ্যাঙ পো-র নৈপুণ্য এবং বৈশিষ্ট্য দেখে তিনি খুবই বিস্মিত হলেন।

'বাবা, এটা একটা বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কাজ। সম্রাজ্ঞীকে উপহার দেওয়ার জন্যে এই কাজটি তোমাকে দিয়ে করাতে চাই। তুমি যদি ভালো কিছু করতে পারো, জেনো, তোমার ভাগ্যও খুলে যেতে পারে।' তিনি চ্যাঙকে বললেন।

চ্যাঙ পো জেড-পাথরটি পরীক্ষা করে দেখল। মসৃণ পাথরটায় আলতোভাবে হাত বুলিয়ে নিল। খুশিতে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। স্থির হল যে, এই পাথর দিয়ে সে ক্ষমাদেবী কুয়ান য়িনের প্রতিকৃতি তৈরি করে দেবে। চ্যাঙ মনে মনে ঠিক করে নিল সে এমন এক অপার্থিব সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি তৈরি করবে যা মানুষ আগে কখনো চোখেই দেখে নি।

মূর্তি তৈরি শেষ না হওয়া পর্যন্ত চ্যাঙ পো কাউকে তা দেখতে দিল না।

শেষ হলে দেখা গেল প্রচলিত দেবীমূর্তি ধাঁচেই তৈরি, কিন্তু এটি একটি সত্যিকার শিল্পকর্ম, নম্র সৌন্দর্যে এটি অতুলনীয় ও অনন্য। চ্যাঙ পো যা করেছে অন্য কারিগরেরা ইতিপূর্বে তা ভাবতেও পারে নি; দেবীর কানে সহজভাবে ঘুরতে পারে এমন একজোড়া দুল পরিয়ে দিয়েছে: দুই কানের লতি এতো পাতলা এবং সুন্দর যে প্রশংসা না করে থাকা যায় না। দেবীর মুখখানি ঠিক তার প্রিয়তমা মীলানের মুখের মতো।

স্বভাবতই সচিব খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। রাজপ্রাসাদেও এই প্রতিমূর্তির কোনো জোড়া মিলবে না, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত।

'মুখটা কিন্তু অবিকল মীলানের মতো', বাবা মন্তব্য করলেন।

'হ্যাঁ,' চ্যাঙ পো গর্বের সঙ্গে উত্তর দিল, 'সেই আমার অনুপ্রেরণা।'

'বেশ। যুবক, এখন থেকে তোমার ক্রমোন্নতি প্রায় অবধারিত।' চ্যাঙকে তিনি মুঠো ভর্তি করে অর্থ দিলেন এবং বললেন, 'এই রকম

একটা সুযোগ দেওয়ার জন্যে আমার প্রতি তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।'

এইভাবে চ্যাঙ পোর নামযশ হল। কিন্তু তার কাছে যে প্রাপ্তি ছিল সবচেয়ে দুর্লভ, তা সে পাচ্ছিল না। মীলানকে না পাওয়ায় কিছুই যেন তার পাওয়া হচ্ছিল না। মীলান ছাড়া কোন্ পুরস্কারই-বা সে চায়?

ক্রমে যুবকটি উপলব্ধি করল তার সবচেয়ে বড়ো আকাঙ্ক্ষা তার ক্ষমতার দ্বারা লভ্য নয়। অথচ সেই আকাঙ্ক্ষা না মিটলে বেঁচে থেকে কী হবে? চ্যাঙ পো দিন দিন কাজে অমনোযোগী হয়ে উঠল। কাজ করতে কোনো উৎসাহ বা আনন্দই সে পায় না। লোভনীয় সব বায়না সে বাতিল করে দেয়। পাছে মালিক হতাশ হয়ে পড়ে এইজন্যে কেবল খুশি করার জন্যেই তাকে কাজ করতে হয়।

মীলান এখন একুশ বছরের যুবতী, এখনো তার বাগ্‌দান হয় নি,—সমাজের চোখে খুবই নিন্দনীয় বিষয়। প্রভাবশালী এক পরিবারে তার বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেল। মীলান কিছুতেই বাবা-মাকে নিরস্ত করাতে পারল না, উপহার দেওয়া-নেওয়ার ভেতর দিয়ে একদিন বাগ্‌দানও হয়ে গেল।

নৈরাশ্যে বেপরোয়া হয়ে যুবতী শেষ পর্যন্ত চ্যাঙের সঙ্গে পালিয়ে যাবে ঠিক করল। চ্যাঙ যে তাকে উপায় করে খাওয়াতে-পরাতে পারবে সে সম্পর্কে সে স্থির নিশ্চিত ছিল। তবু যতদিন কোনো ছিল্লে না হয় ততদিন তো চালাতে হবে। ভাবল: কিছু সোনাদানা সঙ্গে নিয়ে কোনো দূর প্রদেশে চলে গিয়ে দুজনে আপাতত কোথাও আত্মগোপন করে থাকবে। তার পরে ভাগ্যে যা আছে তা-ই হবে।

একদিন রাত্রিবেলা বাগানের পেছন দিকের পথ দিয়ে পালিয়ে যাবে বলে মীলান ও চ্যাঙ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে একজন চাকর তাদের দেখে ফেলে, এবং তার মনে সন্দেহ জাগে। বাড়ির কেউ ব্যাপারটা আঁচ করতেও পারে নি। মনিবের পারিবারিক

সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে ভেবে চাকরটা পেছন থেকে চ্যাঙকে ধরে ফেলে এবং তাকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। চ্যাঙ চাকরটাকে ঠেলে ফেলে দেয়, কিন্তু চাকরটা তার হাতখানা ধরেই থাকে। তখন চ্যাঙ তাকে এক ঘুঁষিতে মাটিতে ফেলে দেয়। চাকরটা পাথরের বেদির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। এই সুযোগে দুজনে মুহূর্তে চম্পট দেয়।

পরদিন সকালে চ্যাঙ-পরিবার বাগানে চাকরটাকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে এবং আবিষ্কার করে যে তাদের মেয়ে মীলান চ্যাঙ পো-র সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। কেলেঙ্কারি যাতে প্রকাশ না পায় তার জন্যে বেশি হৈ চৈ করা বারণ, অথচ তা না করলে দুজনকে খোঁজাখুঁজি করাও সম্ভব নয়। সচিবমহাশয় নিরুপায় ক্রোধে একেবারে খেপে উঠলেন। 'আমি গোটা পৃথিবীটা চুঁড়ে বেড়াব', তিনি হুঙ্কার ছাড়লেন, 'এবং ওই হারামজাদাটাকে জেলে পুরে তবে ছাড়ব।'

রাজধানী থেকে পালিয়ে গিয়ে চ্যাঙ এবং মীলান কেবল চলতেই থাকে। শেষে বড়ো বড়ো শহর এড়িয়ে তারা ইয়াঙজে অতিক্রম করে দক্ষিণ চীনে গিয়ে পৌঁছয়।

'আমি শুনেছি কিয়ানসে খুব ভালো জেড-পাথর পাওয়া যায়,' চ্যাঙ মীলানকে বলে।

'তুমি কি আবার জেড-পাথরের কাজ করবে ভাবছ?' দ্বিধাগ্রস্তভাবে মীলান জিজ্ঞাসা করে, 'তাতে তুমি খুব সহজেই পরিচিত হয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত হয়ত ধরা পড়ে যাবে।'

'আমি মনে করি, আমরা সর্বদা সেই পরিকল্পনাই করেছি।' চ্যাঙ উত্তর দিল।

'তা করেছিলাম। তবে তা আমাদের চাকর তাই-য়ের মৃত্যুর আগে। ওঁরা মনে করবেন যে তাই-কে আমরাই খুন করেছি। তুমি অন্য কোনো কাজ করো—লণ্ঠন বা মাটির পুতুল তৈরি করো—যা তুমি আগে করতে।'

'কেন? জেড দিয়ে কাজ করাতেই আমার সুনাম হয়েছে।'

'তা হয়েছে। এবং যতো বিপদ সেখানেই।' মীলান বলল।

'এ নিয়ে আমাদের খুব দুর্ভাবনা করার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। রাজধানী থেকে কিয়াঙসের দূরত্ব প্রায় হাজার মাইল। কেউই আমাদের চিনতে পারবে না।'

'তাহলে তোমাকে তোমার মূর্তি তৈরির ঢং-টা পাল্টাতে হবে। আর ওগুলো বেশি তৈরি করে কাজ নেই। কেবল খদ্দের পাকড়াবার জন্যে কিছু কিছু তৈরি করো।'

চ্যাঙ পো ঠোঁট কামড়ে চুপ করে থাকল, কিছু বলল না। হাজার হাজার মাঝারি জেড-কারিগররা যা করে অপরিচয়ের অন্ধকারে নির্বাসিত হয়ে থাকছে তাতে কি সে সন্তুষ্ট থাকতে পারে? সে কি তার নিজের শিল্পিসত্তাকে ধ্বংস করবে—নাকি শিল্পিসত্তাই তাকে ধ্বংস করুক তাই সে মেনে নেবে? ভেবে কিছুই সে স্থির করতে পারল না।

মীলানের ধারণাই ঠিক। তার ভয়: সস্তা খেলো কাজ করা তার স্বামীর চরিত্রবিরুদ্ধ। সে এ-ও উপলব্ধি করল যে ইয়াঙজে অতিক্রম করার পর থেকেই এক রহস্যময়ী শক্তি কিয়াঙসে-র দিকে ক্রমাগতই যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে তার স্বামীকে। প্রাদেশিক রাজধানী হ্মান চাঙে থামতে তারা সাহস করল না এবং অবশেষে কিয়ানে গিয়ে পৌঁছল। মীলান আবার স্বামীকে তার বৃত্তি পরিবর্তন করতে অনুরোধ করল। কিয়াঙসে-তে খুব মিহি ধরনের সাদা চীনামাটি ও উৎকৃষ্ট চীনামাটির মূর্তি তৈরি হয়। চীনামাটির মূর্তি তৈরি করেও চাঙ তার শিল্পপ্রতিভাকে কাজে লাগাতে পারে। কিন্তু চ্যাঙ তাতে রাজী নয়।

'আর যদিই-বা আমি তা-ই করি', চ্যাঙ পো বলল, 'আমি চীনা-মাটি দিয়ে যে-সব প্রতিমূর্তি নির্মাণ করব সেগুলো দিয়েও আমাকে চেনা কঠিন হবে না। তুমি কি চাও আমি হাবিজাবি খেলো জিনিস

তৈরি করি? আমার সন্দেহ নেই যে এখানে আমি যদি জেড-পাথর দিয়ে কাজকর্ম করি কেউ আমাকে ধরে ফেলতে পারবে না।'

বাধ্য হয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মীলানকে হার মানতে হয়। মীলান বলল, 'কিন্তু প্রিয়তম, দয়া করে—আমার মুখ চেয়ে, তুমি সুনাম বা খ্যাতির জন্যে যেন লোভ করো না। তা যদি করো, আমাদের সর্বনাশ হবে।'

সে যা বিশ্বাস করে তা-ই বলল। কিন্তু সে এ-ও জানে যে তার শিল্পী-স্বামী যেমন-তেমন কাজে আদপেই সন্তুষ্ট থাকতে পারবে না, প্রতিভাবান শিল্পীরা তা কখনোই পারে না। তার অপূর্ব সৌন্দর্যবোধ পূর্ণতার প্রতি ভালোবাসা, সৃষ্টিকার্যে আত্মতৃপ্তি এবং জেড-পাথরের কাজের প্রতি অনুরাগ ইত্যাদি নিয়ে পুলিশ নয়—তার নিজের কাজ থেকেই সে সরে থাকতে পারে না। তার এই অবস্থার করুণ ভবিতব্য সে যেন আগে থেকে উপলব্ধি করতে পারে।

স্ত্রীর সোনাদানা বিক্রি করে চাঙ পো নানা ধরনের অমসৃণ পাথর কিনে নিজেই একটা দোকান দিয়ে বসল। মীলান কেবল তার স্বামীর কাজকর্ম একদৃষ্টিতে লক্ষ্য করে যায়।

'যথেষ্ট হয়েছে, প্রিয়তম', সে বলে, 'এর চেয়ে ভালো তার কেউ করতে পারবে না। আমার মাথা খাও, থামো।'

চাঙ পো তার দিকে তাকায় আর বিষণ্ণ হাসি হাসে। সে কতকগুলো দুল আর হারের লকেট তৈরি করতে শুরু করেছিল। কিন্তু জেড এমন আশ্চর্য পাথর যা স্বতন্ত্র একটা প্রকাশভঙ্গি ও নৈপুণ্য দাবি করে। হারের দুল তৈরি করার জন্যে একটা পাথর কেটে নষ্ট করার কোনো মানে হয় না? কেননা, সেই পাথরটা দিয়ে একটা সুন্দর প্রতিমূর্তি সৃষ্টি করা যায়। অনেকটা বাঁদরের পীচফল চুরি-করা মতোন। সুতরাং মাঝে মধ্যে চাঙ চোরের মতো লুকিয়ে-লুকিয়ে এবং অনেকটাই বিবেকের বিরুদ্ধে কিছু নিখুঁত, ও সুন্দর এবং মৌলিক প্রতিমূর্তি তৈরি করে। শিল্পপ্রীতির এইসব অনন্য সৃষ্টি খুব তাড়াতাড়ি বিক্রি

হয়ে যায় এবং তাতে সস্তা খেলো জিনিসগুলির চেয়ে যথেষ্ট লাভও হয়।

'প্রিয়তম, আমি ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠছি', মীলান স্বামীর সঙ্গে বিতর্ক শুরু করে দেয়, 'তুমি আবার ক্রমশ বিখ্যাত হয়ে পড়ছ। এদিকে আমিও সন্তানসম্ভবা। দয়া করে এখনো সাবধান হও।'

'সন্তান!' সে আনন্দে চিৎকার করে ওঠে, 'এখন আমরা একটা সম্পূর্ণ পরিবার!' চুম্বন করে চ্যাঙ পো তার স্ত্রীকে পুরস্কৃত করে।

'আমরা আর কিছুই চাই না,' মীলান মৃদুস্বরে বলে, 'বেশ সুখেই তো আছি আমরা।'

সত্যিই তারা সুখেই ছিল। এক বছরের ভেতর জেড-প্রতিষ্ঠান পাওহো-র খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। চ্যাঙ তার দোকানের নাম রেখেছিল পাওহো। এখানে সৌখীন অভিজাত ব্যক্তিরা ভিড় করে এসে জেড-পাথরের জিনিসপত্র ক্রয় করে। প্রাদেশিক রাজধানীতে যাওয়া-আসার পথে তারা পাওহো-তে একবার নেমে জেড-পাথরের কিছু জিনিস না কিনেই যায় না। কাজেই অল্প সময়ের মধ্যেই কিয়ান শহর জেড-পাথরের দৌলতে খুবই পরিচিত ও বিখ্যাত হয়ে উঠল।

একদিন এক ভদ্রলোক দোকানে ঢুকে চারপাশে জেড-পাথরের মূর্তিগুলোর ওপর চোখ বুলোতে-বুলোতে জিজ্ঞাসা করে বসল, 'আপনি কি কাইকেঙ-এর সচিবের আত্মীয় চ্যাঙ পো?'

চ্যাঙ সঙ্গে সঙ্গে অস্বীকার করে জানাল যে, 'সে কখনো কাইকেঙ-য়ে যায়ই নি।'

ভদ্রলোক সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে তাকে দেখেছিল, 'কিন্তু আপনার উচ্চারণে উত্তরাঞ্চলের বেশ ছাপ আছে। আপনি কি বিবাহিত?'

'তা জেনে আপনার লাভ কি?'

মীলান দোকানের পেছন থেকে উঁকি দিয়ে দেখল। লোকটা চলে গেলে চ্যাঙকে সে জানাল যে ওই লোকটা তার বাবার অফিসের

একজন কর্মচারী। হয়ত চ্যাঙ পো-র তৈরি জেড-পাথরের জিনিসপত্রই তাদের ডুবাতে বসেছে।

পরের দিন লোকটা আবার এল।

'আমি বুঝতে পারছি না আপনি কি চান,' চ্যাঙ পো বলল।

'ভালো কথা। আমি আপনাকে চ্যাঙ পো সম্পর্কে কিছু জিগ্যেস করতে চাই। খুন, সচিবের কন্যাকে ফুসলিয়ে বের-করে নিয়ে যাওয়া এবং তাঁর মণিমাণিক্য চুরির অভিযোগে পুলিশ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আপনি যদি আমাকে বিশ্বাস করাতে চান যে আপনি চ্যাঙ পো নন, তাহলে আপনি আপনার স্ত্রীকে শীগ্‌গির আমার জন্য এক পেয়ালা চা করে নিয়ে আসতে বলুন। যদি দেখি যে তিনি সচিবের কন্যা নন তাহলে আমি সুখী হয়েই ফিরে যাব।'

'আমি এখানে ব্যবসা করতে বসেছি। যদি আপনি ঝামেলা পাকাতে চান তাহলে আপনাকে এখনই এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে আমি অনুরোধ করব।'

লোকটা রহস্যজনক ভাবে হেসে উঠে চলে গেল।

উপায়ান্তর না দেখে তাড়াতাড়ি যন্ত্রপাতি, মূল্যবান জিনিসপত্র গোছগাছ করে নিয়ে তারা একটা নৌকা ভাড়া করে রাত্রির অন্ধকারে নদীপথে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়ল। তখন তাদের শিশুটির বয়স মাত্র তিন মাস।

হয়ত মানুষের দুর্মতির জন্যেই মানুষকে ভুগতে হয়, অথবা তার ভোগান্তির পেছনে নিয়তির অনিবার্য বিধানই হয়ত দায়ী,—কে বলতে পারে।

কানশিয়েনে পৌঁছে তাদের শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়ল, কাজেই যাত্রায় বিরতি দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকল না।

এদিকে এক মাস যাবৎ জলপথ যাত্রায় প্রায় সমস্ত অর্থই খরচ হয়ে গিয়েছিল। বাধ্য হয়ে চ্যাঙ পোকে তার সংগ্রহ থেকে একটা

অর্ধশায়িত অর্ধনিমীলিতচক্ষু কুকুরের অপূর্ব জেডমূর্তি বিক্রি করে দিতে হল ওয়াঙ নামে এক জেড-ব্যবসায়ীর কাছে।

'এ-ত দেখছি পাওহো-র জেড,' ব্যবসায়ী বলল, 'অন্য দোকানে এতো চমৎকার জেড পাওয়া কঠিন—একেবারে অনন্যুকরণীয়।'

'ঠিকই বলেছেন। পাওহো থেকেই আমি কিনেছিলাম।' চ্যাঙ পো বলল। অবিশ্যি তারিফ শুনে মনে মনে সে খুব খুশিই হয়েছিল।

উঁচু পর্বতের ওপর কানশিয়েন শহরটি অবস্থিত। শীতকাল। চ্যাঙ পো পরিষ্কার নীল আকাশ এবং পার্বত্য বায়ুর প্রেমে পড়ে গেল। চ্যাঙ পো ও মীলান এখানে থেকে যাওয়াই স্থির করল। শিশুটা অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। একটা নতুন দোকান খুলবে বলে চ্যাঙ মনস্থ করল।

কানশিয়েন বড়ো শহর। তারা ভাবল, এমন জায়গা ছেড়ে যাওয়া মূর্খামি। শহর থেকে বিশ মাইল দূরে তারা বাস করতে লাগল। চ্যাঙ পো তার সংগ্রহ থেকে আর একটি উৎকৃষ্ট জেডমূর্তি বিক্রি করে দিল।

'ওগুলো বিক্রি করছ কেন?' মীলান জিজ্ঞাসা করল।

'দোকান দেওয়ার জন্যে টাকার দরকার।'

'এবার আমার অনুরোধ রাখো', মীলান বলল, 'আমরা এখানে একটা মাটির পুতুলের দোকান দিই।'

'কেন—' চ্যাঙ পো অর্ধপথে থেমে গেল।

'আমার কথা গ্রাহ্য করো নি বলে একবার আমরা প্রায় ধরা পড়েই গেছলাম। জেডই তোমার সবকিছু? আমি এবং তোমার সন্তান কেউ নই? পরে যখন অবস্থা অনুকূল হয়ে উঠবে তখন না হয় আবার জেডের কাজ শুরু করো।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও চ্যাঙ পো মাটির পুতুলের দোকান দিল। সে কমসে-কম একশটি বুদ্ধমূর্তি তৈরি করল। কিন্তু ফি-হপ্তায় জেড-ব্যবসায়ীরা ক্যানটন যাওয়ার পথে যখন এই শহরে আসে তখনি

জেড-পাথর কিনে জেড-মূর্তি তৈরির জন্য চ্যাঙ ভীষণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। রাস্তায় রাস্তায় আপনমনে ঘুরে বেড়ায়, জেড-পাথর বিক্রেতার দোকানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, এবং অপরিসীম রাগে তার মাথা গরম হয়ে ওঠে। বাড়ি ফিরে এসে নিজের হাতে বানানো মাটির মূর্তিগুলো আঙুলের চাপে ভেঙে-গুঁড়িয়ে ছড়িয়ে দেয়।

'কাদা! আমি জেড দিয়ে কতো সুন্দর কাজ করতে পারি—তবে কেন আমি কাদার পুতুল তৈরি করব?'

মীলান তার চোখের আগুন দেখে ভয় পেয়ে যায়, বলে, 'জেডই তোমার সর্বনাশ করবে।'

একদিন জেড-ব্যবসায়ী ওয়াঙ চ্যাঙ পো-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করল এবং তাকে তার সরাইখানায় নেমন্তন্ন করল; তার আশা—যদি চ্যাঙ পো-র কাছে পাওহো-দোকানের আরো কিছু জেড মিলে যায়।

'আপনি কোথায় গেছলেন?' চ্যাঙ পো জিজ্ঞাসা করল।

'এই কদিন হলো—কিয়ান থেকে ঘুরে এলাম,' ওয়াঙ উত্তরে জানাল। একটা মোড়ক খুলে সে বলল, 'এই দ্যাখো, এখন পাওহো-দোকানে এই ধরনের জিনিস পাওয়া যাচ্ছে।'

চ্যাঙ পো চুপ করে থাকল। ওয়াঙ একটা বাঁদরের মূর্তি দেখাতে চ্যাঙ বিরক্তিসূচক শব্দ করে চেঁচিয়ে উঠল, 'নকল!'

'তুমি ঠিকই ধরেছ', ব্যবসায়ী নম্রভাবে বলল, 'বাঁদরের মুখে কোনোরকম প্রকাশভঙ্গি নেই। তুমি একজন সমজদারের মতো কথা বলেছ বটে।'

'হ্যাঁ, আমি জানি বলেই বলতে পেরেছি।' ওয়াঙ রূঢ় ভাবে জবাব দিল।

'হ্যাঁ। আমার মনে আছে তুমি আমাকে সেই আশ্চর্য হামাগুড়ি-দেওয়া কুকুরের মূর্তিটা বিক্রি করেছিলে। তোমার সামনে স্বীকার করতে আপত্তি নেই, আমি ওটাতে শতকরা একশ ভাগ লাভ করেছিলাম। ওই রকম জিনিস তোমার কাছে আর আছে?'

'আমি তোমাকে সত্যিকার পাওহোর-তৈরি বাঁদর দেখাতে পারি।'

দোকানে এসে চ্যাঙ কিয়ানে তৈরি-করা একটা পুতুল দেখাল। পুতুলটা বিক্রি করার জন্যে লোকটা চ্যাঙকে পেড়াপীড়ি করতে লাগল। পরের বার নানচিঙে গিয়ে ওয়াঙ বন্ধুদের খবর দিল যে দক্ষিণের একটা ছোটো শহরের সাধারণ দোকান থেকেই সে আজকাল দামী দামী অনেক উৎকৃষ্ট জেড-পুতুল কিনতে পায়, বলল, 'ভাবতে অবাক লাগে, ওই রকম একটা সাধারণ দোকানদারের দোকানে এতো সব চমৎকার মূর্তি আছে।'

মাস ছয়েক পরে তিনজন সৈন্য আজ্ঞাপত্র নিয়ে এল চ্যাঙ পো এবং কমিশনারের কন্যাকে গ্রেফতার করে রাজধানীতে ধরে নিয়ে যেতে। তাদের সঙ্গে কমিশনারের সেক্রেটারিও ছিল।

'আমি আপনাদের সঙ্গে যেতে পারি যদি আপনারা আমাকে আমার কয়েকটা দরকারি জিনিস গুছিয়ে নিতে সময় দেন।' চ্যাঙ বলল।

'এছাড়া আমাদের ছেলের জিনিসপত্রও সঙ্গে নেওয়া দরকার,' মীলান বলল, 'মনে রাখবেন আমার ছেলে স্বয়ং কমিশনারের নাতি। সে যদি পথে অসুস্থ হয়ে পড়ে তার জন্যে আপনারাই দায়ী হবেন।'

লোকগুলোর ওপর কমিশনারের আদেশ ছিল যে, পথে যেন তারা কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার না করে। চ্যাঙ পো এবং তার স্ত্রীকে বাড়ির ভেতর যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হল। সৈন্যেরা বাড়ির সামনে পাহারা দিতে লাগল।

বিদায়ের করুণ মুহূর্ত। চ্যাঙ পো স্ত্রী এবং ছেলেকে চুমু খেল, এবং জানলা দিয়ে নিচে লাফ দিল। এ জীবনে হয়ত আর কখনো স্ত্রী এবং ছেলের সঙ্গে দেখা হবে না।

'আমি তোমাকে ভালবাসব,' জানলার পাশে দাঁড়িয়ে নম্রস্বরে ফিসফিস করে বলল, 'কিন্তু কখনো জেডপাথর ছোঁবে না এই আমার অনুরোধ।'

চ্যাঙ শেষবারের মতো দীর্ঘস্থায়ী দৃষ্টি দিয়ে মীলানকে একবার দেখে নিল, তাকে চিরবিদায় জানানোর জন্য তার একটা হাত ওপরের দিকে উঠে এল একবার।

যখন চ্যাঙ চলে গেছে, মীলান শান্তভাবে দোকানঘরে ঢুকে কিছু কিছু জিনিস ব্যাগের মধ্যে ভরতে লাগল,—যেন সে কিছুই জানে না, কিছুই হয়নি। যখন সৈন্যদের মনে সন্দেহ দেখা দিল এবং তারা বাড়িময় খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিল, তখন চ্যাঙ অনেক দূরে চলে গেছে।

মীলান নিজের বাড়ি ফিরে শুনল তার মা মারা গেছেন, দেখল তার বাবা খুবই বুড়ো হয়ে গেছেন। যখন সে বাবাকে অভিবাদন করল বাবার মুখে ক্ষমার কোনো চিহ্নই দেখতে পাওয়া গেল না। কেবল শিশুটির ওপর দৃষ্টি পড়তে তিনি যেন একটু নরম হলেন। চ্যাঙ পালিয়ে গেছে জানতে পেরে বৃদ্ধ যেন আশ্বস্ত হলেন, কেননা, তাকে নিয়ে তিনি কি করতেন তা তিনি ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছিলেন না। তথাপি, যে লোকটা তাঁর মেয়ের জীবন নষ্ট করেছে এবং সমস্ত পরিবারের ওপর দুর্ভাগ্যের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে তাকে তিনি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারলেন না।

বছরের পর বছর চলে গেল, কিন্তু চ্যাং পোর কোনো খবরই পাওয়া গেল না। ক্যানটন থেকে গভর্ণর ইয়াং রাজধানীতে এলেন একদিন। কমিশনার তার সম্মানে ভোজসভার আয়োজন করলেন। ভোজসভা চলাকালে গভর্ণর জানালেন যে তিনি একটা মূল্যবান প্রতিমূর্তি সঙ্গে করে এনেছেন, কমিশনার সম্রাজ্ঞীকে দয়াদেবীর যে প্রতিমূর্তিটি উপহার দিয়েছিলেন এটি তার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে। এবং সাদৃশ্যের বিশিষ্টতা ও শিল্পোৎকর্ষে এটি আরো সুন্দর। তিনি প্রতিমূর্তিটি সম্রাজ্ঞীকে উপহার দেবেন বলে স্থির করেছেন। তাহলে দুটি মিলে যুগল প্রতিমূর্তি হবে—সম্রাজ্ঞী খুব খুশি হবেন।

ভোজসভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ গভর্নরের কথা শুনে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করে জানালেন যে, সম্রাজ্ঞীর দেবীমূর্তির চেয়ে সৌন্দর্যে উৎকৃষ্টতর প্রতিমূর্তি পাওয়া খুবই কঠিন।

'ঠিক আছে, একটু পরেই আমি আপনাদের দেখাব', বিজয়ীর ভঙ্গি প্রকাশ করে গভর্নর বললেন।

ভোজসভা শেষ হয়ে গেলে গভর্নর একটা উজ্জ্বল কাঠের বাক্স এনে টেবিলের ওপর রাখলেন। বাক্স থেকে জেডদেবীর শুভ্র মূর্তিটি বের করে টেবিলের মধ্যস্থলে রাখতেই সকলেই একেবারে নির্বাক হয়ে গেলেন। দয়াদেবীর করুণ প্রতিমূর্তি দেখে সকলেই আবিষ্ট হয়ে পড়লেন।

একজন পরিচারিকা ছুটে গিয়ে মীলানকে খবরটা দিতে মীলান জাফরির পর্দার পেছনে এসে দাঁড়াল; এবং টেবিলের ওপর রক্ষিত মূর্তিটির ওপর চোখ পড়তেই মুহূর্তে তার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। 'সে-ই এই মূর্তিটি তৈরি করেছে; হঁ্যা, সে-ই,' মীলান নিজের মনে ফিসফিস করে বলল। চ্যাঙ পো বেঁচে আছে কিনা জানার জন্যে সে নিজেকে আরো শক্ত করে ধরে রাখতে চেষ্টা করল।

একজন অতিথি জিজ্ঞাসা করলেন, 'শিল্পীর নাম কি?'

'গল্পের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ এটাই', ক্যানটনের গভর্নর বললেন, 'সে ঠিক পুরোপুরি জেড-কারিগর নয়। আমি আমার স্ত্রীর ভাইঝির মুখে প্রথম তার কথা শুনি। সে একটা বিয়ে বাড়ি যাবে বলে আমার স্ত্রীর কাছ থেকে সাবেকি ধরনের একজোড়া ব্রেসলেট চেয়ে নিয়েছিল। দুটি ব্রেসলেটই একরকম। তারপর সে দুটোর একটা ভেঙে ফেলে এবং ভীষণ লজ্জিত হয়ে পড়ে। সত্যি, খুবই দুঃখের কথা, কেননা ব্রেসলেট দুটো খুবই সুন্দর ছিল, এবং মানানসই আর একটা মেলানো খুবই কঠিন। তখন গোঁ ধরল যে একটা নকল ব্রেসলেট সে তৈরি করাবে। অনেক দোকান ঘুরে কাউকেই রাজী করাতে পারে নি। শেষমেশ চায়ের দোকানে একটা বিজ্ঞাপন

য়। কয়েকদিন পরে ময়লা দাগধরা পোশাকে একটা লোক এসে হাজির, বলে—সে বিজ্ঞাপন দেখে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্রেসলেটটা তাকে দেখানো হল। সে বলল, ওই রকম আর একটা ব্রেসলেট তৈরি করতে পারবে। বলা বাহুল্য পারলও। সে-ই প্রথম লোকটা সম্পর্কে আমি অবহিত হই।

'আমি যখন জানতে পারলাম যে সম্রাজ্ঞী জেডদেবীর একটি জোড়া খুঁজছেন, তখন এই লোকটার কথা আমার মনে পড়ল। ক্যানটন থেকে আমি উৎকৃষ্ট ধরনের জেডপাথর সংগ্রহ করিয়ে আনলাম এবং তার খোঁজে লোক পাঠালাম। যখন তাকে আমার বাড়ি আনা হল যেন চোর সন্দেহে তাকে ধরে আনা হয়েছে। সম্রাজ্ঞীর কাছে যে জেডদেবীর প্রতিমূর্তি আছে তার অনুরূপ একটি প্রতিমূর্তি আমি তাকে দিয়ে তৈরি করিয়ে নিতে চাই—এই সহজ কথাটা তাকে বোঝাতে আমাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হল। আমি যখন তাকে বোঝাতে লাগলাম, সে কোনোরকম সাড়াশব্দ করল না। ক্রমশ সে জেড-পাথরটার কাছে এগিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। 'কি ব্যাপার?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'পাথরটা কি ভালো নয়?'

শেষমেশ সে পাথরটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে গর্বের সঙ্গে বলল, 'এ-তেই হবে। আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি। সারাজীবন ধরে আমি এই ধরনের সাদা জেড-পাথর খুঁজে এসেছি। গভর্নর, আমি কাজটা করব, কিন্তু শর্ত এই যে এর জন্যে আপনি আমাকে দক্ষিণা নিতে বাধ্য করবেন না—এবং আমাকে নিভৃতে আমার স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী কাজটা সম্পন্ন করতে দেবেন।'

"আমি তাকে একটা ঘর ছেড়ে দিলাম, একটা সাদাসিধে বিছানা, একটা টেবিল, এবং তার প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিসপত্র। লোকটা সত্যিই অদ্ভুত। কারো সঙ্গে কথা বলে না, চাকরবাকর যারা তার কাছে জিনিসপত্র পৌঁছে দিত তাদের সঙ্গে একটু রুক্ষ ব্যবহারও করত। কিন্তু নিজের মনে—যেন ধ্যানস্থ হয়ে কাজ করত লোকটা।

পাঁচ মাস ধরে সে কাজ করল, কিন্তু আমাকে একটিবারের জন্যেও দেখতে দিল না। আরো তিন মাস পরে কাজ শেষ করে মূর্তিটা সে আমার কাছে নিয়ে এল। প্রথম যখন দেখি আমিও হতবাক হয়ে গেছলাম। মনে আছে, যখন সে নিজের সৃষ্টির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল, একটা অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠছিল তার চোখেমুখে।'

'এই যে, গভর্নর,' সে সোল্লাসে বলল, 'আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই, এই প্রতিমূর্তিটিই আমার জীবন-কাহিনী'।

'আমি কিছু বলার আগেই সে চলে গিয়েছিল। তার পিছনে পিছনে আমি গিয়েছিলাম কিছুটা, কিন্তু ধরতে পারিনি। তারপর থেকে চিরকালের জন্যে সে হারিয়ে গেল।'

হঠাৎ অতিথিরা পাশের ঘর থেকে ভেসে-আসা নারীকণ্ঠের হৃদয়বিদারী তীব্র আর্ত চিৎকার শুনতে পেলেন—সকলেই যেন স্থাণু হয়ে গেলেন। বৃদ্ধ কমিশনার তৎক্ষণাৎ মীলানের কাছে ছুটে গেলেন, মীলান মেঝের ওপর পড়েছিল।

একজন অতিথি অভিভূত গভর্নরের কানে কানে বললেন, 'ওই মেয়েটি কমিশনারের মেয়ে। সে-ই এই দেবী। আমি নিশ্চিত যে আপনার কথিত শিল্পী ওর স্বামী চ্যাঙ পো ছাড়া আর কেউই নয়।'

মীলানের জ্ঞান ফিরলে সে সকলের সামনে এসে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে প্রতিমূর্তিটাকে স্পর্শ করার জন্যে তার হাত দুটো উঠে এল,—প্রতিমূর্তিটি দর্শন এবং স্পর্শ করে সে যেন তার স্বামীকে আর একবার কাছে পেতে চায়। সকলেই দেখলেন যে জেডমূর্তি এবং ওই নারী অভিন্ন। দুজনের মুখের মধ্যে কোথাও এক তিল অমিল নেই।

'মূর্তিটি তোমার কাছেই থাক, মেয়ে,' গভর্নর তাকে বললেন, 'আমি সম্রাজ্ঞীকে অন্য কিছু উপহার দেবো। আমার বিশ্বাস এই মূর্তিটি থেকে তুমি অনেকখানি সান্ত্বনা পাবে। যতোদিন না স্বামীর সঙ্গে তোমার আবার মিলন হয় ততোদিন এটি তোমার।'

সেদিনের পর থেকে মীলান ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে, যেন কোনো একটা অজানা রোগ তাকে কুরে কুরে খেয়ে শেষ করে ফেলছে। এই সময় যদি জামাতাকে পাওয়া যেত তাহলে কমিশনারও হয়ত তাকে ক্ষমা করতেন। কিন্তু ক্যানটনের গভর্নরের কাছ থেকে জানা গেল যে চ্যাঙ পোকে খুঁজে পাওয়ার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে।

দু'বছর পরে একটা সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে চ্যাঙ-পোর সন্তানটি মারা গেল। তারপর মীলান মাথা নেড়া করে একটা মঠে গিয়ে আশ্রয় নিল। সঙ্গে নিল তার একমাত্র সম্পত্তি জেডদেবীর মূর্তিটি। মঠাধ্যক্ষার বিবৃতি থেকে জানা যায় যে সর্বক্ষণ সে তার নিজস্ব একটা জগতে বাস করত, কোনো সন্ন্যাসিনী—এমনকি মঠাধ্যক্ষাকেও তার ঘরে ঢুকতে দিত না।

মঠাধ্যক্ষা গভর্নরকে বলেছিলেন যে, তাঁরা দেখেছেন—প্রতি রাত্রে ওই প্রতিমূর্তিটির সামনে বসে মীলান একটির পর একটি প্রার্থনা রচনা করে ওই প্রতিমূর্তিটির সামনেই দীপাধারের শিখায় একটি একটি করে সেগুলো পুড়িয়ে ফেলত। তার গোপন পৃথিবীতে সে কাউকে প্রবেশ করতে দিত না বটে কিন্তু তাকে খুব সুখীই দেখাত, এবং কখনো কাউকে সে কোনোরকম দুঃখ দিত না, বা আঘাত করত না।

বর্তমান মঠাধ্যক্ষা মঠে যোগদান করার কুড়ি বছর পরে মীলানের মৃত্যু হয়। এবং এই ভাবে নশ্বর দয়াদেবী চিরকালের জন্যে অন্তর্হিত হয়ে যায়, কিন্তু জেডদেবীর মূর্তিটি আজো বিদ্যমান।

গ্রন্থকীট

পু সাঙলিঙ

[পু সাঙলিঙের (১৬৩৮-১৭১৫) 'লিয়াওসাই' গ্রন্থ থেকে গৃহীত। পু প্রতিভাবান গল্পকার এবং গভীর মনীষা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। কর্মজীবনে পু বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। তিনি মনে করতেন, যথার্থ পণ্ডিত এবং কলারুচিসম্পন্ন মানুষ ব্যবহারিক জীবনে সব সময় উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করবেই তার কোনো মানে নেই। রাজনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের এই গল্পে লক্ষণীয়ভাবে কটাক্ষ করা হয়েছে। হিউমার এবং স্যাটায়ারের ব্যবহারে পু রীতিমতো পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।]

মিঃ ল্যাঙ পণ্ডিত বংশের ছেলে। শৈশব থেকেই সে তার বাবার মুখে প্রাচীন গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি, প্রাচীন কবি এবং তাদের জীবনী সম্পর্কে অনেক কথা শুনে এসেছে। একজন সৎ কর্মচারী ছিলেন বলে তার বাবা বৈষয়িক ক্ষেত্রে খুব একটা উন্নতি করতে পারেন নি। হাতে টাকা এলেই তিনি বই কিনে কিনে লাইব্রেরি ভরাতেন। বাবা মারা গেলে ল্যাঙ পৈতৃক সম্পত্তি বলতে ওই লাইব্রেরি ছাড়া আর কিছুই পেল না। ছেলেও আশৈশব বইয়ের জগতে কাটিয়ে আসছে, বই ছাড়া আর কিছু জানেই না, তার বইপ্রীতি প্রায় বাতিকের পর্যায়ে পড়ে। টাকাপয়সার ওপর কোনো আসক্তি নেই, কিভাবে টাকাপয়সা আয় করা যায় সেদিকেও কোনে ভ্রূক্ষেপ নেই, কাজেই নগদ পয়সার দরকার হলে মাঝেমধ্যে তাকে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে এটা সেটা বিক্রি করেই ব্যবস্থা করতে হয়। অবিশ্যি মরে গেলেও এক ভল্যুম বই বিক্রি করার কথা সে ভাবতেও পারত না।

লাইব্রেরিতে তার বাবার নিজের হাতে লেখা সম্রাট সাঙ চেন্‌টসাঙ রচিত "বিদ্যাদেবীর আবাহন" বইটির একটি কপি সংরক্ষিত ছিল। এই

বইটির প্রতি ল্যাঙের বিশেষ অনুরাগ ছিল। ছেলের জন্যেই বাবা এই বইটি কপি করে রেখে গিয়েছিলেন। ছেলে বাবার শেষ উপদেশ ভেবে বইটি সযত্নে বাঁধিয়ে ডেস্কের ওপর এমনভাবে সাজিয়ে রেখেছিল যাতে প্রত্যহ বইটির ওপর তার চোখ পড়ে। পাছে ধুলোবালি পড়ে বইটি নষ্ট হয়ে যায়, তার জন্যে সুন্দর কাগজ দিয়ে বইটিকে মুড়েও রেখেছিল। বইটার প্রতিটি পঙ্‌ক্তি তার কাছে ছিল শাস্ত্র বাক্য :

ধনী ব্যক্তিদের জমি এবং খামারের পেছনে অপরিমিত অর্থব্যয় করতে দেওয়া উচিত নয়, কেননা উৎকৃষ্ট শস্যের প্রাচুর্য মিলতে পারে একমাত্র বইয়ের পাতায়।

অথবা অর্থবান ব্যক্তি তাদের জন্যে বড়ো বড়ো অট্টালিকা তৈরি করে, কিন্তু গ্রন্থের ভেতর ছড়িয়ে থাকে অসীম জ্ঞানরাজ্য।

অথবা যুবকেরা প্রণয়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু বইয়ের মলাটের ভেতর লুকিয়ে থাকে অনুপমা রমণীরা, যাদের সান্নিধ্য জেডপাথরের মতো মসৃণ ও উজ্জ্বল।

অথবা কোনো কোনো ব্যক্তি গাড়িঘোড়া চাকরবাকর পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারে, কিন্তু অধ্যয়নশীল পাঠক গাড়ি-ঘোড়া প্রভৃতি সবকিছুই পেয়ে যেতে পারে পুঁথির ভেতরে।

যেসব উচ্চাভিলাষী তরুণ খ্যাতি ও অর্থ পেতে চায়, প্রাচীন গ্রন্থরাজ্যে বিচরণ করলে অনায়াসেই তারা তা পেতে পারে।

ইত্যাকার অনুশাসনগুলির অর্থ খুবই সহজ ও স্পষ্ট : বিদ্যা এবং পাণ্ডিত্য থেকে অর্জন করা যায় খ্যাতি ও সম্মান, প্রধান পণ্ডিতশ্রেণীর সভ্য হওয়া যায়, সকল রকম পার্থিব সুখ উপভোগ করা যায়, স্বর্ণ শস্য ও রমণী কিছুরই অভাব থাকে না। কিন্তু মিঃ ল্যাঙ অনুশাসনগুলির আভিধানিক অর্থই গ্রহণ করে কেবল, এবং বিশ্বাস করতে থাকে যে : যদি সে ধৈর্য ধরে দীর্ঘকাল অধ্যয়ন চালিয়ে যেতে পারে তাহলে বইয়ের ভেতরেই মিলে যাবে রাশি রাশি শস্য এবং সুন্দরী নারী।

আঠের, উনিশ, কুড়ি—অর্থাৎ যে-বয়েসে যুবকেরা পুরনো ধূসর পুঁথির চেয়ে তন্বী তরুণীর প্রতি সমধিক আকর্ষণ বোধ করে,—ল্যাঙ সে-বয়েসেও সর্বদা গভীর মনোযোগের সঙ্গে কেবল পুরনো পুঁথির পাতা উল্টে যায়। বাইরে বেরিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা বা গালগল্প করা, কিংবা অন্য কোনো রকম আমোদ-প্রমোদ করা,—কোনো কিছুর প্রতি আগ্রহ নেই তার। তার সবথেকে বড়ো সুখ চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে বসে বসে আপন মনে কেবল প্রিয় লেখকের রচনার অংশবিশেষ আবৃত্তি করা। দুষ্প্রাপ্য ও কৌতুকাবহ গ্রন্থসংগ্রহে বাতিকগ্রস্ত লোকের সমস্ত লক্ষণই তার ছিল। শীত-গ্রীষ্মে তার একই পোশাক, এবং অবিবাহিত বলে একা একাই বাস করে, এখন কেউ নেই যে তাকে প্রত্যহ অন্তর্বাস বদলের কথাটাও স্মরণ করিয়ে দেয়। কখনো কখনো বন্ধুরা দেখা করতে আসে, কিন্তু কিছু সৌজন্যমূলক আলাপ এবং আবহাওয়া সংক্রান্ত কথাবার্তার পর তাদের চলে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না, এবং ল্যাঙও আবার যথারীতি বইয়ের মধ্যে ডুবে যায়। চোখ বুঁজে, ঘাড়টা পেছনের দিকে কাৎ করে যথারীতি গভীর তৃপ্তির সঙ্গে কোনো গদ্য বা পদ্য রচনার পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করে যেতে থাকে।

রাজকীয় পরীক্ষায় ল্যাঙ ফেল করল, ডিগ্রি পেল না। কিন্তু সম্রাট সাঙ চেন্‌ৎসাঙের বাণীর ওপর তার এতোই ভরসা ছিল যে এ নিয়ে সে মাথাই ঘামাল না। সোনা এবং গাড়িজুড়ি, এবং এমন আশ্চর্য নারী সে পাবে—যার চেহারা হবে জেড পাথরের মতো মসৃণ ও উজ্জ্বল। সম্রাট বলেছেন, কেবলমাত্র অধ্যয়নের ভেতর দিয়েই এইসব বস্তু ও সাফল্য অর্জন করতে হবে। সম্রাট কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না।

একদিন ল্যাঙ পড়ছিল, হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় তার হাতের পাতলা বইটা উড়ে গেল, ফর্‌ফর্‌ করে উড়তে উড়তে বাগানে গিয়ে পড়ল। সে-ও পেছন পেছন ছুটে গেল এবং বইটা পা দিয়ে চেপে ধরল। চেপে ধরতে গিয়ে আগাছায় ঢাকা একটা গর্তের ভেতর তার

একটা পা হড়কে গেল। মনোযোগ দিয়ে গর্তটা পরীক্ষা করে দেখতে পেল গর্তের নিচে শুকনো শেকড়, কাদা, এবং কিছু জনারের দানা পড়ে আছে। সে জনারের প্রতিটি দানা খুঁটে খুঁটে তুলে নিল। জনারের দানাগুলো কাদা মাখানো, সম্ভবত অনেক বছর যাবৎ সেখানে পড়ে আছে, এবং সেগুলি সংখ্যায় এতো কম যে প্রাতরাশের একটা বাটিও ভরবে না তাতে। কিন্তু সে এতো খুশি হল যে তার কাছে যেন একটা ভবিষ্যৎ বাণীই সত্যে পরিণত হয়ে এসেছে, সম্রাটের বাণীর ওপর তার যে ভরসা ছিল এই ঘটনায় তা আরো সুদৃঢ় হল।

কিছুদিন পরে, কোনো একটি বইয়ের খোঁজে মইয়ে উঠে সে শেলফের ওপরে এক ফুট লম্বা আকৃতির একটা ক্ষুদে গাড়ি দেখতে পেল। ধুলো ঝাড়ার পর সেটা সোনার মতো চকচক করে উঠল। খুব খুশির সঙ্গে সে সেটা নামিয়ে আনল এবং বন্ধুদের দেখাতে থাকল। তারা দেখে বুঝতে পারল—বস্তুটা পুরোপুরি সোনার নয়—গিল্টি-করা : সে যা আশা করেছে আদপেই তা নয়। আরো কিছু পরে তার বাবার এক বন্ধু—একজন জেলা-পরিদর্শক,—তাঁর নিজের জেলায় যাওয়ার পথে ওই গাড়িটা দেখতে এলেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ। গাড়িটা দেখে একটা প্রত্নশিল্পের নমুনা বলে তিনি সেটা কিনতে চাইলেন,—মন্দিরে কুলুঙ্গিতে সেটা রেখে দেওয়া হবে। ল্যাঙকে গাড়িটার বিনিময়ে তিনি তিনশ রৌপ্যমুদ্রা এবং দুটো ঘোড়া দিলেন।

ল্যাঙ এখন আরো দৃঢ়নিশ্চিত হল যে সম্রাট রচিত "বিদ্যাদেবীর আবাহন" অক্ষরে অক্ষরে সত্য ; কেন না, সোনা, গাড়ি ও শস্যের প্রতিজ্ঞা অনতিবিলম্বেই সিদ্ধ হয়েছে। সম্রাটের ওই বিখ্যাত নিবন্ধটি অনেকেই পড়েছে, কিন্তু তার প্রতি ল্যাঙের মতো অতো গভীর বিশ্বাস আর কারোরই ছিল না।

যখন তার বয়েস ত্রিশ, তখনো সে অবিবাহিত, বন্ধুরা একটা ভালো মেয়ে দেখে বিয়ে করার জন্যে তাকে চাপ দিতে লাগল।

'কেন আমি মেয়ে খুঁজতে যাব?' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ল্যাঙ

জিজ্ঞাসা করল, 'আমি নিশ্চিত যে ওই জ্ঞান ও বিদ্যার গ্রন্থসমুদ্রে আমি আমার বাঞ্ছিতাকে খুঁজে পাব—যে হবে জেডের মতো সুন্দর, শুভ্র ও উজ্জ্বল।'

এই গ্রন্থকীটের বইপ্রীতি এবং বইয়ের পাতা থেকে অমর্ত্ত সুন্দরীর সম্ভাব্য আবির্ভাবের গল্প ছড়িয়ে পড়লে চারদিক থেকে বন্ধুদের স্ফূর্তিব্যঞ্জক টিপ্পনীর ধুম পড়ে যায়। একদিন এক বন্ধু ল্যাঙকে বলল, 'প্রিয় ল্যাঙ, বয়নসুন্দরী (Spinning maid) তোমার প্রেমে পড়েছে। কোনোদিন রাতে স্বর্গের বাসা ছেড়ে সে তোমার কাছে উড়ে আসবে।'

গ্রন্থকীট বুঝতে পারল বন্ধু তাকে ঠাট্টা করছে, কাজেই তার সঙ্গে তর্ক না করে উত্তরে শুধু বলল, 'এলে দেখতেই পাবে।'

একদিন বিকালবেলা সে হান যুগের ইতিহাস, অষ্টম খণ্ড পাঠ করছিল। বইটির মাঝখানে একটা পুস্তক-চিহ্নিকা—সিল্কের চওড়া রিবন তার নজরে পড়ল। পুস্তক-চিহ্নিকার গায়ে একটি অপরূপা রমণীর ছবি আঁটা ছিল। পেছনে ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে দুটিমাত্র কথা লেখা ছিল : 'বয়ন সুন্দরী'।

ছবিটার ওপর চোখ পড়তেই তার হৃদয় উষ্ণ হয়ে উঠল। সেটা উল্টে-পাল্টে দেখে সে আবার যথাস্থানে রেখে দিল। তাহলে এ সে-ই, সে মনে মনে ভাবল। নৈশ আহারের সময় মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে সে ছবিটা দেখে আসতে লাগল, এবং রাত্রিবেলা শুতে যাওয়ার ঠিক আগেও ছবিটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে বসে স্বপ্ন দেখতে থাকল। খুব খুশি হয়েছিল সে।

একদিন সে বইয়ের পাতা উল্টে বয়নসুন্দরীর সৌন্দর্যসুধা পান করছিল, এমন সময় হঠাৎ মেয়েটি বইয়ের পাতার ওপর বসে পড়ল, এবং তার দিকে সদয়ভাব চেয়ে মিষ্টি করে হাসল। বিস্মিত ও হতবাক হয়ে হঠাৎ মাথা দুলিয়ে সে শিষ্টাচারসম্মত একটা অভিবাদনই করে বসল মেয়েটিকে। মুহূর্তে মেয়েটি ফুটখানেক বেড়ে গেল। বুকের

ওপর হতে দুটো এঁটে ধরে সে আরো একবার অভিবাদন করল, এবং সঙ্গে সঙ্গে একজোড়া সুন্দর পা ফেলে বইয়ের পাতা থেকে মেয়েটি নেমে এল। মাটিতে পা ছোঁয়ানো-মাত্র মেয়েটি একটি পূর্ণাবয়ব নারীমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। তার দু'চোখের তারা নিবদ্ধ হল তার দুই চোখের ওপর। তাকে দেখে ল্যাঙের চোখ দুটো জুড়িয়ে গেল।

'আমি এসে গেছি! আমার জন্যে তুমি অনেকদিন থেকে অপেক্ষা করছ,' মেয়েটি খুশিতে ডগমগ হয়ে বলল।

'তুমি কে?' কম্পিত স্বরে ল্যাঙ জিজ্ঞাসা করল।

'আমার নাম ইয়েন (সহিষ্ণুতা), এবং আমার ব্যক্তিগত নাম জুক (জেড-পাথরের মতো)। তুমি আমাকে চেনো না, কিন্তু বইয়ের মধ্যে আত্মগোপন করে থেকেও আমি তোমাকে অনেক দিন থেকেই চিনি। প্রাচীন ঋষিদের বাক্যে তোমার বিশ্বাস আমার হৃদয় স্পর্শ করেছিল, এবং মনে মনে ভেবেছিলাম আমি যদি না আসি এবং তোমাকে দেখা না দিই, কেউই প্রাচীন ঋষিদের আদপে আর বিশ্বাসই করবে না।'

এখন এই তরুণ শিক্ষার্থীর মনোবাসনা পূর্ণ হল এবং তার বিশ্বাস সত্যে পরিণত হল। মিস ইয়েন কেবল সুন্দরীই নয়, আবির্ভাবের সূচনাকাল থেকেই তার প্রতি বন্ধুপ্রতিম এবং পরিজনসদৃশ। সে ল্যাঙকে প্রায়শঃ চুম্বন দান করত এবং সব বিষয়ে তার প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রদর্শন করত। একজন গ্রন্থকীটের পক্ষে যা স্বাভাবিক, —মিঃ ল্যাঙ পরিস্থিতির কোনো সুযোগ নিতেই চেষ্টা করত না। গভীর রাত পর্যন্ত সে ইয়েনের সঙ্গে শিল্প সাহিত্য এবং ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করত। মেয়েটি ক্রমশই ক্লান্ত এবং নিদ্রাকাতর হয়ে পড়ত, বলত, 'ঢের রাত হয়েছে। চলো শুতে যাই।'

'হ্যাঁ, এখন আমাদের শুতে যাওয়াই উচিত।'

সৌজন্যবশত নগ্ন হওয়ার পূর্বে মেয়েটি আলো নিভিয়ে দিত,

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এরকম সতর্কতার কোনো প্রয়োজনই থাকত না। বিছানায় শোওয়ার পর ইয়েন তাকে চুমু খেয়ে বলত, 'শুভরাত্রি।'

'শুভরাত্রি,' ল্যাঙ উত্তরে বলত।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি পাশ ফিরে আবার বলত, 'শুভরাত্রি।'

'শুভরাত্রি,' তরুণ শিক্ষার্থী জবাব দিত।

রাত্রির পর রাত্রি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। একটি সুন্দরী রমণীর পাশে শুয়েও ল্যাঙ গভীর রাত পর্যন্ত অধ্যয়ন করত। ভদ্রতাবশত মিস ইয়েন তার পাশে বসে বসে রাত জাগত।

'এতো পড়াশুনো করে কি হবে?' বিরক্ত হয়ে ইয়েন জিজ্ঞাসা করত, 'আমি তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি। আমি জানি যে তুমি—তুমি জীবনে উন্নতি করতে চাও, উঁচু পদের চাকরি পেতে চাও। ঈশ্বরের দোহাই, রাত জেগে এতো পড়াশুনো করে না। বাইরে বেরোও, লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করো, সামাজিক হও, বন্ধুদের কাছে টেনে নাও। নিজের চোখেই দেখো ডিগ্রি পাওয়ার জন্যে কে এতো কঠোর পরিশ্রম করে। আঙুলে গোনা যায় এমন কয়েকজনের বেশি তেমন কাউকেই পাবে না। খুব বেশি হলে চু হ্সি-র নোট-সম্বলিত চারখানা বই এবং হয়ত পাঁচটি ক্ল্যাসিকের তিনটি—তার বেশি বই কেউই পড়ে না। যারা পাশ করেছে তারা সকলে এমন কিছু পণ্ডিত নয়। বোকামো করো না। আমার কথা শোনো। বইয়ের কথা একেবারে ভুলে যাও।'

ইয়েনের কথা শুনে ল্যাঙ বিস্মিত হয় এবং অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়ে। তার কাছে এর চেয়ে কঠিন উপদেশ আর কিছুই হতে পারে না।

'যদি উন্নতি চাও তাহলে আমার কথা তোমাকে শুনতেই হবে,' ইয়েন জেদের সঙ্গে বলে, 'তোমার বইয়ের কথা এবং পড়াশুনোর কথা সম্পূর্ণ ভুলে যাও, নতুবা আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাব।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ল্যাঙ তার আদেশ পালন করে, কেননা ইয়েনকে তার ভালো লাগে এবং ইয়েনকে সত্যিসত্যিই সে ভালোবাসে।

একদিন ল্যাঙ আবার বই নিয়ে বসে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ইয়েনও অন্তর্ধান করে। তখন নীরবে ল্যাঙ ইয়েনকে ফিরে আসার জন্যে অনুনয়-বিনয় করতে থাকে, কিন্তু ইয়েনের ফেরার কোনো লক্ষণই দেখা যায় না। তৎক্ষণাৎ ল্যাঙের মনে পড়ে যায় যে হান-যুগের ইতিহাস, অষ্টম খণ্ড থেকে একদিন ইয়েন বেরিয়ে এসেছিল, সে সেই বইটা খোলে, এবং পূর্বের মতো একই পৃষ্ঠায় পুস্তক-চিহ্নিকাটি দেখতে পায়। ল্যাঙ ইয়েনের নাম ধরে ডাকতে থাকে, কিন্তু ছবির মেয়েটি আর কিছুতেই আসে না। ল্যাঙ মরিয়া হয়ে ডাকতে থাকে। বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে, বেরিয়ে আসার জন্যে অনুরোধ জানাতে থাকে, এবং ইয়েনের সমস্ত কথা শুনে চলবে বলে প্রতিজ্ঞাও করতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে উঠে মেয়েটি হেঁটে হেঁটে নেমে আসে, তখনো তার মুখে রাগের চিহ্ন।

'এখন থেকে তুমি যদি আমার কথা না শুনে চলো, আমি তোমাকে ছেড়ে আবার চলে যাব। আমি দিব্যি করেই বলছি।'

মিঃ ল্যাঙ প্রতিশ্রুতি দিল সে কখনো তার কথা অমান্য করবে না। মিস ইয়েন একখণ্ড কাগজের ওপর একটা দাবার ছক টেনে নিল এবং কিভাবে দাবা খেলতে হয় শিখিয়ে দিল। তারপর তাস খেলতেও শিখিয়ে দিল। ইয়েনকে হারাবার ভয়ে মিঃ ল্যাঙ খেলায় মনোযোগ দিতে চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু খেলায় তার মন বসত না কিছুতেই। যখনই একা থাকত, সংস্কারবশে কখন সে বই খুলে বসে যেত, ভয় পেত কখন না-জানি ইয়েন এসে তাকে দেখে ফেলে। এই ভয়ে সে শেলফের অন্যান্য বইয়ের গাদার ভেতরে অষ্টম খণ্ডটি বেমালুম লুকিয়ে রাখত।

একদিন ল্যাঙ বই পড়ায় নিমগ্ন ছিল। এমন সময় আকস্মিক ভাবে ইয়েন এসে উপস্থিত। ল্যাঙ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি। ধরা পড়ে সঙ্গে সঙ্গে ল্যাঙ বইটা বন্ধ করে দেয়, কিন্তু এক সেকেণ্ডের মধ্যে ইয়েন অদৃশ্য হয়ে যায়। ল্যাঙ তাকে উন্মত্তের মতো খুঁজতে থাকে,

কিন্তু ব্যর্থ হয়। তাহলে ইয়েন কি জানে কোথায় অষ্টম খণ্ডটি লুকনো আছে? সে অষ্টম খণ্ডের ভেতরকার পুস্তক-চিহ্নিকাটি খুঁজতে থাকে, এবং সেই খণ্ডটির একই পৃষ্ঠা থেকে ইয়েনের ছবিটা খুঁজে বের করে।

এই সময় ইয়েনের কাছে নতজানু হয়ে সে প্রতিজ্ঞা করে যে মরে গেলেও সে আর কখনো বই স্পর্শ করবে না। তখন তার দিকে একটা আঙুল তুলে ইয়েন সাবধান করে দিয়ে রাগের স্বরে বলে, 'তুমি উন্নতি করো, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হও, এই চেয়ে আমি তোমাকে সাহায্য করতে এসেছিলাম। কিন্তু তুমি এমনই নির্বোধ যে আমার কথা গ্রাহ্যও করছ না। এই শেষ বারের মতো আমি তোমাকে সুযোগ দিচ্ছি। তিন দিনের মধ্যে দাবা খেলায় যদি তোমার কোনোরকম উন্নতি না দেখি, তাহলে আমি চিরকালের জন্যে তোমায় ছেড়ে চলে যাব। একজন অবজ্ঞাত পণ্ডিত হিসেবেই একদিন তোমাকে মরতে হবে।'

সম্রাটের বইটি দেখিয়ে ইয়েন মন্তব্য করল, 'এ-তো গল্পের আধখানা।' এবং 'সাফল্যের পথনির্দেশিকা' নামে একটি গোপন ও গুহ্য বই তাকে দিল। এই ছোট্টো বইটা থেকে ইয়েন তাকে অনেক কিছু শেখাল: তার মনে যা আছে তা সে কাউকে বলবে না; মনে যা নেই কেবল তা-ই বলবে; এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যে ব্যক্তির সঙ্গে সে কথা বলছে তার মনের কথা সুযোগ মতো ফাঁস করে দেবে। এবংবিধ পরিমার্জনার পর, শেষ পর্যায়ে শেখাল: মনে যা আছে তার আধখানা বলবে—যাতে কোনো বিষয় সম্পর্কে অস্ত্যর্থক বা নাস্ত্যর্থক কোনো রকম মনোভাবই স্পষ্টত প্রকাশ না পায়। এবং যখন দেখবে সে প্রথমে যা ভেবেছিল ব্যাপরটা ঠিক তার উলটো, তখন সে যা স্বীকার করেছিল পুরোপুরি তা অস্বীকার করবে, অথবা যা অস্বীকার করেছিল তা পুরোপুরি স্বীকার করবে। ল্যাঙ যাকে বলে সুযোগ্য ছাত্র—তা মোটেই ছিল না। কিন্তু ইয়েন খুব ধৈর্যের সঙ্গে তাকে এসব শেখাতে লাগল। সে ল্যাঙকে আশ্বাস দিয়ে বলল যে তার মনে যা নেই তা-ই যদি সে বলতে অভ্যস্ত হয়ে যায় তাহলে সে

চতুর্থ বা পঞ্চম পদমর্যাদা অর্জন করতে পারবে, এবং যদি মনে যা আছে তা না বলতে অভ্যস্ত হয়ে যায় তাহলে সে একজন জেলা-শাসকের মতো মাত্র ষষ্ঠ পদমর্যাদা অর্জন করতে পারবে। ইয়েন প্রকাশ্যে ঘোষণা করল: ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুঁজলে দেখা যাবে যে গভর্নর মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীর মতো প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর উচ্চ পদ-মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিরা চিরকাল মনে যা আছে তার আধখানা মাত্র ব্যক্ত করার আর্ট ভালো করে অনুশীলন করে এসেছে—যা-তে দরকার মতো সহজেই তারা স্বীকার করতে পারে, আবার অস্বীকার করতেও অসুবিধা না হয়। তবে এই শেষোক্ত পদটি লাভ করতে হলে ধারাবাহিক অনুশীলন ও বাকচাতুর্য থাকা দরকার। ইয়েন ল্যাঙকে আশ্বাস দিয়ে জানাল যে, অন্য লোকের মনের কথা বুঝে নেওয়ায় আর্ট যদি সে আয়ত্ত করতে পারে—তাহলে একজন হ্সিয়েন ম্যাজিস্ট্রেট অন্তত সে হতে পারবে। বাস্তবিকপক্ষে ব্যাপারটা খুবই সোজা, অনবরত কেবল বলে যাওয়া চাই: 'আপনিই ঠিক বলছেন—যথার্থ বলেছেন', এবং ল্যাঙ খুব সহজেই বিদ্যেটা শিখে নিতে পারল।

অচিরেই ইয়েন ল্যাঙকে বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা হৈ-হল্লা পানভোজনে অভ্যস্ত করে তুলল। বন্ধুরা লক্ষ্য করল ল্যাঙের চরিত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। ল্যাঙ অল্পকালের মধ্যেই মদ্যপ জুয়াড়ি এবং যোগ্য সঙ্গী হিসেবে একটু খ্যাতিও অর্জন করে ফেলল।

'এখন একজন পদস্থ অফিসারের যোগ্য হয়ে উঠেছ তুমি,' ইয়েন বলল।

হয়ত একটা আকস্মিক ব্যাপার, অথবা হয়ত মেয়েটির চেষ্টায় ল্যাঙ খানিকটা ব্যাটাছেলে হয়ে-ওঠার শিক্ষা অর্জন করতে পেরেছিল। কিন্তু একদিন রাত্রে ল্যাঙ ইয়েনকে বলল, 'আমি লক্ষ্য করেছি যখন একজন পুরুষ এবং একজন নারী একসঙ্গে শোয়া-বসা করে, তারা ছেলেপুলের জন্ম দেয়। অনেকদিন ধরে আমরা একই বিছানায় শুয়ে থাকি, কিন্তু আমাদের কোনো ছেলেপুলেই হল না। এ রকমটা হল কেন?'

'আমি তোমাকে বলেছি-না যে, সবসময় বই মুখে করে থাকলে পুরুষেরা বোকা হয়ে যায়,' ইয়েন বলল, 'এবং বত্রিশ-বছর বয়েসেও তুমি মানুষের জীবনের প্রথম অধ্যায়টিই শিখে উঠতে পারেনি। অথচ তুমি জ্ঞানের দম্ভ করো। কি লজ্জা, কি লজ্জা!'

'কেউ আমাকে আমার অজ্ঞতা নিয়ে বিদ্রূপ করে তা আমি সহ্য করতে পারি না', ল্যাঙ উত্তর দিল, 'লোকে আমাকে চোর বা মিথ্যেবাদী বলুক, আমি কিছু বলব না। কিন্তু কেউ আমার বিদ্যে সম্পর্কে ঠাট্টা করবে তা হবে না। তুমি জীবনের প্রথম অধ্যায়ের কথা বললে। দয়া করে সে সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করবে কি?'

নিজে তৎপর হয়ে ইয়েন তখন ল্যাঙকে পুরুষ ও নারীর রহস্যময় সম্পর্কের আস্বাদন করাল, ল্যাঙ এরকম উপভোগ্য বস্তু আর কখনো আস্বাদন করেনি। নারীপুরুষের সম্পর্কে যে এতো গভীর সুখ আছে তা আমি কখনো বুঝতে পারি নি!' ল্যাঙ বিস্ময় মুগ্ধ স্বরে বলল।

তারপর ল্যাঙ বন্ধুদের সবিস্তারে তার নতুন অভিজ্ঞতার কথা শোনাল, এবং বন্ধুরা মুখ টিপে হাসাহাসি করল খানিকটা। জানতে পেরে ইয়েন খুব লজ্জা পেল, ল্যাঙকে খুব বকল: 'তুমি এতো বোকা কেন? নারীপুরুষের শয়নঘরের গোপন কথা কখনো কাউকে বলতে আছে?

'কিন্তু বলতে লজ্জা কিসের?' সে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি বুঝতে পারি কেউ কারো সঙ্গে অবৈধভাবে মিলিত হলে তাতে সে লজ্জা পেতে পারে, কিন্তু কেউ যদি নিজের ঘরে নিজের লোকের সঙ্গে মিলিত হয়, তাতে লজ্জা পাবার কি আছে?'

ইয়েন মা হল। শিশুকে দেখাশোনার জন্যে একটা ঝি রাখা হল। যখন শিশুটির এক বছর বয়েস হল, একদিন ইয়েন ল্যাঙকে বলল,

তোমার সঙ্গে দু-বছর বাস করলাম, তোমার [illegible] না [illegible]। এখন আমার সময় হয়েছে, আমাকে চলে যেতে হবে। আমার ভয় হচ্ছে হয়ত এমন কিছু একটা ঘটে যাবে যে শেষ পর্যন্ত আমাকে আরো অনেক দিন থেকে যেতে হবে। কিন্তু আমি কেবল তোমার বিশ্বাসকে পুরস্কৃত করতেই এসেছিলাম। কাজেকাজেই এখনই আবার বিদায় নেওয়া উচিত, নইলে পরে হয়ত পস্তাতে হবে।'

'না, তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না। আমাকে ছেড়ে যাওয়া তোমার উচিত নয়। তাছাড়া বাচ্চাটার কথা একবার ভাবো!'

ইয়েন সুন্দর শিশুটির দিকে চাইল, এবং করুণায় তার হৃদয় ভরে গেল। 'ঠিক আছে', ইয়েন বলল, 'আমি থেকে যাচ্ছি, কিন্তু শর্ত এই যে তুমি তোমার লাইব্রেরির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করবে।'

'প্রিয়তমা', ল্যাঙ জবাবে বলল, 'আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি; মিনতি করে জানাচ্ছি তুমি থাকো, এবং যা অসম্ভব তা আমাকে বাধ্য করতে চেষ্টা করো না। এই লাইব্রেরিই আমার ঘর, এবং জগতে এর চেয়ে মূল্যবান আর কিছুই নেই আমার। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। এছাড়া তুমি যা করতে বলবে আমি তা-ই করব।'

ইয়েন নিরস্ত হল, শিশুটিকে পরিত্যাগ করে যেতে তার মন সরছিল না, বলল, 'আমি জানতাম তুমি পারবে না। কেননা নিয়তি মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। আমি কেবল তোমাকে সাবধান করে দিতে চেয়েছিলাম।'

ল্যাঙ যে একটি অদ্ভুত নারীর সঙ্গে বসবাস করে এবং তার গর্ভে যে ল্যাঙের একটি ছেলে হয়েছে, এ-খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। প্রতিবেশীরা কেউই জানে না মেয়েটা কোত্থেকে এসেছে এবং কবেই-বা তাদের বিয়ে হল। কেউ কেউ ল্যাঙকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, কিন্তু ল্যাঙ কৌশলে এড়িয়ে যায়, কেননা ইতিমধ্যে সে শিখে

[illegible] উচিত নয়। কিন্তু রহস্যময় রটে গেল যে সে কোনো প্রেতাত্মা বা কুহকিনীর পাল্লায় পড়েছে, এবং ওই নারী তার সন্তানের গর্ভধারিণী।

গল্পটা কি-করে শিহ্ নামে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কানে পৌঁছে গেল। শিহ্ ফু-চাউ থেকে এসেছে, সাহসী যুবক, প্রথম যৌবনে ডিগ্রি লাভ করেছিল, এবং ইতিমধ্যে কর্মক্ষেত্রে বেশ সুনামও অর্জন করেছে। সে ল্যাঙ এবং তার কুহকিনী নারীকে ডেকে পাঠাল, মহিলাকে দেখার কৌতূহল তার প্রচণ্ড।

হঠাৎ ইয়েন এমনভাবে অন্তর্ধান করল যে তার কোনো পাত্তাই পাওয়া গেল না। শিহ্ ল্যাঙকে আদালতে ডেকে এনে জেরা শুরু করে দিল। কিন্তু ল্যাঙ কিছুই বলল না। শেষ পর্যন্ত ল্যাঙের ঝিকে ডেকে আনিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে শিহ্ সব কিছু জানতে পারল। শিহ্ প্রেতাত্মা বিশ্বাস করত না। সে ল্যাঙের বাড়ি এসে তল্লাশি শুরু করে দিল। সে যে কুসংস্কারে বিশ্বাস করে না একথা প্রমাণ করবার জন্যে ল্যাঙের লাইব্রেরির যতো বই সব বের করে এনে এক জায়গায় জড়ো করে আগুন লাগিয়ে দিল। দেখা গেল জায়গাটাতে আগুনের ধোঁয়া জমে কুয়াশার মতো হয়ে বেশ কয়েক দিন জড়িয়ে থাকল। ল্যাঙকে খালাস করে দেওয়া হল, তার লাইব্রেরির সমস্ত বই পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং যে নারীকে সে প্রাণাপেক্ষা ভালোবাসত সে-ও কোথায় হারিয়ে গেছে। প্রচণ্ড ক্রোধে সে প্রতিশোধ নেবে বলে প্রতিজ্ঞা করল।

সে সঙ্কল্প করল যে করে হোক তাকে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পদ অর্জন করতেই হবে। ইয়েনের উপদেশ অনুযায়ী সে প্রাণপাত চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকল।

কিন্তু ইয়েনকে এবং যে ব্যক্তিকে ধ্বংস করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল তাকেও সে ভুলল না। সে ইয়েনের উদ্দেশ্যে একটা স্মৃতি-ফলক তৈরি করিয়ে তার সামনে ধূপ পুড়িয়ে তার কাছে প্রত্যহ ধ্যান

করতে লাগল, 'আমার প্রার্থনা শোনো, এবং অনুমোদন করো যেন ফু-চাউয়ে আমি একটা উচ্চ পদ লাভ করতে পারি।'

তার প্রার্থনা সফল হল। সে ফু-চাউ জেলার পরিদর্শকের পদ লাভ করল। তার কাজ : পদস্থ কর্মচারীদের রেকর্ড পরীক্ষা করে দেখা। শিহ্-র ফাইলপত্র ঘেঁটে সে দেখতে পেল শিহ্-র বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং ঘুষ নেওয়ার অনেক সাক্ষী-প্রমাণ আছে। সে শিহ্‌কে অভিযুক্ত করল এবং তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল। এইভাবে প্রতিশোধ নিয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়ে, শিশুপুত্রকে দেখাশোনা করার জন্যে ফু-চাউয়ের একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ল্যাঙ নিজের গ্রামে ফিরে গেল।

প্রজাপতি-নিবাস

লি ফু-য়েন

[তাঙ যুগের লেখক লি ফু-য়েন। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। কল্পকথা এবং হিউমার সৃষ্টিতে লি ফু-য়েনের জুড়ি অল্পই। 'একটি রাত্রিবাসের অভিজ্ঞতা', 'যে লোকটা মাছে রূপান্তরিত হয়েছিল', 'বাঘ' এবং 'প্রজাপতি-নিবাস' এই চারটি গল্পই খুব পরিচিত ও প্রচলিত; এদের মধ্যে 'প্রজাপতি-নিবাস'-ই উৎকৃষ্ট রচনা।]

উই কু অবিবাহিত, বিবাহযোগ্য পাত্র। ভালো পাত্রী পাচ্ছিল না বলে বিয়ে হচ্ছিল না। পাত্রী যেমনই হোক একটা-না-একটা খুঁত বের করে সে নিজেই ভেস্তে দিচ্ছিল।

৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে উই একদিন সিঙহো অভিমুখে যাত্রা করল। যাত্রায় বিরতি দিয়ে একদিনের জন্য উই-কে সাঙচেউ শহরের দক্ষিণ প্রবেশপথের কাছাকাছি একটা সরাইখানায় রাত্রিবাস করতে হয়। সেখানে এক ভদ্রলোক তাকে একটি পাত্রীর খোঁজ দেয়। বিখ্যাত প্যান-পরিবারের মেয়ে, বংশকৌলীন্যেও উই-দের মতো সম্ভ্রান্ত।

ঘটক-ভদ্রলোক পরের দিন সকালে লাঙসিঙ মন্দিরে তার সঙ্গে দেখা করতে বলে। একজন ধনীকন্যা, উপরন্তু অসাধারণ সুন্দরীর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব পেয়ে উই এতো উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে সারাটা রাত্রি ঘুমোতে পারল না। ভোর না-হতেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। দাড়ি কামানো, স্নান ইত্যাদি সেরে দামী ও চমৎকার বেশবাসে সজ্জিত হয়ে সেই ভোরবেলাতেই উই বেরিয়ে পড়ল।

পাণ্ডুর আকাশে অর্ধচন্দ্রের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল। রাত্রির অন্ধকার পুরোপুরি কাটেনি। উই নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেখতে পেল চাঁদের বিবর্ণ আলোয় মন্দিরের সিঁড়ির ওপর বসে এক বৃদ্ধ একখানা বই পড়ছে। পাশে একটা ছোটো থলে পড়ে আছে।

এরকম একটা অপার্থিব সময়ে বৃদ্ধ কি পড়ছে জানার জন্যে উই-য়ের ভীষণ কৌতূহল হল। সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না। সে প্রায় সমস্ত প্রাচীন এবং অপ্রচলিত ভাষা, এমন কি সংস্কৃত ভাষাও শিখেছে, কিন্তু বৃদ্ধের বইটা কি ভাষায় লেখা কিছুতেই সে তা বুঝে উঠতে পারল না।

'আপনি যে বইটা পড়ছেন সেটা কি ভাষায় লেখা তা আমি জানতে পারি কি? আমার ধারণা ছিল পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষাই আমার জানা, কিন্তু এই ভাষাটির সঙ্গে আমার কখনো পরিচয়ই হয় নি,' উই সবিনয়ে বলল।

'নিশ্চয়ই হন নি', বৃদ্ধ স্মিত হাস্যে জবাব দিলেন, 'আপনি যে-সব ভাষা জানেন এই বইটি সেরকম কোনো ভাষায় লেখা নয়।'

'তাহলে এ ভাষার নাম কি?'

'আপনি পার্থিব জীব, কিন্তু এই বইটি অপার্থিব জগতের।'

'তাহলে আপনি একটি প্রেতাত্মা। তা, আপনি এখানে কি করছেন?'

'কেনই-বা আমি এখানে থাকব না? আপনি খুব সকালে এখানে এসে পড়েছেন। রাত্রি এবং দিনের এই সন্ধিক্ষণে আপনি যে-সব পথচারীদের দেখছেন তাদের অর্ধেক মানুষ, বাকি অর্ধেক প্রেতাত্মা। অবশ্য আপনি দেখে কিছুই বুঝতে পারবেন না। পৃথিবীর মানুষের ব্যাপারে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সারাটা রাত্রি, যাদের ব্যাপারে আমার দায়িত্ব, আমি সেইসব মানুষ এবং তাদের ঠিকানা পরীক্ষা করে থাকি।'

'কি ব্যাপারে?' উই জিজ্ঞাসা করল।

'বিবাহ।'

উই খুব কৌতূহলী হয়ে উঠল, বলল, 'আমি আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শ করতে চাই। আমি আজ পর্যন্ত কোনো পরিবারে আমার পছন্দমতো বিবাহযোগ্যা একটা পাত্রীও খুঁজে পেলাম

না। বলতে কী, আমি এখানে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তিনি প্যান-পরিবারের একটি বিবাহযোগ্যা পাত্রীর সন্ধান দিয়েছেন। মেয়েটি নাকি খুব সুন্দরী, রুচিশীলা এবং চরিত্রবতী। বলুন, আমি কি সফল হতে পারব?'

'আপনার নাম ও ঠিকানা কি?' বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করল।

উই নাম ও ঠিকানা বলল। বৃদ্ধ বইটার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় থেমে কি যেন দেখল, তারপরে মুখ তুলে বলল, 'আমার আশঙ্কা হচ্ছে, এ বিয়ে হবে না। দেখুন, জন্ম কর্ম বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে। সবকিছুই এই বইখানাতে লেখা আছে। আমি দেখতে পাচ্ছি আপনার স্ত্রীর বয়েস এখন মাত্র তিন বছর। যখন তার সতের বছর বয়েস হবে, তখন তার সঙ্গে আপনার বিয়ে হবে। দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।'

'দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই—মানে! আপনি বলতে চান আমাকে আরো চোদ্দ বছর অবিবাহিত থাকতে হবে?'

'ঘটনা তাই-ই।'

'এবং প্যানদের এই পাত্রীর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না?'

'ঠিক ধরেছেন।'

লোকটাকে বিশ্বাস করবে কি করবে না উই বুঝে উঠতে পারল না, জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার ব্যাগে কি আছে?'

'লাল সিল্কের সুতো।' প্রসন্ন হাসিতে বৃদ্ধের মুখটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'দেখুন, এই আমার কাজ। যে পুরুষের সঙ্গে যে স্ত্রীলোকের বিয়ে হবে, তাদের নাম এই বইয়ে আমি টুকে রেখেছি। যখনই কোনো ছেলে বা মেয়ে ভূমিষ্ঠ হয় এবং আগে থেকেই স্বামী-স্ত্রী হিসেবে নির্ধারিত হয়, আমি রাত্রিবেলায় বেরিয়ে এই লাল সিল্কের সুতো দিয়ে তাদের পাগুলো বেঁধে দিই। একসময় গিঁটটা কষে লেগে যায়—আমি খুব শক্ত করেই বেঁধে দিই যাতে কেউ তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে না পারে। একজন হয়ত দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ

করল, আর একজন হয়ত খুব ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করল, কিংবা হয়ত দু-জন হাজার হাজার মাইল দূরে জন্মগ্রহণ করল, অথবা হয়ত এমন দুটি জন্মগ্রহণ করল যাদের মধ্যে কোনো রকম সম্প্রীতি বা সদ্ভাব নেই। কিন্তু তাতে কি? শেষ পর্যন্ত তারা স্বামী-স্ত্রী রূপে মিলিত হবেই। কারো এই নিয়মের বাইরে যাবার কোনো উপায়ই নেই।'

'অনুমান করি, আমারটাও বেঁধেছেন।'

'হ্যাঁ, বেঁধেছি।'

'আমার সঙ্গে এক সুতোয় যার ভাগ্য গাঁথা হয়ে গিয়েছে, সেই তিন বছরের শিশু এখন কোথায়?'

'ও, বাজারে তরকারিওয়ালি এক মেয়েলোকের সঙ্গে সে থাকে। এখান থেকে খুব একটা দূর নয়। মেয়েলোকটা প্রত্যেক দিন সকালেই বাজারে আসে। কৌতূহল হলে—আর একটু বেলা হোক, আমার সঙ্গে যেয়ো, তোমাকে দেখিয়ে দেবো।'

ইতিমধ্যে সকাল হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু যে ভদ্রলোক উই-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে বলে কথা দিয়েছিল সে এল না।

'দেখলে? তার জন্যে অপেক্ষা করে কোনো লাভ হবে না', বৃদ্ধ মন্তব্য করল।

দুজনে একসঙ্গে কিছুক্ষণ গালগল্প করল, বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলে উই খুব খুশি হল। বৃদ্ধ বলল যে সে তার কাজটা খুবই পছন্দ করে। 'ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত', বৃদ্ধ বলল, 'এক টুকরো সিল্কের সুতোর কি মাহাত্ম্য! আমি দেখতে পাই, ছেলেটা এবং মেয়েটা নিজের নিজের বাড়িতে বড়ো হল, কেউ কাউকে চেনে না, কিন্তু সময় এলেই, চারচক্ষুর মিলন হতেই তারা প্রেমে হাবুডুবু খেতে লাগল। কোনো বাধাই তারা মানবে না। যদি তাদের মাঝখানে তৃতীয় কোনো পুরুষ বা নারী এসে দাঁড়ায়, সুতোর পা বেঁধে তাকে হোঁচট খেতে হয়, এবং এমনভাবে জড়িয়ে যায় যে আত্মহত্যা করা ছাড়া তার আর কোনো উপায় থাকে না। এই ঘটনা আমি বারবার ঘটতে দেখি।'

সেখানে একটি কৃষক-কন্যাকে দেখামাত্র সে তার প্রেমে পড়ে গেল। অধিকন্তু, মেয়েটিও তার প্রেমে পাগল হয়ে উঠল। তাদের বাগ্‌দান হয়ে গেল, উই সিল্কের পোশাক এবং মণিমাণিক্য ইত্যাদি কিনতে রাজধানী গেল। ফিরে এসে দেখে তার প্রণয়িনী মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এক বছর ধরে ভুগল মেয়েটা। মাথার সব চুল উঠে গেল, এবং মেয়েটা অন্ধ হয়ে গেল। উইকে সে বিয়ে করতে অস্বীকার করল এবং তাকে চলে যেতে অনুরোধ করল, বলল—সে যেন অন্য কোনো সুন্দরী এবং যোগ্য মেয়েকে বিয়ে করে সুখী হয়।

সাত বছর কেটে যাওয়ার পর আবার উই-য়ের বিয়ের আর একটা চমৎকার সুযোগ এল। মেয়েটি কেবল তরুণী এবং সুন্দরী'ই নয় সাহিত্য, শিল্প এবং সঙ্গীতের একজন অনুরাগিণীও বটে। কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, এবং সহজেই তাদের মধ্যে বাগ্‌দানও হয়ে গেল। বিয়ের ঠিক তিন দিন আগে, পাকা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবার সময় একটা মসৃণ পাথরে পা হড়কে মেয়েটি পড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনা থেকে উই-য়ের মনে হতে থাকে যে ভাগ্যদেবী তার সঙ্গে কেবল মস্করা করেই চলেছেন।

উই এখন থেকে অদৃষ্টবাদী হয়ে উঠল। বিয়ের সমস্ত সাধ জলাঞ্জলি দিয়ে শিয়াঙচাউ-য়ে সে চাকরি নিল। দিনরাত কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে, বিয়ের কথা ভুলেও উচ্চারণ করে না। কিন্তু চাকরিতে সে এতো যোগ্যতার পরিচয় দেয় যে, একদিন স্বয়ং জেলাশাসক ওয়াঙ-তাই নিজের ভাইঝির সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দেন।

বিবাহ-প্রসঙ্গটি উইয়ের কাছে খুব যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছিল।

'আপনি আপনার ভাইঝির সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চাচ্ছেন কেন? আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। এ বয়েসে বিয়ে করাটা ভালো দেখায় না।'

চাপে পড়ে উইকে সম্মতি দিতে হয়, কিন্তু তেমন-একটা আবেগ সে বোধ করে না। বিয়ের আগে পাত্রীকে একবার চাক্ষুষও করে না।

মেয়েটি তরুণী, সুন্দরী ; এবং উই বউ দেখে খুবই সন্তুষ্ট হয়। প্রত্যেকটি ঘরোয়া ব্যাপারে মেয়েটি খুবই যোগ্য বলে তার মনে হয়।

নববধূ সর্বদা কপালের ডানপাশটা চুল দিয়ে এমনভাবে ঢেকে রাখে, যাতে তাকে আরো ভালো লাগে ঠিকই, কিন্তু তাতে উই রীতিমতো বিস্ময়বোধ করে ; তার মনে একটা জিজ্ঞাসাও জেগে ওঠে। কয়েকমাস পরে, যখন তাদের ভাব-ভালোবাসা হয়, তখন একদিন উই জিজ্ঞাসা করেই ফেলে, 'মাঝেমধ্যে চুলবাঁধার স্টাইলটা বদলাতে পারো না? আমি বলতে চাই, সব সময় কপালের একটা পাশ চুল দিয়ে ঢেকে রাখো কেন?'

উইয়ের স্ত্রী কপালের ওপর থেকে চুলের গোছটা সরিয়ে বলে, 'দেখছ?' একটা ক্ষতচিহ্নের দিকে সে স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'কি করে কেটে গিয়েছিল?'

'আমার যখন তিন বছর বয়েস তখন থেকেই এটা আছে। আমার বাবা অফিসে কাজ করতে-করতেই মারা যান, এবং আমার মা আর ভাইও একই বছরে মারা যায়। তখন আমার ধাই আমাকে নিয়ে আসে, তার কাছেই থাকি। সাঙচেঙ-য়ে দক্ষিণ প্রবেশপথের কাছে আমাদের একটা বাড়ি ছিল, সেখানেই আমার বাবার অফিস। আমার ধাই অফিসের বাগানে শাক-সবজি লাগাত এবং বাজারে বিক্রি করত। একদিন একটা চোর অনর্থক আমাকে খুন করতে চেষ্টা করে। আমরা তার কারণ কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি, কেননা আমাদের কোনো শত্রুই ছিল না। চোরটা আমাকে খুন করতে পারেনি ঠিকই, কিন্তু আমার কপালে একটা চিরস্থায়ী ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিয়ে যায়। এই জন্যেই কপালের একটা পাশ আমি চুল দিয়ে ঢেকে রাখি।'

'তোমার ধাই প্রায় অন্ধ ছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি জানলে কি করে?'

'আমিই সেই চোর। পুরো ব্যাপারটাই অদ্ভুত। আমরা সবাই ভাগ্যদেবীর হাতে খেলার পুতুল মাত্র।'

চোদ্দ বছর আগে বৃদ্ধের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার থেকে এ পর্যন্ত পুরো গল্পটাই সে স্ত্রীকে শোনাল। তার স্ত্রী বলল, যখন তার বয়েস ছয় বা সাত, তখন তার কাকা সাঙচেঙ-য়ে এসে খুঁজে বের করে, তখন থেকেই সে কাকার পরিবারের সঙ্গে সাঙচাউ-য়ে বাস করছে। তাদের বিয়েটা যে দৈবনির্ধারিত একথা জানার পর সে স্বামীকে আরো গভীর ভাবে ভালোবাসতে থাকে।

পরবর্তীকালে তাদের একটা ছেলে হয়, ছেলের নাম রাখে কুন। বড়ো হয়ে সেই ছেলে তাইয়ুয়ানের জেলাশাসক হয়, এবং ছেলের বদান্যে মাও খুব প্রভাবশালী হয়।

সাঙচেঙের জেলাশাসক যখন তার শহরে কি ঘটেছিল জানতে পারেন, তখন থেকে, উই কু যে সরাইখানায় অল্প কাল বাস করেছিল তার নাম রাখেন 'প্রজাপতি নিবাস'।